সত্যের গল্প গল্পের সত্য

হাসনাত আহমেদ

মানুষের জীবন মূলত একতাল অভিজ্ঞতার সমষ্টি। বলা যেতে পারে অভিজ্ঞতা জীবনেরই অন্য নাম। জীবনের পথ হাঁটতে গিয়ে আমরা বিপুল ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যাই। এর কোনোটা ভালো, কোনোটা মন্দ; কোনোটা অমূল্য, কোনোটা মধুর; কোনোটা সুখদায়ক, কোনোটা শোকজর্জর। এভাবেই জীবননদী বেয়ে আমরা ভবসাগর পাড়ি দিই।

আর এসব অভিজ্ঞতাই আমাদের ভেতর-বাহির জীবনে অজস্র-বিচিত্র গল্প তৈরি করে। গুণী লেখকেরা এসবের নির্যাস ছেঁকেই তৈরি করেন বিপুল সাহিত্য, যার ভিতর দিয়ে আমরা অসংখ্য-অজস্র জানা-অজানা অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হই এবং জীবনের বহুস্তরিত রস উপভোগ করি। এভাবেই জীবনের বহু সত্য ঘটনা কখনো কখনো গল্প হয়ে ওঠে আর গল্পের ভিতর খুঁজে পাই সত্যের ইশারা।

ড. হাসনান আহমেদ বিপুল জীবন-অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন গুণী মানুষ। পেশায় অধ্যাপক এই মানুষটি একই সঙ্গে গভীর জীবনপাঠক, সমাজবিশ্লেষক, সুরসিক এবং বাস্তবতার দর্শক ও সমালোচক।

তাঁর বর্তমান বইতে তিনি খুব অন্তরঙ্গ ও সরসভাষায় এমন সব ঘটনা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে একগুচ্ছ কাহিনি রচনা করেছেন, যা একই সঙ্গে সত্য ও গল্পের এক গাঢ় সম্মিলন। বাংলাদেশের সমাজ-শিক্ষা-রাজনীতি-ধর্ম-পেশা ও দৈনন্দিন জীবনের ভালো-মন্দের বিচিত্র নকশা ফুটে উঠেছে তাঁর রচনায়। তাই বলা যায় তাঁর লেখা একই সঙ্গে সমাজের আয়না, আবার সরস সাহিত্য। রসিক পাঠকের জন্য এই বই নিঃসন্দেহে একটি চমৎকার জীবন-ভ্রমণ।

সৈকত হাবিব
কবি

লেখকের অন্যান্য বই:

জীবনক্ষুধা
প্রতিদান চাইনি
কিছু কথা কিছু গান
অপেক্ষা
শেষবিকেলের পথরেখা
সমকালীন জীবনাচার ও কর্ম
আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা– চিন্তা ও দুশ্চিন্তা

সত্যের গল্প গল্পের সত্য

হাসনান আহমেদ

প্রকৃতি

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ

জন্ম ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮, চুয়াডাঙ্গা জেলার দত্তাইল-শম্ভুনগর গ্রামে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে বিকম (অনার্স) ও এমকম। বিআইএম থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা। আইসিএমএবি থেকে সিএমএ এবং বর্তমানে একজন এফসিএমএ। আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি থেকে ব্যবসায় প্রশাসনে পিএইচডি। ইউরোপিয়ান কমিশনের এরাসমাস মুন্ডুস স্কলার হিসেবে করভিনাস ইউনিভার্সিটি অব বুদাপেস্ট থেকে কর্পোরেট গভার্নেন্স বিষয়ে পোস্ট-ডক্টরেট। বাংলাদেশ সোসাইটি ফর হিউম্যান রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট-এর একজন ফেলো। ফেডারেশন অব বাংলাদেশ হিউম্যান রিসোর্স অর্গানাইজেশনস্-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট।

সাঁইত্রিশ বছর ধরে তিনি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত ইন্সটিটিউট, কলেজ, গবেষণা-প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, শিক্ষা-প্রশাসন এবং গবেষণার কাজ করে আসছেন। তিনি ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (দায়িত্বপ্রাপ্ত) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে তাঁর বেশ কিছুসংখ্যক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত।

সত্যের গল্প
গল্পের সত্য

হাসনান আহমেদ

প্রবৃত্তি

সত্যের গল্প গল্পের সত্য

হাসনান আহমেদ

স্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
মে ২০২১

প্রকাশক
প্রকৃতি
১১৪-১৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরাত-ই-খুদা সড়ক, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫
ফোন: ০১৭২৭৩২৮৭২৩, ই-মেইল: Prokriti.books@gmail.com

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মোঃ নাজমুল আলম (বুলবুল)

মুদ্রণ
লিংক ভিশন
মিরপুর, ঢাকা
linkvision.bd@gmail.com

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৪৪৪-০৪৫-৬

মূল্য: ৩০০.০০ টাকা

Satyer Galpo Galper Satya by Hasnan Ahmed
Published by Prokriti, Dhaka, May, 2021
Price: Tk. 300.00

উৎসর্গ

মামণি
উক্কুবুড়ো
সোনাবুড়ি
যাদেরকে নিয়ে আমার যত স্বপ্ন

আমার কথা

শুরুতেই এতটা ব্যক্তিগত সাফাই হয়তো মানানসই হয় না। তবু বলতে হচ্ছে– এ একগুচ্ছ কাহিনিতে 'আমার কথা' শিরোনামে আমার লেখার তেমন কিছু নেই। গল্প লিখতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে জীবনের নিখাদ বাস্তবতা দিয়ে সত্য কথাই রেখাঙ্কিত করেছি। এর মধ্যে কতটুকু সাহিত্যের রসবোধ এবং কতটুকু নিরেট সত্যের সন্নিবেশ– তা বলা কঠিন। আসলে সংঘাতময় এই নিষ্করুণ পৃথিবীতে অনেক ঘটনাপ্রবাহে প্রাণের স্পন্দন থাকলেও, কখনো কখনো বাস্তবতার কশাঘাতে রসবোধ মরুপথে স্রোত হারায়।

চলতি কোভিড-১৯ নামক যমের করুণাহীন পূর্ণগ্রাসী মুখ থেকে টানাহ্যাঁচড়ায় ফসকে গিয়ে আবার পাঠকসমাজের কাছে ফিরতে পারবো কি-না, সে-বিষয়ে বেশ সংশয়ান্বিত ছিলাম। অবশেষে এ-পর্ব দ্বিধামুক্ত হলাম। সান্ত্বনা এটুকুই যে, প্রাণের স্পন্দন থেমে যায়নি। এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো অদৃশ্য শক্তির মনুষ্যাতীত দ্যোতনা থাকতে পারে, যা জানা আমার সাধ্যতীত। তাই যতক্ষণ আছি সত্যকে প্রকাশের নেশা। কাহিনির বর্ণনায় এমন ছদ্মনামে প্রকাশ 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে' চাপানোর 'মহাপাপ'দুষ্ট হলেও লেখকের স্বাধীনচেতা মনোভাবের বিচারে হয়তো এ-দোষ মার্জনীয়।

এবারের কাটখোট্টা কিসিমের লেখাগুলো সাহিত্যরসিকদের হালে পানি পাবে কি-না, তা নিয়ে আমি দ্বিধান্বিত। গল্পের মধ্য দিয়ে আমার দায় শোধ করার প্রয়াস পেয়েছি।

কম্পিউটার কম্পোজে ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের চাঁন মিয়া এবং টেকনিক্যাল অলংকরণের কাজে মোঃ নাজমুল আলম (বুলবুল) ভাইয়ের ক্লান্তিহীন সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণযোগ্য।

আমার এ চিন্তাধারা ও বাস্তবতা স্বভাবসুলভ রীতিতে প্রকাশের মাধ্যমে পাঠক সমাজের মনকে রাঙাতে পারলেই নিজেকে সার্থক মনে করবো।

ঢাকা, ডিসেম্বর ২০২০

(হাসনান আহমেদ)

সত্যের গল্প
গল্পের সত্য

সূচিপত্র

শিক্ষা-সেবা ও হাজিগুরু-তরিকা	১১
আলেক মাস্টারের বিবেকবান সমাজ	৪৩
হেলাল দপ্তরির ঘণ্টা	৫৫
পিতৃপক্ষ	৭৫
কুলকণ্টক	৯১
বন্দিশালা	১০১
শমনালয়	১১৭
নিঃসঙ্গ স্মৃতি-ভাস্কর	১৩৩
শাপশাপান্ত	১৫৩
বিপণি বেসাতি	১৬২
দাদনদাহ	১৬৯
স্বপ্নবিলাস	১৭৭

শিক্ষা-সেবা ও হাজিগুরু-তরিকা

স্বরূপ মাস্টার বৈঠকখানার ভিতর থেকে একটা প্লাস্টিকের চেয়ার টেনে নিয়ে খোলা আকাশের নীচে নামিয়ে বিকেলটা পথের ধারে বসে কাটানোর তোড়জোড় করছেন। তাঁর বয়স পঁচাত্তর পেরিয়ে গেছে। বিশ বছর হলো তিনি অবসরে গেছেন। কাউকে কাছে পেলে গল্প করে সময় কাটান। অতীত অভিজ্ঞতার কথা বলেন। সামাজিক শিক্ষার কথা বলেন। বই এবং জায়নামাজ নিয়ে বেশি সময় ব্যয় করেন।

বাবুই মাস্টারকে একজন লোক-সাথে রাস্তা দিয়ে আসতে দেখলেন। এই করোনা দুর্যোগের মধ্যেও বাবুই মাস্টারকে গ্রামে আসতে দেখে অনেকটা অবাকই হলেন। কাছাকাছি আসতেই স্বরূপ মাস্টার বলে উঠলেন– কী বাবুই, এলাকায় কবে এলে? ভালো আছো তো? জমির আলি, তুমি কেমন আছো?

বাবুই মাস্টার সালাম দিলেন। বললেন– এই তো স্যার, দু-তিন দিন হলো এসেছি। এসেছি বললে ভুল হবে, আসতে বাধ্য হয়েছি। আমাদের পাড়ার মস্তব আলি পালোয়ান আমার নামে কেস করেছে, সাথে ইন্ধনদাতাও আছে। তাই দেশের এই মহামারিতেও ঢাকা ছেড়ে গ্রামে আসতে হলো। দু-তিনটা দিন এখনো থাকতে হবে, মনে হয়। আপনার শারীরিক অবস্থা এখন কেমন?

আর শেষ বয়সের জীবন! কচু পাতার পানির মতো। এই আছে, এই নেই। কোনো ভরসা নেই। এই ভালো, এই মন্দ। অল্পতেই দুর্বল হয়ে পড়ি। তাছাড়া এই মহামারিতে বড্ড ভয়ে ভয়ে আছি। স্বরূপ মাস্টার উত্তর দিলেন।

বৈঠকখানা থেকে দুটো চেয়ার বের করে আনিয়ে বসার ব্যবস্থা করলেন। বললেন– তুমিও তো শুনলাম ছয় মাসের মধ্যে অবসরে যাচ্ছ। গ্রামে শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করতে চাচ্ছ। তোমার উন্নয়ন পরিকল্পনার ফ্লাইয়ারটা হাতে পেয়েছি, পড়েছি। সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থার আয়োজন। এটা যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা। নিজের এলাকা থেকে শুরু করো, তারপর সারা দেশে ছড়িয়ে যাবে। দেখলাম, অনেক কাজ করার ইচ্ছে তোমার। আমার সাধ্যমতো সহযোগিতা তোমাকে আমি সবসময়ই করবো।

কিন্তু পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতা ক্রমশই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মানিয়ে চলতে কষ্ট হচ্ছে। তবু এগিয়ে তো যেতে হবে। আমি জানি, আমি যা পারিনি, তুমি তা পারবে। এই রাস্তা দিয়ে অনেক লোকই অনেক কথা বলতে বলতে যায়। এই বৈঠকখানায় বসে সবই শুনি। সাধারণ মানুষ তোমার কাজে থাকতে চায়। তারা তোমাকে নিয়ে আশার আলো দেখছে। সমাজের সাধারণ লোক এখনো পরিশ্রম করে খায়। তাদের চিন্তাধারাও ভালো। পেটের চিন্তায় ব্যস্ত থাকায় ইচ্ছে থাকলেও সময় দিতে পারে না। সমাজের কতিপয় কুচক্রীমহল কারো ভালো দেখতে পারে না। তারা সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে, কিছু মোনাফেককে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করে। সমাজে মাথা উঁচু করে থাকতে চায়। অথচ স্বভাবটা এত খারাপ যে, প্রতিহিংসা ছাড়া চলতে পারে না। তারা কিছুসংখ্যক লোককে কুমন্ত্রণা দিয়ে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। নিজের আসল চরিত্র ঢেকে রাখার জন্য হজ করে, ওমরাহ করে। কিন্তু মনের মধ্যে জন্মগত হিংসুটে স্বভাব ও কুটিল বুদ্ধি রয়ে যায়। আসলে কয়লার ময়লা ধুলে কখনোই যায় না। আমি কি বলতে চাচ্ছি, নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পারছো! ধাড়ি ছুঁচোর গায়ে যত আতরই ঘষো না কেন, গন্ধ কোনোদিনই যায় না। কেবল আতরটুকুই নষ্ট হয়। আমার অনুরোধ, তুমি তোমার কাজ থেকে কোনোক্রমেই পিছপা হবে না।

বাবুই মাস্টার জমির আলিকে দেখিয়ে বললেন– ও খুব সহজ-সরল প্রকৃতির কর্মপাগল মানুষ। ভালো কাজের আগে আগে থাকে। প্রকৃতপক্ষে কাজ করছে তো এই জমির আলি ও গ্রামের এ-রকম আরো বেশ কিছু সাধারণ মানুষ। আমি তাদের প্রেরণা জোগাই মাত্র। জমির আলি আমার ছেলেবেলার খেলার সাথী। ওরা আমাকে ধরে রেখেছে। প্রতিটা কাজ ওরা সময় দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে করায়। হাজিগুরুরা ওদেরকে ঠকিয়ে, ওদের কাঁধে দায় চাপিয়ে সমাজে টিকে থাকে। এখন ওরাও হয়ে গেছে মস্তব পালোয়ানের শত্রু। মস্তব পালোয়ান ওদেরকে শেষ করে ফেলার হুমকি দিচ্ছে। মস্তব পালোয়ান ভালো করেই জানে, আমি ঢাকায় বসে কোনোদিনই কাজ করতে পারতাম না। গ্রামের বেশ কিছু লোক মস্তব পালোয়ানদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে সাধারণ মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। এতেই ওদের গা-জ্বালা ধরেছে।

হাজিগুরু আমাদের একাধিকবার ফোন করে কাছে নেওয়ার চেষ্টা করেছে, আমাদের লোভও দেখিয়েছে। তার ভাতিজাদের চাপে রেখেছে। গ্রামের কাউকে কাউকে বাড়িতে ডেকে এনে কানপড়া ও গুরুমন্ত্র দিচ্ছে। বাবুই মাস্টারের কাছ থেকে সরে যেতে বলেছে। আমরা তার কু-মতলব বুঝে ফেলেছি। তার কাছে ধরা দিইনি। সে এখন আমাদের উপর রেগে আছে। বিভিন্ন লোকের কাছে আমাদের গালাগালি করছে, বাজে মন্তব্য ছুড়ে মারছে। সাধারণ মানুষ পেছনে পেছনে হাজিগুরুকে মূর্খগুরু বলে ডাকে। তার জটিল প্যাঁচ ও স্বার্থপরতা সবাই জানে। আজ ছাব্বিশ বছর মসজিদের চার বিঘা মাঠান জমি নিজে করে খাচ্ছে। সবার অভিযোগ– প্রতি বছর জমির টাকা উঠিয়ে সে ব্যবসার পুঁজি তৈরি করে। মসজিদের নামে ব্যাংকে কোনো হিসাব খোলে না, টাকার সময়-মূল্য বোঝে না। মসজিদকে নিজেদের বলে দাবী করে। কাউকে কোনোদিন কোনো হিসাব দেয় না, অন্যের দানও কৌশলে নিজের বলে চালিয়ে দেয়। হিসাব যারা চায়, তাদের সাথেই দুর্ব্যবহার করে। মানুষ ওর থেকে দূরে সরে চলে গেছে। লোকে পিছনে টিপ্পনী কেটে বলে, হাজিগুরু মানে 'এক টুকরো হিংসার বীজ', 'হজ-পাপী'। ঘটনাটার শুরুটা আপনাকে খুলে বলি। শোনেন স্যার– আমি নিজে ছিলাম, ফলে আমি সব জানি। করোনা ভাইরাসের কারণে অনেকেই ঢাকা ছেড়ে গ্রামে এলো; হাজিগুরুর ভাতিজা জালালও বাড়িতে এলো। বাবুই মাস্টার ওকে বলে দিয়েছিলেন, গ্রামে এসে বসে না-থেকে কাজ করতে। আমাকেও ফোন করেছিলেন। আমাদেরকে হাজিগুরুর সাথে কথা বলে মরা পুকুরটা ভরাট করতে বলেছিলেন। আমি ও জালাল হাজিগুরুর কাছে গেলাম। হাজিগুরু অনেক বছর হলো গ্রামের বাড়ি বেচে বাজারে গিয়ে বাড়ি তৈরি করে সেখানে থাকে। সেখানে গিয়ে তাকে পুকুর ভরাটের কথা বললাম। সে প্রথমেই কথাটা বাতিল করে দিয়ে বললো, এখন মানুষের গম-ভুট্টা কাটার সময়। এখন লোক পাওয়া যাবে না। আগে মানুষের কাজ শেষ হোক। আমি বাবুই মাস্টারকে এ-কথা ফোনে বললে বাবুই মাস্টার ফোনটা হাজিগুরুকে দিতে বললেন। তিনি হাজিগুরুকে বললেন, সামনে আষাঢ়ের বর্ষা আসছে, মাটি উঠালে এখনই উঠাতে হবে। তাছাড়া গম-ভুট্টা-কাটা লোক তো মাটি উঠাবে না। মাটি ভরাট করবে ড্রেজিং মেশিন দিয়ে কেটে ট্রাক্টরে। সাত বছর ভরাটের কাজ পিছিয়েছে, আর পেছানো না। কোথায় পুকুর খনন করছে সেটা দেখ। হাজিগুরু বললো, নাগাদ চৈত মাটি উঠালেও অসুবিধে নেই। আমি ও

জালাল বাড়ি চলে এলাম। পরদিন শুনলাম, আমাদের গ্রামের শেষ মাথায় একজন পুকুর খনন করে মাটি বিক্রি করছে। সেখানে গেলাম। তারা মাটি দিতে চাইল। হাজিগুরুর সাথে ফোনে কথা বললাম। সে বললো, ও মাটি থাক। পরে আরো মাটি পাওয়া যাবে, সেটা কিনলেই হবে। ওরা দাম বেশি চাচ্ছে। বাবুই মাস্টারকে ফোন দিলে উনি বললেন– মাটি কিনে ফেলো। পরে আষাঢ় চলে আসবে, মাটিও পাওয়া যাবে না, আবার জালালও ঢাকায় চলে আসবে। এভাবেই আমরা অনেক বছর পিছিয়ে গেছি, মরার বয়স হয়ে যাচ্ছে। আমরা দু-জন হাজিগুরুর বাড়িতে আবার গেলাম। সে মাটির বিষয়টা তেমন গুরুত্ব না দিয়ে এড়িয়ে গেল। বাবুই মাস্টার তাকে মাটি ফেলার জন্য বাড়িতে এসে দেখিয়ে দিতে বললেন। সে বললো, উত্তর-পূর্ব কোনা থেকে ভরাট করুক। কিন্তু সে গ্রামে এলো না। আমরা মসজিদ-মাদ্রাসার পথ বানানোর জন্য উত্তর-পূর্ব দিক থেকে মাটি ফেলতে গেলে মস্তব পালোয়ান বাধা দিলো। বিষয়টা হাজিগুরুকে জানালে, আচ্ছা আমি বাড়ি আসছি, বাড়ি আসছি বলে দশ-বারো দিন ঘুরাতে থাকলো। মস্তবকে বাধা দেওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করায় সে বললো, সে এখানে জমি নেবে। আমাদেরকে মারতে গেল, অকথ্য ভাষা ব্যবহার করতে লাগলো। মস্তবকে হাজিগুরুর সাথে যোগাযোগ করতে বললে সে প্রকাশ্যে বলতে লাগলো, হাজিগুরুর সাথে তার যোগাযোগ আছে, প্রয়োজন হলে তোমরা যোগাযোগ করো। আমরা যোগাযোগ করলে হাজিগুরু বললো– আচ্ছা আমি আসবো, আসবো। ড্রেজিং মেশিন ও ট্রাক্টরের কাজ বসে থাকতে চায় না। তাদের মালিক বলতে লাগলো, আমাদের একদিন বসে থাকলে ভাড়া দেওয়া লাগবে। হাজিগুরু গ্রামে যাবো-যাবো করে বাবুই মাস্টারকেও ঘুরাতে লাগলো, কিন্তু এলো না। বাবুই মাস্টার পশ্চিম-দক্ষিণ কোনা থেকে মাটি ভরাট করার কথা আমাদের বলে দিলেন। আমি ও জালাল কাজ করতে লাগলাম। হাজিগুরু গ্রামে এলো না, কিন্তু মস্তবকে কিছু না বলে তার সাথেই সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে লাগলো। আমরা তার কূটকৌশল বুঝতে পেরে দূরে সরে এলাম। আস্তে আস্তে সে সরাসরি মস্তবের পক্ষে চলে গেলো। পরে একদিন 'বয়স হয়েছে, হজ করেছি, কোনো ঝামেলায় আর থাকব না, সমস্ত হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে আসবো' বলে জালালকে ফোন করলো। এ কথা বাবুই মাস্টারকেও সে নিজে দু-দিন শুনিয়েছে এবং তার মেয়েকে দিয়েও বলিয়েছে। একদিন রাতে মস্তব মাদ্রাসার হাফেজ সাহেব, যিনি মসজিদেরও ইমামতি করেন,

তাঁকে জীবননাশের ভয়-ভীতি দেখিয়ে তাড়িয়ে দিলো। পরদিন হঠাৎ হাজিগুরু হিসাব বুঝিয়ে দেওয়ার নাম করে বাড়িতে এসে মস্তব গংকে নিয়ে বসে একাকী মিটিং করলো; আমাকে ডেকে মসজিদের জন্য আলাদা নতুন ইমাম রাখবে বলে জানালো। তার প্রস্তাবে আমি না বলাতে মস্তব গংকে মসজিদ এবং বাবুই মাস্টারকে মাদ্রাসা ভাগ করে দিয়ে চলে গেলো। মস্তব মসজিদ তাদের বলে দাবি করতে লাগলো। মসজিদের পাশ থেকে মাদ্রাসার বালি আমাদেরকে সরিয়ে নিতে বললো। অন্য কাউকে এ মসজিদে নামাজ পড়তে আসতে দেবো না বলেও জোর গলায় জানিয়ে গেল। বাবুই মাস্টারকে জিজ্ঞেস করায় বললেন– 'মসজিদ থেকে একপক্ষকে তাড়িয়েছে, তোমাদেরও তাড়াচ্ছে। এটাকে হাজিগুরুর মসজিদ বানাতে চাচ্ছে। মসজিদ ছাড়া মাদ্রাসা চলে নাকি! মসজিদ সবার, তোমরা মসজিদ ছেড়ো না। এটা মাদ্রাসা, হেফজখানা ও এতিমখানাকে অকেজো করে দেয়ার একটা কুবুদ্ধি।' আরেকজন নতুন হাফেজ ও ইমামকে নিয়োগ দেওয়া হলো। মস্তব তার ছেলে ভাতিজাসহ এ-মসজিদে আসা বন্ধ করে দিলো। মিথ্যে কথা বলে বেড়াতে লাগলো যে, আমরা মসজিদ থেকে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছি। এ বলে হাজির কাছে গিয়েও নালিশ করলো। হাজিগুরু এ ব্যাপারে আমাদের উপর অনেক চাপ দিতে থাকলো। শেষে বাবুই মাস্টারকে একা ফেলে হাজির দলে যোগ দেয়ার জন্য টোপও দিলো। আমরা যাইনি। এভাবেই চলছে। –জমির আলি অনেক কথা বলে এবার থামলো।

হাজিগুরুর মনোভাব অনেক আগেই বুঝেছি। আমি কাউকে বলিনি। এমন কি আমার প্লান আমি তাকে একাধিকবার ফোনে বুঝিয়েছি। সে শুধু 'আচ্ছা, তাই নাকি' বলে সময় পার করতো, কোনো মতামত দিত না, কোনো আগ্রহও দেখাতো না। আমাদের সমাজে যারাই ভাত খায়, প্রত্যেকেই একটা বুঝ নিয়ে চলে, তারা তা বোঝে– আমিও হাজিগুরুর মনোভাব বুঝেছি। এখানে কয়েকটা বড় প্রতিষ্ঠান হোক, হাজিগুরু তা চায় না। যা হোক, গ্রাম এলাকায় যারা রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে জড়িত, তাদের সহযোগিতাও আমি চেয়েছি। তারা সমাজের উন্নতি চায়, আমিও উন্নতি চাই। ফলে একসাথে কাজ করা সম্ভব, এটা আমার ধারণা। বাবুই মাস্টার বললেন।

গ্রামে যারা রাজনৈতিক দলে নাম লিখিয়েছে, মুখে মুখে উন্নয়নের কথা বললেও তাদের ধান্দা ভিন্ন। অনেকেই সরকার কর্তৃক আর্থিক বরাদ্দের খোঁজখবরের দিকে

ঝোঁকে বেশি। সে ধান্দায় তাদের প্রচুর সময় ব্যয় করতে হয়। আর এরা দলীয় কাজ ছাড়া একজোট হতেও চায় না। আবার অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে অনেক ক্ষেত্রেই গ্রুপভিত্তিক দলবাজি, ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমীকরণেও জড়িত। তাছাড়া এরা দলীয় ধুয়ো তুলে থানা ও জেলা পর্যায়ের নেতাদের সুনজরে থাকতে চায়– ভবিষ্যতে আরো বড় নেতা হবার আশায়। আবার স্থানীয় নির্বাচনকে ওরা মাথায় রাখে। সাথে পেটতন্ত্র তো আছেই। তুমি যেহেতু কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে সরাসরি জড়িত নও, তারা তোমার সব কথাতেই সায় দেবে না, তাদের সুবিধাজনক জায়গাগুলোতে দেবে। তোমাকে এটুকু মেনে নিয়েই ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হবে। মানুষ হজ করতে যায় পাপ মোচনের জন্য, জন্মগত স্বভাব বদলের জন্য না– এটা বুঝে রেখ। স্বরূপ মাস্টার বাবুই মাস্টারের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলে গেলেন। তারপর একটু থামলেন।

আরো বললেন– হাজিগুরুরা সমাজের ভালো কোনোদিনই দেখতে পারে না, ভালো চায়ও না। ব্যক্তিস্বার্থ ও মাতব্বরি বজায় রাখার জন্য কখনো দলীয় লেবাস ধরে, কখনো সন্ত্রাসী পোষে, কখনো-বা ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে ভিলেজ পলিটিক্স, গ্রুপ পলিটিক্স, দলবাজি, চালবাজি চালিয়ে যায়। অধিকাংশ কুটিল চাল গোপনে চালে, বেশি প্রয়োজনে প্রকাশ্যে চলে আসে। তবে সব কিছুর মূলে তারা জড়িত থাকেই। সাগরেদদের দিয়ে ওরা খেলা দেখায়। সমাজ কিন্তু এই পক্ষটার মতলববাজি পুরোপুরি চেনে। দেশে আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নেই বলে এরা বহাল তবিয়তে আছে; নইলে জেলখানাই তাদের জন্য উপযুক্ত জায়গা হওয়া উচিত। এরা প্রগতির শত্রু। সমাজ উন্নয়নের অন্তরায়। কোনো-না-কোনো রাজনৈতিক দল এদেরকে পোষে। তাই এরা টিকে থাকে। আমৃত্যু এরা সমাজকে ক্ষতি করে। যুগ যুগ ধরে সাধারণ মানুষের জন্য উন্নয়নকর্ম, সদিচ্ছা, সুপ্রচেষ্টা এই হাজিগুরুদের সামাজিক দাপট ও কূটকৌশলের যাতাকলে পড়ে নিভৃতে কাঁদে। এরা সমাজের ভাগ্য-নিয়ামক শক্তি, এরা কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী। ব্যক্তিস্বার্থে এরা অন্ধ। এরা সমাজের যে কোনো ভালো কাজের শত্রু। নিজ স্বার্থ ছাড়া সামাজিক কাজে এগিয়ে আসে না, আবার অন্য কাউকে ভালো কাজ করতেও দেয় না। মস্তব গংকে এরা ব্যবহার করে। ওরা এদের হাতের পুতুল। এরা প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং আত্মশ্রেষ্ঠত্ব জটিলতায় ভোগে। এরা 'শ্রাদ্ধ যত তোমার,

রাম নাম আমার' তরিকার শিষ্য। মনের অন্ধকার এদের প্রকট– অজ্ঞতা ও মূর্খতা এদের পাপ। এ পাপে নিজে আমৃত্যু পুড়ে মরে, অন্যকেও জ্বালায়।

এতক্ষণে মাগরিবের আজান দিলো। স্বরূপ মাস্টারকে সাথে নিয়ে বৈঠকখানায় নামাজ শেষ করে উঠতেই বাড়ির ভিতর থেকে একজন ঝালমুড়ি ও চা দিয়ে গেলো। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বাবুই মাস্টার বললেন– জমির আলিরা হাজিগুরুর কূটকৌশলের সাথে পেরে উঠছে না। হাজিগুরু সমাজের সকল জটিল-কুটিল কাজ ও কূটবুদ্ধির শিখণ্ডী। হাজিগুরুরা এদের ব্যবহার করতে চাচ্ছে, আবার এদের মুখে দুর্নামের কালি দিয়ে সমাজচ্যুত করতে চাচ্ছে। আমি অবসরজীবনে এদেরকে সাথে নিয়ে সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে মাঠে নেমেছি। আমাদের এলাকায় শিক্ষার হার কম। অনুন্নত খেটে-খাওয়া জনগোষ্ঠীর বসবাস। এদের মধ্যে শিক্ষা ও সেবার আলো ছড়িয়ে দিতে পারলেই আমি খুশী। এতো দুর্বলচিত্তের মানুষ আমি নই, কিন্তু পথ কণ্টকাকীর্ণ এবং পথে অনেক বাধা, তা আমি জানি। এটা আমাদের সমাজব্যবস্থার দুর্বলতা। হাজিগুরু সহজে ছাড়া বান্দা নয়। তার হিংসুটে মনোভাব আজন্ম, আজীবন তা বজায় থাকবে। সে মস্তবকে ব্যবহার করে পায়ে পাড়া দিয়ে বিবাদ বাঁধাতে চাইবে, আরো কেস করাতে চাইবে। বানু মোল্লা তাঁর সায়েরিতে লিখেছিলেন, 'খলে ছাড়ে-না খলবুদ্ধি চ্যাঙে ছাড়ে-না ঘাই, কুত্তার লেজে তেল মাখালে আরো বাঁকা হয়'। সাপ যতবারই খোলস ছাড়ুক না কেন, স্বভাব বদল করতে পারে না।

জমির আলি বললো– ওরা বলে কি জানেন স্যার? বাবুই মাস্টার তো অনেক আগেই গ্রাম ছেড়ে ঢাকায় চলে গেছে, তার ভিটের ঘরও পুরোনো হয়ে ভেঙে গেছে, তার আবার গ্রামে কী? দান-খয়রাত করতে চাইলে ঢাকায় অনেক এতিমখানা আছে– সেখানে করুক। সে গ্রামে এসে নাম কিনতে চায়। তাকে নাম কিনতে দেওয়া হবে না। সে উড়ে এসে জুড়ে বসতে চায়, তা দেবো না। এখানে তার চামচাগুলো তাকে নিয়ে চলাফেরা করছে, তাদেরকে দা দিয়ে চুরাবো। এখানে কী হয় না-হয় বাবুই মাস্টারকে সব জানাচ্ছে। বাবুই মাস্টার বেশি বাড়াবাড়ি করলে মাথা কেটে তার মাথা নিয়ে ফুটবল খেলবো। এক বাবুই মাস্টারকে হজম করার মতো ব্যবস্থা আমাদের আছে। আমরা হাজিগুরুর দলে আছি– সে যা বলবে,

তাই করবো। বাবুই মাস্টার এখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান করার কথা বলছে। আমরা বুঝে দেখেছি, প্রতিষ্ঠান করার নাম করে আমাদের কাছ থেকে জমি নিয়ে সরকারের কাছে বেশি দামে বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা লাভ করবে। আমরা তাকে লাভ করতে দেবো না। আমাদের জমিতে আমরা গোরস্থান করবো। শুনেছি অবসরে যাবে। এখন মসজিদ মাদ্রাসা থেকে আয়ের পথ খুঁজছে।

বাবুই মাস্টার বললেন– দেখুন স্যার, আধুনিক টেকনোলজির যুগ। এখানে যে যা বলছে, করছে, রেকর্ড অবস্থায় ছবিসহ আমার কাছে চলে যায়। হাজিগুরুর আপনজনদের বক্তব্য– হাজি একদম সাদা দুধে-ধোয়া সাধারণ একজন নিরপেক্ষ মানুষ, তার সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা আমাকে দেওয়া হচ্ছে। সে খুব সহি দীনদার, তিনবার হজ করে এখন মাসুম বাচ্চাসদৃশ– মহাজ্ঞানী, সাক্ষাৎ ফেরেশতা। মাদ্রাসা ও এতিমখানা বিষয়ে সে উন্নয়ন চায়, তবে দ্বন্দ্বে জড়াতে চায় না। হাজিগুরুর বক্তব্য– মস্তব পালোয়ান নিরীহ মানুষ, তাকে যেন হয়রানি না করা হয়; মস্তব পালোয়ান যে কথা বলে, তা মিথ্যাভাবে আমার কাছে যায়। সাধারণ মানুষ বোঝে– এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ করাতে হাজিগুরু প্রতিহিংসায় জ্বলে মরছে। সে বিভিন্ন কৌশলে কাজটা ঠেকিয়ে দিতে চায়। সে চায়, সে যা না পারে– তা যেন অন্য কেউ না করে। এটা এক-ধরনের মানসিক ব্যাধি। সে মস্তবকে খেলাচ্ছে। মস্তবকে দিয়ে মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানায় যাবার রাস্তা দখল করাচ্ছে। আমি এই গ্রামেরই মানুষ, গ্রামে বড় হয়েছি, গ্রুপ পলিটিক্স, ভিলেজ পলিটিক্স কিছুটা হলেও বুঝি। প্রতিহিংসা করে গ্রামোন্নয়নের এ-কাজটা ঠেকাতে পারবে না। আমি কখনো মস্তব পালোয়ানের কাছে জমি চাইনি। তার সাথে কোনো কথাই হয়নি। মনগড়া অনেক কথাই ওরা মানুষকে বলছে, বাজে মন্তব্য করছে। আমি জানি ঐ শ্রেণির লোকের সাথে তর্ক করা আমার জন্য শোভনীয় নয়। আর ওর ঐ সামান্য চার শতক জমি আমার কোনো কাজে আসবে না। ওরা কাজটাকে বাধা দিতে গিয়ে বিভিন্ন সময় অসংলগ্ন মিথ্যা কথাবার্তা গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়াচ্ছে। মূলত হাজিগুরুর ইচ্ছাই মস্তব পালোয়ানের ইচ্ছা। আমি ওকে চিনি। ও শুধু মূর্খই নয়, অতি নিম্ন-পর্যায়ের মূর্খ। আমি ওকে মূর্খ বলি এই কারণে যে, ও যদি হাজিগুরুর তরিকা না ধরে কাজের পক্ষে থাকতো, বুদ্ধিমান হতো, তাহলে বুঝতো– এখানে ছয়-সাতটা

প্রতিষ্ঠান হলে এলাকার ছেলে-মেয়েদের মতো ওর পরিবারের সদস্যরাও লেখাপড়া শিখতো, এলাকার আরো দশ-বিশজন ছেলে-মেয়ের কর্মসংস্থান হতো, এলাকার লোকজন শিক্ষিত হতো, আর্থিক ও স্বাস্থ্যসেবা পেত; সেক্ষেত্রে এই রেষারেষির সৃষ্টি হতো না। ভালো থাকতে পারতো। হাজিগুরু ভেবেছে, প্রতিষ্ঠান হলে বাবুই মাস্টারের নাম হবে। হাজিগুরু হয়তো নীচে পড়ে যাবে। এটা একটা প্রতিহিংসা। তাই যত রকমের কুবুদ্ধি নিজে করছে এবং মস্তবকে দিয়ে করাচ্ছে। হাজিগুরু নিজের সুবিধার জন্য মস্তবকে লেলিয়ে দিয়েছে। অথচ মস্তব নির্বোধ, নিজের ভালোটাই বোঝে না। এদের সাথে আরো দু-ঘর লোক আছে।

আরো বললেন– আমি বিগত সাত বছর আগে কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথা হাজিগুরুর সামনে ঐ পাড়ার অনেককে একদিন মসজিদে বসে বলেছিলাম। বাড়ির দক্ষিণ পাশে পরিত্যক্ত পুকুরটা ভরাট করার কথা বলেছিলাম। উপস্থিত সবাই খুব উল্লসিত হয়েছিল। হাজিগুরু কোনোদিন না বলেনি। আমরা তখন উপস্থিত সবাইকে নিয়ে একটা কমিটি গঠন করেছিলাম। এর পর থেকে যখনই হাজিগুরুকে কাজের কথা বলি, বিভিন্ন কথা বলে কাজগুলোকে পিছনে ঠেলে দেয়। এড়িয়ে যায়। এদিক-ওদিক করে দিন পার করে, আর গ্রুপবাজি করে সময় পার করে, কিন্তু কাজ করার জন্য কোনোদিন এগিয়ে আসেনি। আমি তার বলা বিভিন্ন কথা ও অনেক কাজ বিশ্লেষণ করে বুঝেছি– সে কোনোদিনই কাজটা করবে না, আবার করতেও দেবে না। এটা তার সময়ক্ষেপণের একটা অপকৌশল। সে নিজ সিদ্ধান্তে কাউকে সাময়িক কাছে টানে, আবার স্বার্থে আঘাত লাগলে গালাগালি করে দূরে পাঠিয়ে দেয়; দশজনের কাজ ব্যক্তিস্বার্থ বিবেচনায় হতে পারে না। তার কুটিল বুদ্ধি অন্য কেউ বোঝে না– এটা তার এবং তার আপনজনদের ধারণা। পুকুর ভরাট করার সময়ও তাকে সাথে নেওয়ার অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। সে দশ-বারো দিন ঘুরিয়েছে। সে মাটি ভরাটে যায় না, আবার গোপনে মস্তবকে দিয়ে বাধা দেয়। সাপ হয়ে কামড়ে আবার ওঝা হয়ে ঝাড়ফুঁক করতে চায়। আরো অসংখ্য ঘটনায় তা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। বাধ্য হয়ে তাকে বাদ দিয়েই মাটি ভরাটের কাজ শুরু হয়েছে। খলের ছলের অভাব হয় না। সে যে কাজটা করতে দেবে না, তা বলতেও পারে না, আবার বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে আমাদের কাছে ভালো থাকতে চায়,

কাজকে দূরে ঠেলে দিতে চায়। মস্তবকে অনুচর হিসেবে ব্যবহার করে, তার দেওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে সব বুদ্ধির ছক আঁকে। অন্যকে অতটা বিশ্বাস করে না, মনে মনে রাখে। এসব যখন আমি পরিষ্কার বুঝে ফেললাম, তখন নিজ উদ্যোগে অন্যদের সাথে নিয়ে কাজ শুরু করে দিলাম।

বাবুই মাস্টার বলে চললেন– এই ঘটনার বেশ আগে, ঐ কমিটির সবাই কাজ করার উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে মসজিদ ও মাদ্রাসার নামে যে টাকা আদায় করতো; তা সব হাজিগুরুর হাতে তুলে দিতো। হাজিগুরু কোনোদিন টাকার হিসাব দিতো না। আমিও যে টাকা বিভিন্ন প্রয়োজনে মসজিদ-মাদ্রাসার জন্য পাঠাতাম, তাও কারো কাছে ঠিকমতো বলতো না। মসজিদের জমির টাকা সে আদায় করতো, হিসাব না-দিয়ে খরচ করতো। সে হিসাবের কোনো স্বচ্ছতা কোনোদিন রাখে না। কমিটির কেউ এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেই গালাগালি করতো, অপমানসূচক কথা বলতো। 'পাঁচ টাকা দেওয়ার মুরোদ নেই, আবার হিসাব চাতি আসে'– এটা তার ভাষা। সে নিজেও এত কৃপণ যে, দান-খয়রাতের জন্য তার হাত আদৌ খোলে না। দশ বছর আগে দশ হাজার টাকা রেজিস্ট্রি খরচ বাবদ অগ্রিম নিয়ে রেখেছে, মসজিদে জমি রেজিস্ট্রি করে দেবে বলে। আসলে পিঁপড়ের পাছা চিপে গুড় বের করে নেওয়া লোক সে। সে নিজেও কিছু গড়বে না, অন্যকেও গড়তে দেবে না; প্রতিহংসা করবে, পরের ধনে পোদ্দারি করবে– এটা তার প্রকৃতিপ্রদত্ত স্বভাব। শেষে ঐ কমিটির অনেককেই চোর, মোনাফেক, মিথ্যাবাদি বলে গালিগালাজ করাতে এবং মসজিদ নিজের বলে দাবি করাতে, ঐ পাড়ার অনেকেই আলাদা মসজিদ তৈরি করে এবং পৃথক হয়ে যায়, যা হয়তো আপনি জানেন। অনেক দিন পর ঘটনাটা সে বাধ্য হয়ে আমাকে জানায় এবং বলে যে– চোরের দল চলে যাওয়াতে ভালোই হয়েছে। পাড়ার উৎসাহী মানুষগুলোকে অপবাদ দিয়ে, দূরে ঠেলে দিয়ে নতুন মসজিদ তৈরিতে বাধ্য করা, এ মসজিদ নিজেদের বলে দাবি করা– তার মানসিক এ সংকীর্ণতাকে আমি কোনোদিন ভালোভাবে নিতে পারিনি। এ-কথা তার ভাতিজাকেও আমি ঐ সময় জানিয়েছিলাম। ওরা ভেঙে-চলে-যাওয়া পক্ষকেও বোঝায় যে, তাদের চলে যাওয়াতে আমি সন্তুষ্ট এবং এতে আমার সমর্থন আছে। এসব মিথ্যা কথা বলে আমাকেও তাদের কাছে খারাপ করে

তোলে। জমির আলিকে ব্যবহার করে ঐ পক্ষকে তাড়ায়। এখন জমির আলিও তাদের কাছে খারাপ। আমার কাছে গোপন রেখে মস্তব পালোয়ানকে সাথে নিয়ে মাদ্রাসার নতুন কমিটি আবার তৈরি করে– তাও আমাকে জানায় না। কৌশলে আমাকে বাদ দেওয়া হয়। অনেক তথ্যই আমার কাছে গোপন করতো, আমি তা পরে অন্যের কাছে শুনে বুঝতাম। সে শুধু ফোনে আমার কাছে জানতে চাইতো– কেউ আমাকে কিছু বলেছে কি-না। এ-কথার শান-এ-নুজুল পরে বুঝেছি। এতো ঘোরপ্যাঁচওয়ালা লোকের সাথে আমার মতো সোজা-বুঝ-নিয়ে-চলা লোকের মিল হওয়ার কথা না। অনেকবার তার সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমার মতভেদ হয়েছে। সে উন্নয়নের নামে টাকা নেবে, হিসাব রাখবে না, অথচ টাকাটা খরচ করতে হবে তার হাত দিয়ে; কিন্তু পরিকল্পিতভাবে ভিলেজ পলিটিক্স করবে মস্তবের মতো গণ্ডমূর্খ লোকদের নিয়ে, আমাকে আড়ালে রেখে। এটা আমার কাছে ভীষণ পীড়াদায়ক। মূলত যারা তার কথায় উঠা-বসা করবে, এমন অজ্ঞ-মূর্খ লোকগুলোকে নিয়ে সে মসজিদ-মাদ্রাসায় নিজের স্বার্থকে পাকাপোক্ত করে রাখতে চায়। মসজিদ দখলে রেখে মাদ্রাসাকে ও এতিমখানাকে অকেজো করে দিতে চায়। তাদের কুমতলব ও জটিল প্যাঁচ পুরোপুরি ধরা পড়ে গেছে।

বাবুই মাস্টার আরো বললেন– আমার নাম তো বাবুই। আমি বাবুইপাখির বাসা নিয়ে প্রায়ই ভাবি। আমার মনে হয়, দুনিয়াদারিটা বাবুই পাখির বোনা দোদুল্যমান একটা একবার-ব্যবহৃত বাসা ছাড়া আর কিছুই না। কোথা থেকে বাবুই উড়ে আসে, ঘর বাঁধে, তা কেউ জানে না। আবার সময় শেষে কোথায় যে উড়ে চলে যায়– তারও খোঁজ কেউ রাখে না। সময় অতিক্রান্ত হলে যার যার পথে কে-যে কোথায় হারিয়ে চলে যায়, তা অনন্তকাল বেখবর রয়ে যায়। এভাবেই অনাদিকাল ধরে সৃষ্টি চলে আসছে। আমাদের তা চোখ মেলে দেখার সময় নেই। আমরা ভোজবাজিতে মেতে আত্মস্বার্থ ও আত্মকলহে লিপ্ত। আর পরচর্চা করে দিন পার করে দিচ্ছি– কখনো মোনাফেকি করছি। নিজের হিসাবটা করছিনে। এ মাটির উপর উগ্র আলগা দাপট বেশিদিন স্থায়ী হয় না। শৈবালের নীড়ের মতো কালস্রোতে দ্রুত ভেসে চলে যায়। এ-সব বোঝার ও ভাবার মতো জ্ঞান তাদের নেই। মক্কাশরিফ প্রার্থনা ও পাপ মোচনের চেষ্টার জায়গা, জ্ঞানার্জনের জায়গা না।

অথচ হজ করে এসেই নিজেদেরকে পোশাক-আশাক ও কথার মাধ্যমে মহাজ্ঞানী ভাবে, স্বভাবের বদল করে না, এটা অন্যায়।

বাজার থেকে বাড়ি যাবার পথে বৈঠকখানায় কথাবার্তা শুনে আয়াজও এসে হাজির। স্বরূপ মাস্টার ওকে বসতে বললেন।

বাবুই মাস্টার বললেন– ফয়েজের কাছ থেকে শরিকানা আট শতক জমি কিনে মসজিদ, মাদ্রাসা ও এতিমখানায় যাবার পথ তৈরি করা হয়েছে। ওরা দলিলে রাস্তা হিসেবে ব্যবহৃত হবে উল্লেখ করে স্বেচ্ছায় রেজিস্ট্রি করে দিয়েছে। এতে মসজিদ, মাদ্রাসা ও এতিমখানায় যাতায়াতের সমস্যাটার সমাধান হয়েছে। এতেও দোষ হয়েছে। তাদের প্রতি চরম অত্যাচার চলছে। লাঠির জোর দেখাচ্ছে। মস্তব গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধানোর জন্য এ রাস্তাটা জোর করে দখলে নিতে চাচ্ছে, মামলা ঠুকছে– যদিও তার জমি দক্ষিণ দিকে রয়ে গেছে। মসজিদের জন্য করা এ-রাস্তা তো সে-ও ব্যবহার করতে পারে। মূল কথা কি আমি বলি শুনুন– আমি অবসরজীবনে বাপ-দাদার ভিটেয় আসি, এলাকার শিক্ষা-সেবার উন্নয়নে কাজ করি– এটা তারা চায় না। মসজিদ, মাদ্রাসা ও আমার সম্পদ নিজেদের স্বার্থে লাঠির জোরে ভোগ করতে চায়। আপনি জানেন, একজন শিক্ষকের অবসরজীবন বলতে কিছু নেই। শিক্ষক, আজীবন শিক্ষক। শিক্ষক যেখানেই যাবে শিক্ষার আলো জ্বালার চেষ্টা করবে, উন্নয়নের কথা বলবে। এখানেই তাদের আপত্তি। তারা যেসব কথা বলে বেড়াচ্ছে, অনেকের মুখেই তা শুনছি। তারা বলছে– বাবুই তো ভিটে-বাড়ি ছেড়ে ঢাকায় চলেই গেছে, আবার এখানে সে আসবে কেন? সে ফিরে এসে এলাকার উন্নতি করে নাম কেনবে, এটা হতে দেওয়া যাবে না। তাদের কেউ বলছে– 'ঢাকা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসবে, তা হতে পারে না।' এজন্যই এত হুমকি-ধমকি, পায়ে পাড়া দিয়ে মারামারি করার চেষ্টা, প্রতিহিংসা– জমি দখলের অজুহাত। তাদের জমি ছাড়াই আমাদের কাজ হবে। আমি পাঁচ গ্রামের লোকজনকে সাথে নিয়ে কাজে নেমেছি, আপনাকে সাথে পেয়েছি। তাদের ঐ খল-কুটিল বুদ্ধির ধারেকাছেও আমরা যাব না। তারা আমাদের সহযোগিতায় না আসুক– ক্ষতি না করে দূরে থাক। আমার বক্তব্য পরিষ্কার– শিক্ষকতা করে তো পুরো জীবনটা অতিবাহিত করলাম। অর্জিত সম্পদ ছেলে-মেয়েদের ভরণ-

পোষণের কাজে ব্যয় করেছি, তাদেরকে লেখাপড়া শিখিয়েছি। গরিব আত্মীয়-স্বজনকে যথাসম্ভব দেখভাল করেছি। অবসরকালীন পাওনার কিয়দংশ সন্তানদের জন্য রেখে বাকিটা এই শিক্ষা-সেবা ট্রাস্টে ব্যয় করছি। ট্রাস্টের অধীনে বেশ কয়েকটা প্রতিষ্ঠান করতে চাচ্ছি। পৈতৃক জমি-জমা যথাসম্ভব এই শিক্ষা-সেবা ট্রাস্টের নামে অপ্রত্যাহারযোগ্য দলিলের মাধ্যমে লিখে দিয়েছি। আসলে ঐ জমি-জমা আমারও না, বাপ-মা রেখে গেছেন আমার ব্যবহারের জন্য। এটা আমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ। গ্রামের সাধারণ ও হতদরিদ্র মানুষের শিক্ষা এবং আর্থিক ও স্বাস্থ্য-সেবার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছি। এতেও তাদের গা-জ্বালা করছে। যা করেছি ছেলে-মেয়েদের সাথে পারমর্শ করেই করেছি। আমি আমার পরিবারের এই বাড়তি সম্পদটা দিয়ে এলাকার সাধারণ মানুষের শিক্ষা ও সেবার কাজ করে যাব। আমার অবর্তমানে সাধারণ মানুষের আমানত তাদের স্বার্থেই তারা রক্ষা করবে। এখানে টাকা জোগানোর ব্যাপারটা কোনো বড় বিষয় নয়। টাকা সঠিক পথে ব্যবহার হলে সাধারণ মানুষের অল্প দানে বৃহৎ কিছু করা সম্ভব। আমি আশাবাদী যে, ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনো সজ্জন ব্যক্তি এর দায়িত্বভার নিতে এগিয়ে আসবেন। প্রকৃতির নিয়মই এমন যে, কোনো জায়গা ফাঁকা পড়ে থাকে না।

আয়াজ এতক্ষণে মুখ খুললো। বললো– স্যার, ফয়েজ মসজিদ, মাদ্রাসা ও এতিমখানায় যাতায়াতের রাস্তা দিয়েছে বলে তাদের উপর খুব অত্যাচার চলছে। মাঝরাতে বাড়িতে ঢুকে বিশ্রী ভাষায় গালাগালি করছে। মৃত্যুর ভয় দেখাচ্ছে। এতদিন জমি দখল করছিল দক্ষিণ কোনায়, এখন সে রেজিস্ট্রি করে দেওয়ার পর বলছে– এই পথই আমার জমি; আমার জমি দিয়ে কাউকে মসজিদ-মাদ্রাসায় যেতে দেবো না। ও তো এভাবে দাবি করতে পারে না। কাজটা বন্ধ করে দিতে চায়– এ জন্যই এত কিছু বলা। হাজিগুরু তার পক্ষে বিভিন্ন জনের কাছে সাফাই সাক্ষী দিচ্ছে। পথের ব্যাপারেও মস্তবের পক্ষ নিচ্ছে। মসজিদ-মাদ্রাসা ও এতিমখানায় যাবার এ পথও তো মস্তব ব্যবহার করতে পারে, কেউ তো বাধা দিচ্ছে না। বলছে– বাবুই মাস্টারসহ ওদেরকে জেলে ঢুকিয়ে তবেই ছাড়বো। মস্তব তাকে খুব আপত্তিকর কথা বলে বাপ-মাকে তুলে গালিগালাজ করছে। হাজির

যে কোনো ধর্ম নেই– এটা সাধারণ মানুষ বলে। সব সময় নিজের স্বার্থে কাজ করে। তার অর্থলোভ কারুনের স্বভাবকেও হার মানায়। যতবারই হজ করুক না কেন, কথার কোনো মূল্য নেই, স্বার্থ পেলেই নিজেকে বিক্রি করে দেয়। বাবুই ভাই গ্রামে থাকে-না বলে যখন যা খুশি মিথ্যা রটিয়ে পার পেয়ে যায়। মানুষ কিন্তু হাজিগুরুকে নীতিহীন, স্বার্থান্ধ ও বখিল হিসেবে জানে। যাদেরকে হাজিগুরু মসজিদ থেকে তাড়িয়ে অন্য মসজিদ বানাতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, এখন আবার গোপনে মস্তব পালোয়ানকে তাদের কাছে পাঠিয়ে তাদের হাত করার চেষ্টা করছে। তাদেরকে এখন বাবুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে লাগাতে চায়। ভিলেজ পলিটিক্স তো, কুটিল রাজনীতি এবং পারস্পরিক স্বার্থ ও দ্বন্দ্বে বর্তমান সমাজ দিশেহারা। বিভিন্ন দলীয়-উপদলীয় কোন্দল, ব্যক্তিস্বার্থ, গ্রুপভিত্তিক হানাহানি, অন্তর্দ্বন্দ্বে মত্ত। তাদের কেউ কেউ এখন হয়তো হাজিগুরুর হাতের লাঠি হিসেবে কাজ করবে। গ্রামের কিছু লোকের চরিত্র বোঝা খুব কঠিন, খুব ধান্দাবাজ, জটিলতায় ভরা। রাজনীতি এসে অনেক মানুষের চরিত্র খুব জটিল করে দিয়েছে। সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথে বেশি মজা পাচ্ছে। হাজিগুরুকে মস্তব পালোয়ান ছাড়াও টাউট কাউলা খুব সহযোগিতা করছে। এরা তিনজন প্রায়ই গোপনে বৈঠক করে। কার বিরুদ্ধে কী বলতে হবে, কার নামে কেস করতে হবে, সব যুক্তি করে। টাউট কাউলার তো জিন-ভূতের কবিরাজি ও ক্যাম্পের দালালি করে কিছু রোজগার ছাড়া আর কোনো পথ নেই। ঐ গণ্ডমূর্খদের গুরু হিসেবে কাজ করে বলে হাজিগুরুকে সবাই মূর্খগুরু বলে। এলাকার যত খারাপ লোকের সাথে তার সখ্য। গ্রামের অবস্থা ক্রমশই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তবে বাবুই ভাইয়ের এ কাজে চার ঘর লোক বাদে সবারই সমর্থন আমরা দেখছি। বাবুই ভাইয়ের কাজ বন্ধ করার জন্য মস্তব পালোয়ান বাবুই ভাইসহ ফয়েজদের নামে কেস করেছে, আবার ইনজাংশনও জারি করাতে উঠে-পড়ে লেগেছে। এগুলো সবই হাজিগুরুর কূটচাল– মানুষ তাই বলে।

আয়াজ আরো বললো– বাবুই ভাইকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়, আবার এ কথা ঢাকায় বাবুই ভাইয়ের কানে গেলে ফয়েজকে দোষ দেয় যে, সে সব কথা বলে দিয়েছে। মস্তব পালোয়ান তার ছোট ছেলেকে সাথে নিয়ে দা ও লাঠি হাতে করে সব সময় ঘোরাফেরা করে। বলে, ঢাকার এ-কাজে যে-ই সাহায্য করতে আসবে

তাকেই একটা একটা করে কোপাবো। একটাকেও ছাড়বো না। সেদিন মসজিদের পাশে দাঁড়িয়ে ১০/১২ জন লোকের সামনে এসব কথা বলতে লাগলো। কেউ ভয়ে কোনো প্রতিবাদ করলো না। হাজিগুরুর কানে এ কথা পৌঁছামাত্র সাফাই সাক্ষী শুরু করে দিলো, 'এমন কথা মস্তব বলতেই পারে না' বলে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল। এ কথা নিশ্চয়ই ফয়েজ বানিয়ে বলেছে ও বাবুইয়ের কানে লাগিয়েছে বলে প্রচার করতে লাগলো। দু-দিন পর মস্তবকে দু-জনের সামনে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, 'এই তুই কি এমন কথা বলেছিস'? মস্তব তো পুরো অস্বীকার– না, বলিনি। এবার হাজিগুরু হুঙ্কার ছেড়ে তাদের দু-জনকে ধরে মারে আর কী! ঐ যে, ও বলছে– বলিনি, ও কি মিথ্যা বলছে? হাজিগুরু 'নরম কাঠে সুতোরের বল' ফিরে পেলো। চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'এসব কথা এখান থেকে ঢাকা পর্যন্ত লাগায় কিডা? তার আগে বিচার হবে।' ১০/১২ জনের কথার কোনো মূল্য নেই। মস্তব পালোয়ান বলেছে– বলিনি, এটাই শেষ কথা। কথা বলছে, মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে– তাতে দোষ নেই, বাবুই ভাই শুনলেই যত দোষ।

আচ্ছা, মস্তব পালোয়ান ও হাজিগুরু তো তোমাদের বংশের লোক বলেই জানি। ওদের মানসিকতা ও মুখের ভাষা এত নিম্নমানের কেন? একই গাছের দু-ডালের ফল দু-রকমের কেন? এ এলাকার সবার মনেই এ খটকাটা লাগে। স্বরূপ মাস্টার বাবুই মাস্টারের দিকে একটু তাকালেন।

আপনি এ এলাকার প্রবীণ লোক। আপনার অজানা কিছুই নেই। হাজিগুরু যে ডালে জন্মেছে সে ডালেও ভালো ফল আছে। তার ভাতিজারাও আমাদের সঙ্গে আছে। আমাদের অনেক পুরোনো বংশ– তা আপনি জানেন। আমাদের এ বংশধারা অতীতের অনেক দূর থেকে বয়ে আসছে। একটা অংশ উপরে উঠে গেছে, তারা অনেক উদার ও নৈতিকতাসমৃদ্ধ। এদের এ ধারাটা স্রোত হারিয়েছে। স্রোতের পাশে শেওলায় ছেয়ে গেছে। এরাও এ বংশেরই একটা হিংসুটে খারেজি বাতিল অংশ। এদের জ্ঞানের আলো ও শিক্ষাচর্চা নেই। তাই অজ্ঞতার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। এরা আজন্ম অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় জীবন গড়েছে– এরা বিবেকহীন, পরখেকো, একমুখো বিচার-বিবেচনা। এরা বড়ই অকৃতজ্ঞ ও আত্ম-বিস্মৃত। এদের মনে অসার অহমিকা। এরা পথ হারিয়েছে– এরাই গণ্ডমূর্খ। এদের

মনের মধ্যে হিংসার বীজ সব সময় গজগজ করতে থাকে। এদের মনটা খুব ছোট। কোনো কিছুকে উদার চোখ দিয়ে দেখে না। প্রতিহিংসা এদের আজন্ম। স্বার্থপরতা, অত্যাচারী ও হিংসুটে মনোভাবে মস্তব ও হাজিগুরুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু হাজি-পোশাকের রংয়ে। এরা খুব দাম্ভিক– এদের যারা চেনে, সবাই তা জানে। এরা নিজে দোষ করে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজে ভালোমানুষ সাজে– এটা ওদের স্বভাব। হাজিগুরু ঐ অংশের বিষবৃক্ষ। বাতিল অংশটাকে ছায়া দিয়ে রাখে। বিষবৃক্ষ থেকে প্রতিনিয়ত বিষবৃষ্টি বর্ষিত হয়। ওদের কথা এমন বিষমাখা যে, তা ছুড়ে তারা সাধারণ মানুষকে তীরবিদ্ধ করে। আবর্জনা থেকে যে পচা-দুর্গন্ধ বের হয়, আবর্জনা নিজেও তা জানে না, বুঝতেও চায় না। মনুষ্যসমাজে ওদের চলাফেরা নেই বললেই চলে। কুটিল বুদ্ধি এবং দল পাকানো ছাড়া ভালো কিছু এরা বোঝে না। এদের জন্ম থেকে এরকমই দেখে আসছি। এ স্বভাব আমৃত্যু থাকবে, আমাদের তা ভোগ করতে হবে। তাদের চিন্তাধারার মধ্যে অস্বচ্ছতা বেশি। নিজের স্বার্থের বাইরে কিছুই করে না। তাদের সাথে এলাকার কারো সম্পর্ক স্থায়ী হয় না। সবাই বলে, হাজিগুরুর সাথে সবারই পার্ট-টাইম সম্পর্ক। প্রকৃতিগতভাবেই তার মনটা বিষাক্ত। ওরা কোনো কিছুরই ভালো দিকটা ভাবতে পারে না, জটিল এবং কুটিল দিকটাকে বেছে নেয়। বৃহৎ পৃথিবীকে নিয়ে ওরা ভাবে না। একটা মুখ-সরু ভাঁড়ের মধ্যে জিয়ানো মাছের মতোই ক্ষুদ্র গণ্ডিতে ওদের ঘোরাফেরা। একেই তারা বড় পৃথিবী বলে গর্ব করে। কথার মধ্যে লেফাফা উগ্রতা বেশি। চলায়-ফেরায় তারই মতো দু-চারটে গণ্ডমূর্খকে বেছে নিয়ে জীবন অতিবাহিত করে যাচ্ছে। এ পক্ষকে আমাদের বংশের বলে পরিচয় দিতে মাথাটা লজ্জায় হেট হয়ে যায়। নিরক্ষরতা অভিশাপ, কুশিক্ষা অপরাধ। যারা আমার সাথে কাজ করছে, তাদেরকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে, কখনো ভয় দেখিয়ে কাজ থেকে দূরে রাখতে চায়। বলতে চায়, সে ঢাকায় বসে একাকী কোনোদিনই কাজ করতে পারবে না। তোরা ওকে সহযোগিতা করতে যাবিনে। আর যে যাবে তাকে শায়েস্তা করা হবে। এ মসজিদ আমাদের, অন্য কারো এ মসজিদে আসার দরকার নেই। বাবুই মাস্টারকে মাদ্রাসা, হেফজখানা ও এতিমখানা ভাগ করে দেবো। নিতান্ত মূর্খ ছাড়া কি এসব কথা কেউ বলতে পারে? অনেক কথা বলে বাবুই মাস্টার এবার থামলেন।

সহসা আবার বলে উঠলেন– আয়াজ ও জমির আলি, তোমরা ভেবো না যেন, আমি লেখা ও পড়া না-জানা লোককে মূর্খ বলছি। লেখাপড়া না জানলে তাকে নিরক্ষর বলা যায়– মূর্খ বলা যায় না। মূর্খ ভিন্ন কথা। আমরা বাংলাতে অজ্ঞ, বিবেকহীন, পথভ্রষ্ট, কাণ্ডজ্ঞানহীন, অশিক্ষিত, পথহারা ইত্যাদি দিয়ে মূর্খের প্রতিশব্দ তৈরি করি। অনেকে লেখাপড়া শিখেও মূর্খ হতে পারে। 'সিরাতাল মুস্তাকিম' যে হারিয়েছে সেই মূর্খ। গোমূর্খগুলো এ সমাজেই দাপটের সাথে মিথ্যা অহমিকা নিয়ে চলাফেরা করে বেড়াচ্ছে। এদের কোনো নীতি-নৈতিকতা নেই, নিজের স্বার্থের জন্য এরা যে-কোনো কিছু করতে পারে ও বলতে পারে। এরা প্রকৃতি থেকে কোনো শিক্ষা নেয় না। আত্ম-অহমিকার অন্ধকারে এরা নিমজ্জিত। ফার্সি ভাষায় মূর্খ শব্দের কাছাকাছি একটা শব্দ পাওয়া যায়, বাংলা ভাষাতেও সে শব্দটা ব্যবহার করা হয়। ফার্সি ভাষাতে এদেরকে 'গোমরাহ' বলে। 'গুম হওয়া' মানে হারানো, আবার 'রাহ' মানে পথ। অর্থাৎ সঠিক পথ যে হারিয়েছে সেই 'গোমরাহ'। বর্তমানে সমাজে সাধারণ মানুষ ছাড়া জটিল-কুটিল, ছল-খল, বিবেকবোধহীন মূর্খগুরু সবই গোমরাহির পর্যায়ভুক্ত। মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব তার চিন্তাধারার কারণে। মানুষ তার চিন্তাধারার সমান বড়। চিন্তাধারার নিম্নতায় নীচু, আবার চিন্তাধারার উচ্চতায় উঁচু। সেজন্য একজন গরিব মানুষও চিন্তার স্বচ্ছতায় বড়লোক হতে পারে, আবার ধনী ব্যক্তিও নিম্ন চিন্তা-চেতনার কারণে ছোটলোক হতে পারে। বড়লোক ছোটলোক সবই মানুষের বৈশিষ্ট্যের নানা রূপ।

রাত বেড়ে যাচ্ছে। বাবুই মাস্টার ওঠার তাগাদা দিলেন। সামনে দেড় কিলোমিটার পথ যেতে হবে। উঠতে গিয়ে জমির আলি বললো– স্যার, মস্তব পালোয়ানের ছোট ছেলে মানুষের কাছে বলে বেড়াচ্ছে কি জানেন? এখানে যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও টেকনিক্যাল স্কুল করলে মসজিদ এলাকায় এনজিওরা চলে আসবে, সেখানে গান-বাজনার আসর বসবে। ইংরেজি-পড়ুয়া বাবুই মাস্টারকে এখনই প্রতিহত করতে হবে। ছোট ছেলেটা কোনো এক মাদ্রাসা থেকে কোরান ও হাদিস পড়ার তালিম নিয়েছে। তার গর্বে মস্তব ও হাজিগুরু ভাবখানা এমন দেখায় যে, তারা যেন ইসলাম কিনে ফেলেছে।

বাবুই মাস্টার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েও আবার বসলেন। বললেন– স্যার, তাদের এই অপপ্রচারে আমি বিচলিত নই। তবে কখনো-কখনো মনটা খারাপ হয়। কাজের প্রয়োজনে এনজিও আসতে হলে আসবে। ওখানে একটা কমিউনিটি ক্লিনিকের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কোনো এনজিও এই এলাকার চিকিৎসাসেবা দিতে এগিয়ে এলে গ্রামের সাধারণ লোকের জন্য তা নিশ্চয়ই ভালো। ওখানে বর্তমানে যে এতিমখানা আছে, সব ধর্মবর্ণের এতিমদের জন্য তা উন্মুক্ত। আমাদের তো সংকীর্ণ চিন্তাধারার বাইরে এসে সমাজের সবার জন্য কাজ করে যেতে হবে।

তিনি বলে চললেন– স্যার, আমি কিন্তু মস্তবপুত্র মার্কা মৌলভিদের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে। আমি ইসলামের পুনর্জাগরণে বিশ্বাসী। বিভিন্ন গোঁড়ামি ও বৈচিত্র্যমুখী শিক্ষাহীনতার কারণে ইসলামের আজ এ ভগ্নদশা। মৌলভি সাহেবদের অনেকে ইসলামকে ধর্ম হিসেবে না-নিয়ে শুধু ইহলৌকিক কর্মবিমুখ পেশা বানিয়ে ছেড়েছে।

আমাদের এ উপমহাদেশে অতীতে মুসলমান নেতাদের নেওয়া অনেক সিদ্ধান্তে ভুল ছিল, যার ফলস্বরূপ বর্তমানে এ দশা। বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশের ইসলামি শিক্ষার অবস্থা এ-রকম নয়। এ ভুলের সংশোধন প্রয়োজন। নইলে ভবিষ্যতে আরো বিস্তার লাভ করবে। আরো সংঘাতময় পরিবেশের সৃষ্টি হবে। ইসলামি শিক্ষার্থীদের মানসিকতায় ও চিন্তাধারায় পরিবর্তন আনতে হবে। সিস্টেম পরিবর্তন করতে হবে। অসংখ্য মাদ্রাসা-পড়ুয়া লেবাসধারী মৌলভিসাহেব বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞান-বিজ্ঞানকে; সমাজবিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাসকে মাদ্রাসা নামের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বাদ দিয়ে মুসলমানদের খোদাভীরু জিন্দা-লাশের জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করেছে এবং সম্ভাবনাময় প্রতিভাবান মুসলমানদের আধুনিক ও টেকনোলজিক্যাল জীবন-ব্যবস্থাবিমুখ করে মাদ্রাসার কানাগলিতে জীবনকর্ম ও জীবনোচ্ছ্বাসকে সমূলে কবর দিয়েছে। ইসলাম তো কোনো পেশার নাম নয়– পূর্ণাঙ্গ একটা ইহলৌকিক জীবনব্যবস্থা ও ধর্মের নাম। আমরা কেন সেটাকে পিরপূজা, কবরপূজা, পুরোহিতপূজা, খাজাবাবাপূজা, ভান্ডারীপূজা, ফেরকাপূজা, মোল্লাপূজা ইত্যাদি লজ্জাজনক পেশার মোড়কে পেঁচিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছি! এ দেশে হিন্দুসংস্কৃতির দীর্ঘ সহাবস্থানের কারণে আমরা

পুরোহিতবাদ ও পূজাতত্ত্বে ঝুঁকে পড়েছি। আমার বিশ্বাস, যে-কোনো ধর্মীয় শিক্ষার ভিত ছাড়া কোনো শিক্ষাই পূর্ণাঙ্গতা পায় না। ধর্ম যেখানে থাকে না, সেখানে অধর্ম এসে দানা বাঁধে। ধর্মশিক্ষা তওহিদবাদ ও মূল শিক্ষার বুনিয়াদ। তবে ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে হাতেখড়ি হলেও মুসলমানদের আধুনিক ও টেকনোলোজিক্যাল জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী হতে হবে। ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও বেহেশতি হুর-তত্ত্ব থেকে বের হয়ে আসতে হবে। ইসলামের অতীত ইতিহাস তাই-ই বলে। যারা ইসলামকে সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রেখে ঠুনকো, অপ্রয়োজনীয়, ক্ষুদ্র বিষয়কে সামনে এনে নিজেদের মধ্যে ধর্মীয় বিভেদ তৈরি করেছে, এরাই এদের অজ্ঞতা ও জ্ঞানহীনতা দিয়ে দিনে দিনে ইসলামের কবর তৈরি করছে এরং ইসলামকে অন্য ধর্মের লোকদের মধ্যে জঙ্গিবাদের ধর্ম হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। শুধু আরবি ও সুন্নতের কিছু পাঠ অপরিণামদর্শী আত্মঅহংকারী জ্ঞানবিধ্বস্ত কিছু মৌলভি আত্মস্থ করে, সাধারণ মানুষের মধ্যে তা জাহির করে আয়োজিত ধর্মসভায় বেশি লোকের সমাগম করতে চায়। এরাও ধর্ম বিক্রির দায়ে দোষী। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত ধার্মিক লোক অনেক উদার।

আমি স্যারকে বলছি, মূলত ইহলোকের পুরো ভালো কর্মকাণ্ডের মধ্যেই ইসলাম নিহিত– এটা আমার বিশ্বাস। ইসলাম মানুষের ও সৃষ্টির কল্যাণে সমস্ত কাজের মধ্যে ব্যাপ্ত। সৃষ্টি ও স্রষ্টার প্রতি দায়িত্ব পালন মানুষের প্রধান কর্ম হওয়া উচিত। স্রষ্টার নিদর্শন সৃষ্টি। নামাজ রোজা ছাড়াও সৃষ্টির সেবার মাধ্যমে স্রষ্টার ইবাদত করতে হবে। আমরা সৃষ্টির দর্শনে স্রষ্টাকে খুঁজে পাই। স্রষ্টা তার সৃষ্টির মধ্যে ব্যাপ্ত। সৃষ্টির সেবাই মানুষের ধর্ম। একজন মুসলমানের সাধারণ ও টেকনিক্যাল জ্ঞান– যা মানবকল্যাণে ব্যবহৃত হয়, তা শেখা ও চর্চা করা জরুরি। জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে তাবৎ পৃথিবী মুসলমানরা পরিচালনা করতে সক্ষম। কারণ এদের হাতে আছে পথ-না ভোলা 'বিজ্ঞানময় কোরআন'। তবু এরা আত্মভোলা হয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানে উৎকর্ষ না দেখিয়ে অন্য জাতির ভৃত্য ও অনুকম্পার পাত্রে পরিণত হয়েছে। অতি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আত্ম-কলহে নিরতিশয় মত্ত। সমগ্র নভোমণ্ডলের জ্ঞানচর্চা ছেড়ে ছোট থেকেই ভিক্ষার তালিম নিচ্ছে এবং কোন কোন ভিক্ষা নিজের

পকেটজাত করা যাবে, তার মাসআলার চর্চা করছে। তওহিদ বিশ্বাসে বলিয়ান বাঘের বজ্রনিনাদ-হুঙ্কার আজ আত্ম-বিস্মৃত মেছোবাঘে পরিণত হয়েছে। ভোদড়ের সাথে মাছ ভাগাভাগি করে খেতে গিয়ে মাছ কাড়াকাড়িতে নিজেরা শতধা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। সবই জ্ঞানহীন মূল্যহীন আত্ম-বিস্মৃতি এবং আত্ম-বিশ্লেষণের ঘাটতির অনিবার্য পরিণতি। এগুলোকে দূর করতে হবে। মানুষ বাদে সমস্ত প্রাণিকূলের বিবেক ও মানুষের বিবেকের মধ্যে পার্থক্য কী? যার বিবেক নেই– তাই বিবেকের দংশন নেই, মানুষ্যত্ব নেই; সে-ই মূর্খ, গোমরাহ, পশুতুল্য। প্রকৃতির প্রতিটি ঘটনার মধ্যে বড় বড় শিক্ষা রয়ে গেছে। দরকার শাণিত বিবেক ও ভাবুক মন নিয়ে একটু ভেবে দেখা, আরেকটু মনোনিবেশ করা; সেখানে সত্যের সন্ধান লুকিয়ে আছে। এ-সব শিক্ষা পাঠ্যসূচিতে আনা দরকার। অজ্ঞ, মূর্খ হলে প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নেয়। প্রকৃতির প্রতিশোধ বড্ড নির্মম। কোনোক্রমেই এর প্রতিশোধ থেকে নিস্তার পাওয়া যায় না। প্রকৃতিও স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন। অজ্ঞতা ও মূর্খতা পাপ। এর প্রায়শ্চিত্তও অবধারিত। ভোগবাদী হবার দরকার নেই। ভোগে সাময়িক তৃপ্তি পাওয়া যায় বটে– স্থায়ী তৃপ্তি নেই। ত্যাগেই তৃপ্তি, এ-তৃপ্তি অনন্ত। বস্তুবাদী হবার তো প্রয়োজন নেই। আমার যেমন স্রষ্টা আছে, প্রকৃতিরও একজন স্রষ্টা থাকাটাই স্বাভাবিক। স্রষ্টা আছে বলেই সৃষ্টি আছে। সৃষ্টিই স্রষ্টার যথার্থ নিদর্শন। স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং সৃষ্টির সেবার মাধ্যমে হৃদয়ের অন্তর্নিহিত প্রশান্তিই প্রকৃত সুখ। এ বিষয়গুলো ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী সবাইকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে।

স্যার, আপনাকে পেয়ে কয়েকটা মনের কথা না-বলে পারলাম না। আপনার অবসরকালীন চিন্তার কিছু খোরাক দিয়ে গেলাম– বলে বাবুই মাস্টার উঠে দাঁড়ালেন।

এ সময় স্বরূপ মাস্টার বললেন– রাস্তা দিয়ে যারাই যায়, তাদের অনেক কথাই আমি কান করে শুনি। রাস্তার ধারের এই বৈঠকখানায় বসে আমি তোমাদের গ্রামের সব খবরই পাই। মস্তব পালোয়ান ও তাদের গুরুর পতন অনিবার্য। কোনো স্বার্থান্ধ ব্যক্তি সৎ ব্যক্তির মহৎ উদ্দেশ্যকে ভালো চোখে দেখে না, স্বার্থান্ধ ব্যক্তি তার নিজের চরিত্র দিয়েই অন্যকে বিচার করে। ক্ষমতার দাপট, অন্যায় বেশি দিন টেকে

না। কত অন্যায়, অবিচার যে এই কঠিন মাটির নীচে চাপা পড়ে গেছে, আমরা কেউই তার খোঁজ রাখিনে। এগুলো সাময়িক আস্ফালন মাত্র। আমি তোমাদের সাথে আছি। সমাজে আমারও তো একটা অবস্থান আছে। ঐ-সব গোমূর্খদের মুখে তোমার সমালোচনা শোভা পায় না। ওদের কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। ওদের কথায় সাধারণ মানুষ তোমার থেকে দূরে যাবে না। ওদের অপপ্রচার কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যাবে। বাতিল কখনো সত্যের কাছে টিকতে পারে না। তুমি তোমার শিক্ষা-সেবার আলো হাতে নিয়ে সামনে এগিয়ে যাও। আগামীকাল সকালে একটা লোক পাঠিও। আমি একটা রিক্সাভ্যান নিয়ে তোমার নির্মাণাধীন 'শিক্ষা-সেবা ট্রাস্ট কমপ্লেক্স' একটু ঘুরে দেখে আসতে চাই। সকালে দেখা হবে।

পরদিন সকালে জমির আলি একটা রিক্সাভ্যান নিয়ে স্বরূপ মাস্টারকে আনতে গেলো। তার মসজিদ কম্পাউন্ডে পৌঁছানোর আগেই পাড়ার অনেকে উপস্থিত হলো। স্বরূপ মাস্টারের আসার কথা শুনে চলতি পথের কিছু লোকও মসজিদ কম্পাউন্ডে এলো। মসজিদের সামনে নরম ঘাসের উপর দূরত্ব বজায় রেখে সবাই বসে পড়লো। কিছুক্ষণের মধ্যে স্বরূপ মাস্টার হাজির হলেন। তিনিও উপস্থিত লোকদের সাথে ঘাসের উপর বসলেন। স্বরূপ মাস্টার ট্রাস্ট কমপ্লেক্সে এসে একাত্মতা প্রকাশ করায় উপস্থিত সবাই উজ্জীবিত হলো। বাবুই মাস্টার মাদ্রাসার মৌলভি হুজুরকে ডেকে তার ছাত্রদের ওখানে আসতে বললেন। মাত্র পনেরো জন ছাত্রকে উপস্থিত পাওয়া গেল। বাকি সবাইকে করোনা ভাইরাসের কারণে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে মৌলভি হুজুর জানালেন। বাবুই মাস্টার হুজুরকে সবার উদ্দেশ্যে মুনাফেকের বৈশিষ্ট্যের উপর কিছু বয়ান করতে বললেন।

হুজুর বয়ান শুরু করে দিলেন: মুনাফেক পাহাড়ি ইঁদুরের মতো অত্যন্ত ধূর্ত। এদের সহজে চেনা যায় না। মুনাফেক এমন ব্যক্তি যে ইসলামকে মুখে প্রকাশ করে এবং অন্তরে কুফরিকে লালন করে। মুনাফেক দু-মুখো স্বভাবের। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আর মানুষের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে, যারা বলে আমরা আল্লাহ ও আখেরাতে ইমান এনেছি, অথচ তারা মুমিন নয়। মুনাফেক খুবই ধূর্ত, প্রতারক ও ধোঁকাবাজ; এদের মুখে এক, ভিতরে আরেক। আল্লাহ ও মুমিনদের সাথে তারা প্রতারণা করে। তারা মনে করছে, এতে তারা সফলকাম ও বিজয়ী

হচ্ছে। অথচ প্রকারান্তরে তারাই প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত হচ্ছে। সত্য পথ থেকে দূরে গিয়ে পথভ্রষ্ট হচ্ছে এবং তিলে তিলে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আল্লাহ ও ইমানদারদের তারা ধোঁকা দিতে চায়। আসলে তারা অন্য কাউকে ধোঁকা দিচ্ছে না, বরং নিজেদেরই প্রতারিত করছে, অথচ তাদের সে অনুভূতি নেই। 'মুনাফেকরা সমাজে বিভিন্ন ধরনের ফ্যাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি করে থাকে, অথচ তারা প্রচার-প্রপাগান্ডায় নিজেদের শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী বলে পরিচয় দেয়।' আর যখনই এদের বলা হয়, পৃথিবীতে ফেসাদ সৃষ্টি করো না, তার উত্তরে বলে– আমরাই তো সংশোধনকারী ও শান্তিকামী। 'মুনাফেকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী'। মুনাফেকরা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টিকারী। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'যারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করেন, তারা যা করছে, তা খুবই মন্দ।' 'মুনাফেকরা অহংকারী ও দম্ভিক।'

বাবুই মাস্টার উঠে গিয়ে হুজুরকে ধন্যবাদ দিলেন। তিনি স্বরূপ মাস্টারকে 'ট্রাস্ট কমপ্লেক্স'-এ আসার জন্য কৃতজ্ঞতা জানালেন। এবার ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে বললেন, প্রত্যেক মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীকে প্রাথমিকভাবে ইসলামি শিক্ষায় জ্ঞানার্জন করা জরুরি। এক্ষেত্রে কোরআন শিক্ষা করা ও হাদিস জানা বিশেষ প্রয়োজন। আমি শুনেছি, তোমরা খুব মেধাবী ছাত্র। তোমরা নিশ্চয়ই জীবনের পেশাকে বেছে নেওয়ার জন্য কোনো-না-কোনো বিষয় নির্বাচন করেছো। তোমরা আমাকে একে একে বলো– কে কী হতে চাও। চারজন হাত তুলে জানালো– ডাক্তার হতে চায়, দুইজন ইঞ্জিনিয়ার, চারজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, তিন জন ব্যবসায়ী হতে চায়। একজন বললো– আপনার মতো শিক্ষক হতে চাই। শেষের একজন মাদ্রাসার শিক্ষক হতে চায়। বাবুই মাস্টার সবাইকে ধন্যবাদ দিলেন। বললেন, তোমরা তোমাদের ধর্মের সাথে জীবনযাপনের পেশাকে মিলিয়ে ফেলবে না। বর্তমান টেকনোলোজির যুগে পেশা টেকনোলোজিভিত্তিক হওয়াটাই ভালো। তবে টাকার বিনিময়ে ধর্মসভা করে বেড়ানো পেশা বেছে না নেওয়াই উচিত। জীবনকে কর্মময় করে গড়ে তুলবে। প্রত্যেকে আমার কাছে কথা দাও– জীবনে ধর্ম-ব্যবসায়ী হবে না। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য প্রাথমিকভাবে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক হলে ইসলামে যে পুরোহিততন্ত্র দীর্ঘদিন চালু হয়েছে, তা কালক্রমে বিলীন হয়ে যাবে। সমাজে প্রতিটা মানুষ ইসলামি আকিদা মোতাবেক চলতে শিখবে। আবার প্রত্যেক

পেশাতে আদর্শবান-সৎমানুষ– এ দেশের মানুষ পাবে। দুর্নীতিবাজ, ভোগবাদী দর্শন থেকে জাতি রক্ষা পাবে। ধর্ম-ব্যবসা লোপ পাবে। ট্রাস্ট অফিস ও গেস্টরুমের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাদের বোনদেরও ইসলামি শিক্ষা অর্জন করা বাধ্যতামূলক। সে-সাথে অন্যান্য শিক্ষা। তাদের জন্য পশ্চিম পাশের জায়গাটা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। একটা পারিবারিক পরিবেশে মেয়ে এতিমদের থাকা, খাওয়া ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। সেখানে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি সকল ছাত্রীকে উচ্চ-স্তরের শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হবে। দক্ষিণ পাশের যে জায়গায় মাটি ভরাট করা হয়েছে, সেখানে একাডেমিক ভবন, টেকনিক্যাল স্কুল ও যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কাজ আগামী চার মাস পর থেকে শুরু হবে। করোনা ভাইরাসের মহামারি আমাদের কাজ অনেকটা পিছিয়ে দিয়েছে। তোমরা সবার জন্য দোয়া করবে। জীবনে চলার পথে সততাকে সবচে বেশি মূল্য দেবে। আমরা বইতে ছোটবেলায় পড়েছি, 'সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা'। এর কারণও আছে। সততা মুখস্ত করার কোনো বিষয় নয়– চর্চা করার বিষয়। সততা কোনো একক কথা নয়– কয়েকটা মানবিক গুণের সামষ্টিক রূপ। সততাই জীবনীশক্তি, জ্ঞান বিকাশের প্রধান চালিকাশক্তি। অসৎ মানুষ নির্জীব, কাপুরুষ, মুষিকসদৃশ। সততা মানবতার ভিত্তি ও জীবনের মুক্তি। সততার মধ্যে ইতিবাচক চিন্তার পবিত্রতা ও শুদ্ধতা থাকতে হয়। মিথ্যা, প্রতারণা, শঠতা ও প্রচ্ছন্ন চৌর্যবৃত্তি থেকে মানুষ্যত্ব মুক্ত হওয়া দরকার। চিন্তাধারার অন্তর্নিহিত স্বচ্ছতা না থাকলে সে সততার কোনো মূল্য নেই। সততা শাণিত বিবেকের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। সততা নিজের সদা-সতর্ক বিবেককে পাহারা দেবে, সঠিক পথে পরিচালিত করবে, জ্ঞানকে উজ্জীবিত করবে। মানুষ হতে হলে মনুষ্যত্ব থাকতে হবে। সততাকে মনুষ্যত্বের সমার্থক বিবেচনা করা যায়। এখানকার লেখাপড়ায় জীবনের প্রতিটি গুণের প্রায়োগিক দিকের চর্চা করাতে হবে। নৈতিকতা, সততা, সামাজিক মূল্যবোধের প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ স্কুলজীবন থেকেই দিতে হবে। এছাড়া ভাবছি, যুবসমাজের প্রতিটি প্রশিক্ষণ ও কারিগরি শিক্ষাতে সততা ও ন্যায়ের আদর্শের উপর ভিত্তি করে শিক্ষা দিতে হবে। যে শিক্ষার ভিত্তিমূলে সততা ও ন্যায়ের আদর্শ নেই তা ভঙ্গুর; জনকল্যাণের কাজে তা কোনোভাবেই লাগতে পারে না। অসৎ-আদর্শহীন মানুষ সমাজের আপদ এবং পশুর চেয়েও অধম। এ দেশের জাতীয় শিক্ষায় এ গলদটা দূর করতে না পারলে জাতি হিসেবে এ

জনগোষ্ঠী কোনোদিনই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না। সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অভাব বরাবরই রয়ে যাবে এবং সামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে।

আলোচনা শেষে বাবুই মাস্টার অন্যদের সাথে নিয়ে রিক্সাভ্যানে চড়িয়ে স্বরূপ মাস্টারকে প্রস্তাবিত বড় এতিমখানা, হেফজখানা, টেকনিক্যাল ট্রেনিং একাডেমি, কমিউনিটি লাইব্রেরির জন্য নির্ধারিত জায়গা, অফিসঘর, হলঘর, গেস্টরুম, মডেল একাডেমিক ভবনের নির্ধারিত জায়গা, যুব-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। এসব আয়োজনে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে, তাও জানালেন। বিভিন্ন সেক্টরের সিএসআর থেকে ফান্ডের সংস্থান করা যাবে এবং এ বিষয়ে অনেক কর্পোরেশনের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে বলে স্বরূপ মাস্টারকে অবহিত করলেন। করোনা ভাইরাসের প্রকোপ সব পরিকল্পনাকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে, তাও জানালেন।

স্বরূপ মাস্টারও যতদিন বেঁচে থাকবেন বাবুই মাস্টারের সাথে একত্রে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঐ রিক্সাভ্যানেই বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

গত রাতেই পাড়ার একজন এসে বাবুই মাস্টারকে জানিয়ে গেছে যে, হাজিগুরু, মস্তব, তার ছেলে ও দালাল কাউলা একসাথে বসে পরামর্শ করেছে যে, তারা কোনোক্রমেই শিক্ষা-সেবা ট্রাস্টের কার্যক্রম এখানে করতে দেবে না। সেজন্য জমিতে ইনজাংশন জারি করিয়ে কেসের দিন পিছিয়ে পিছিয়ে যত বছর পারা যায় দেরি করিয়ে দেবে। মসজিদটা কোনোভাবে দখলে নেবে এবং অপপ্রচার চালিয়ে সাধারণ মানুষকে ট্রাস্ট থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। এভাবে দশটা বছর পিছিয়ে দিতে পারলে ততদিনে বাবুই মাস্টার ভেঙ্গে পড়বে, কাজের উদ্যম হারাবে; আবার নিজে এর মধ্যে মারাও যেতে পারেন। তখন ট্রাস্টের কাজ বন্ধ হয়ে যেতে বাধ্য।

স্বরূপ মাস্টারকে বিদায় জানিয়ে বাবুই মাস্টার আয়াজ, জমির আলি ও আজিবরকে সাথে নিয়ে গেস্ট হাউসের দক্ষিণে খোলা জায়গায় গাছের ছায়ায় বসলেন। তিনজনকে তিনটা গ্রামের দায়িত্ব দিলেন। আগামীকাল সকাল সাড়ে দশটায় মসজিদের সামনে মিটিং হবে। করোনা ভাইরাসের কারণে বেশি লোকের আয়োজন করা হবে না। মাত্র একশটা চেয়ার ভাড়া করে আনলেই হবে। এলাকার

তিনজন মেম্বার, ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এবং এই গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের গণ্যমান্য লোকদের শুধু ডাকতে হবে। সবাইকে বলতে হবে, বাবুই মাস্টার বাড়িতে এসেছেন, তিনি আপনাদের সবার সাথে বৈঠক করতে চান। আয়াজ, জমির ও আজিবর বাই-সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। মাগরিবের নামাজের সময় ওরা বাবুই মাস্টারকে জানালো যে, আয়োজন ঠিকঠাক, কোনো অনুবিধে নেই।

রাতে শুয়ে বাবুই মাস্টারের ঘুম আসছে না, এপাশ-ওপাশ করছেন। কখনো টিনের ফাঁক দিয়ে আকাশের চাঁদ দেখছেন। চাঁদের আলো ঘরের ভিতরে এসে পৌঁছেছে। ভাবছেন, আবার নিজের মনে প্রশ্ন করছেন– হাজিগুরু ও মস্তব এতটা খারাপভাবে কি কাজটাকে না নিলে পারতো না! তারা আগ-বাড়িয়ে জটিলতা তৈরি করেছে নিতান্তই প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে। বাবুই মাস্টারের অবর্তমানে মানুষকে মিথ্যা বোঝাচ্ছে, অপপ্রচার চালাচ্ছে। এদের মনের মধ্যে যে ঈর্ষানল দাউ-দাউ করে জ্বলছে, তা-কি কাউকে খুলে বলছে! এসব কথা ভাবলেই বাবুই মাস্টারের মনটা ঘৃণায় রি-রি করে। তিনি তো তাদের কোনোদিন কোনো ক্ষতি করেননি; বরং সাধ্যমতো উপকার করেছেন। এর আগেও আরো অনেক কাজে দেখেছেন, হাজিগুরু সুপিরিওরিটি কমপ্লেক্সে ভোগে এবং প্রতিটা কাজে প্রতিহিংসা করে। এটা তার অশিক্ষা ও মূর্খতা। অনেকবারই এ-প্রমাণ তিনি পেয়েছেন; কিন্তু ধরা দেননি– এড়িয়ে গেছেন। জীবনে অনেক কিছুকে ষোল আনা বুঝে পাওয়া যায় না, তাই এড়িয়ে যেতে হয়। তবু তিনি মানিয়ে চলার অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। হাজিগুরু তার জন্মগত স্বভাবের বাইরে যায়নি। জন্ম থেকে প্রতিহিংসাপরায়ণ ও অবিবেচক হলে, তা আর বদল হয় না– আমৃত্যু মজ্জাগত স্বভাব হিসেবেই রয়ে যায়। যার যে স্বভাব, যায় না সে ভাব। মানুষ্যত্ব থাকলে মানুষ এত ঈর্ষাকাতর হতে পারে না। বাবুই মাস্টার গ্রামে ফিরে আসতে চেয়ে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়তে চেয়ে কি কোনো ভুল করছেন! তিনি গ্রামের এই জটিল-কুটিল রাজনীতি করেন না। সোজাসাপটা বুঝ নিয়ে চলেন। তিনি তো এলাকায় শিক্ষার আলো জ্বেলে মানুষের জীবন-মান উন্নতি করতে চেয়েছেন। তবে এবার বাবুই জনস্বার্থের ব্যাপারে কোনোভাবেই আপসে যাবেন না। মস্তব হাজিগুরুর বৈমাত্রেয় ভাই। হাজিগুরু গং সেই ছোটবেলা থেকে মস্তবের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন

চালিয়ে আসছে। বাবুই তার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। নিজের স্বার্থ দিয়ে তাকে অনেক উপকার করেছেন। সে এই শেষ বয়সে এসে হাজিগুরুর সাথে যোগ দিয়ে বাবুইয়ের প্রতি এত অকৃতজ্ঞ হবে, বাবুই কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবেননি। মস্তব কেন হাজিগুরুর হাতের প্রতিহিংসার পুতুল হতে গেল! তার মা ঐ সংসারে বিপত্নীক চাষি স্বামীর দ্বিতীয় বউ হয়ে ঘরে এসেছিল। গরিবের মেয়ে। স্বামীর ঘরে এসে নিজেকে খুব ভাগ্যবতী ভেবেছিল। বাবুই তখন বয়সে ছোট। মস্তবের জন্মটা সংসারে দ্বিতীয় বউয়ের অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেও বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা বিমাতা ও তার সন্তানদের প্রতিহিংসার চোখে দেখেছিল। মস্তবকে পা মেলে দু-পায়ের উপর শুইয়ে ওর মা মস্তবের গায়ে সরষের তেল মালিশ করতো, আর পা দুটো নাচিয়ে নাচিয়ে আদর করে আস্তে আস্তে সোহাগি গান গাইতো:

'আমার ধুনা যাবে মাছ ধরতি ছোলার আল দিয়ে,
সেই ছোলার শাক রানবো আমি ঘেত্ত-মধু (ঘৃত-মধু) দিয়ে রে–
ধুনা, ধুনা, ধুনা ...।'

বড় চাষির ঘরে মস্তবকে বড় চাষি হবার স্বপ্নই তার মা হয়তো অবচেতন মনে দেখেছে। মস্তব স্কুলে যাবে– কথাটা সে হয়তো ভুলেও ভাবেনি। দ্বিতীয় ছেলেসন্তান জন্ম নেবার পর অঢেল ধান-শস্যের কপাল তার সহ্য হয়নি, অকালেই কবরে স্থান নিতে হয়েছিল। বাবুইয়ের যতটুকু মনে পড়ে, গরিবের ঘরে জন্মালেও মস্তবের মা প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিল না। তাকে স্বামীর দ্বিতীয় সংসারে এসে অনেক গঞ্জনা, মানসিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু মস্তব বড় হয়ে এত প্রতিহিংসাপরায়ণ, মামলাবাজ হলো কার দোষে! ভাবতে ইচ্ছে করে, মস্তবের মায়ের সোহাগি গানের ভিন্নরূপ, যা জীবনের বাস্তবতা হলেও মস্তবের মা গেয়ে যেতে পারেনি:

আমার ধুনা যাবে কেস করতি পাখি-ভ্যানে চড়ে,
মাঝপথ গিয়ে ঠাং ভাঙলো ট্রাকের ধাক্কায় পড়ে রে–
ধুনা, ধুনা, ধুনা ...।

কিছুতেই বাবুই মাস্টারের ঘুম আসছে না। মাথার উপর পুরাতন টিনের ফাঁক দিয়ে আকাশের আলো দেখছেন, আকাশের অসংখ্য তারা এক এক করে সারিবদ্ধ করে

সাজাচ্ছেন এবং হাজিগুরুদের অতীতের প্রতিহিংসামূলক ও অত্যাচারী কর্মকাণ্ডগুলো একে একে স্মৃতির জানালায় ভেসে উঠছে। বিছানায় বড্ড অস্বস্তিতে ভুগছেন। প্রতারণার স্মৃতিভরা দীর্ঘ-অবিস্মৃতিকাতর রাত যেন আর পোহাতে চায় না! অবশেষে ফজরের আজান দিলো।

সকাল প্রায় সাড়ে দশটা। মসজিদের সামনে চেয়ার এসে গেছে। মিটিংয়ের জন্য ডাকা প্রতিটা লোকই একে একে এসে পড়েছে। বাবুই মাস্টার পাড়ার আরো বেশ ক-জনকে সাথে নিয়ে মসজিদের সামনে উপস্থিত। চেয়ারে আর সংকুলান হচ্ছে না; বেশ কিছু লোক পেছনে দাঁড়িয়ে গেলো। হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বাবুই মাস্টারকে মিটিং শুরু করার জন্য বললেন। তিনি বললেন, বাবুই মাস্টার কেন এই অসময়ে আমাদেরকে ডেকেছেন, আমরা তা শুনতে চাই।

বাবুই মাস্টার উঠে দাঁড়ালেন, সবাইকে সালাম জানালেন, তাঁর ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানালেন। তারপর বলা শুরু করলেন:

আমি বাবুই মাস্টার আপনাদের সামনে বড় হয়েছি। লেখাপড়া শিখে শিক্ষকতা করে জীবনটা কাটিয়ে দিয়েছি। আপনাদের টাকায় আমি লেখাপড়া শিখেছি। আমি ভালো, না খারাপ– এ বিষয়ে আপনাদের একটা নিজস্ব ধারণা আছে। আমি এ নিয়ে কিছু বলতে চাইনে। জীবনের এই পড়ন্ত বিকেলে এসে আমার আর পাওয়ার কিছু নেই। আমি আমার এই সমাজকে সাধ্যমতো সেবা দিতে চাই। ঢাকা ছেড়ে এলাকায় আসতে চাই। প্রথমত, আমি আমার পার্শ্ববর্তী পাঁচ গ্রামের লোককে সাথে নিয়ে কাজটা শুরু করতে চেয়েছিলাম। সাত বছর আগে মসজিদে বসে আমার পরিকল্পনার কথা উপস্থিত সবাইকে জানিয়েছিলাম। স্বার্থবাদী কূটকৌশলী একটা মহল আমাকে বিগত বছরগুলোতে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে ঘুরিয়েছে, কাজ করতে দেয়নি। ইতোমধ্যে আমাদের গ্রামবাসীদের সহায়তায় এই মাদ্রাসা ও এতিমখানাসহ হেফজখানার কাজ কিছুদূর এগিয়ে গেছে। মাদ্রাসায় এখনো প্রায় ৪০/৪২ জন ছাত্র আছে। আমি শিক্ষাক্ষেত্রে একটু ভিন্নভাবে এগোতে চেয়েছি। মাদ্রাসা শিক্ষা বলতে আমাদের মধ্যে গতানুগতিক যে ধ্যান-ধারণা গড়ে উঠেছে, আমি তা ভেঙে দিতে চাই। খোদাভক্ত অকর্মণ্য ব্যক্তি আমরা অনেক তৈরি করেছি।

এরা ভিক্ষাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং পরমুখাপেক্ষিতা এদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। নিতান্ত নাদান ভোজনরসিক হিসেবে জীবন কাটিয়ে বেহেস্তি হুরের আশায় এরা যারপরনাই মশগুল। সবাই এমন নাদান, উদাসীন হলে বিশ্ব চালাবে কে? সৃষ্টি চালাবে কে? বিশ্বময় জ্ঞান-গরিমার চর্চায় রত– কোথায় সে মুসলমান? পেশায় উৎকর্ষের শীর্ষে– সে মুসলমান কোথায়? মুসলমানদের একটা ধর্মীয় অংশ দুনিয়াদারিকে অস্বীকার করে দোয়া-দরুদ পাঠ ও বৈরাগ্যের পথে জান্নাত পাওয়ার নেশায় মত্ত হয়ে গেছে। এদের বৃহৎ একটা অংশ বড় বড় অপরাধী। হয়তো অপরাধ কখনও করেছে; নয়তো অপরাধের মাধ্যমে বৃহৎ সম্পদ অর্জনের পর অপরাধের দায়ভার থেকে পরকালে পরিত্রাণের জন্য উঠে-পড়ে বেহেস্তে যাবার পথ খুঁজছে। সম্পদ আঁকড়ে ধরে সংসার ছেড়ে, কর্ম ফাঁকি দিয়ে ধর্মের নামে গাঁটরি-বোঁচকা বেঁধে দেশ-বিদেশে ঘুরছে। কেউবা বোমা মেরে আত্মঘাতী হচ্ছে। এসবের কারণ বিচার-বিশ্লেষণ করার সময় এসেছে। ভাবাবেগ তাড়িত না হয়ে বুঝতে হবে যে, শিক্ষার প্রাথমিক ভিত্তি হলো ঈমান ও ধর্মশিক্ষা; সততা ও মনুষ্যত্বের উজ্জীবন। প্রতিটা লোকের আলাদা একটা পেশা থাকবে, যা দিয়ে সে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করবে। মাদ্রাসায় পড়ে মাদ্রাসার খেদমতকার হওয়া এবং পুরোহিত হয়ে ধর্ম বিক্রি করার প্রক্রিয়া– শিক্ষার সিস্টেম পরিবর্তন করে বন্ধ করতে হবে। স্কুল-মাদ্রাসায় পড়ে একজন ছাত্র-ছাত্রীকে যেমন খাঁটি ইমানদার মুসলমান হতে হবে, তেমনি তাকে হতে হবে জ্যোতির্বিজ্ঞানী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কম্পিউটার বিজ্ঞানী, বিমানচালক, কেমিস্ট, ব্যবসায়ী, হিসাববিদ ইত্যাদি আরো শত শত পেশাজীবী। তারা শুধু দোয়া-দরুদ পড়ে কর্মহীন বেহেশতলোভী যাজক হলে চলবে না। আধুনিক উৎপাদন ও শিক্ষাব্যবস্থায় এবং টেকনোলজিক্যাল জীবনব্যবস্থায় তাদেরকে অংশ নিতে হবে। কর্ম ও সুচিন্তার মাধ্যমে পরকালের শান্তি ও মুক্তি অর্জন করতে হবে। সৃষ্টি ও মানবকল্যাণের কাজে ইহকালের সময়টা ব্যয় করতে হবে। ইসলাম এখন আর শুধু মরুপথের উট এবং খেজুরবাগানে বসবাসরত বেদুঈনদের ধর্ম নয়– আধুনিক টেকনোলজির যুগেও বিশ্বব্যবস্থার নিশ্ছিদ্র কর্মময় ইহলৌকিক হালফিল জীবনব্যবস্থার নাম। এই আধুনিক কর্মবাদ যেন মাদ্রাসার সংকীর্ণ গলিপথে শুধু বেহেশতে যাবার মাধ্যম হিসেবে নিছক কর্মবিমুখ ব্যবস্থা হয়ে পথ না হারায়, তা বিবেচনায় আনতে হবে। নইলে তা হবে

খণ্ডিত ইসলাম। সৃষ্টির সমুদয় কর্মময় জ্ঞানকে শুধু ইসলামের নামে একমুখী গণ্ডিতে আবদ্ধ না রেখে সমাজ, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি সামগ্রিক জ্ঞানের সংমিশ্রণের পথে আনতে হবে। তবেই ইসলামি শিক্ষার পরিপূর্ণতা পাবে; সৃষ্টি ও স্রষ্টার স্বরূপকে চেনা যাবে।

তিনি আরো বললেন, গতানুগতিক কর্মবিমুখ ও ভোগবাদী শিক্ষাকে বাদ দিয়ে সততা ও আদর্শভিত্তিক পেশাদারি টেকনিক্যাল শিক্ষার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করার ইচ্ছা নিয়ে আমি আপনাদের শরণাপন্ন হয়েছি। আমার বিশ্বাস, সমাজ উন্নয়নে ও সৃষ্টির কল্যাণে আমার এ কর্মপদ্ধতিকে আপনারা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করবেন। আপনাদের আন্তরিক আংশগ্রহণ ও সহযোগিতা এবং আমার অনন্য শিক্ষাচিন্তা এদেশে ইসলাম জাগরণে আগ্রদূত হিসেবে একদিন ফলপ্রসু ও সমাদৃত হবে। আমার পরিকল্পনা সম্বলিত একটা ফ্লাইয়ার আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। এখানে আদর্শভিত্তিক ইসলামি শিক্ষার ব্যবস্থা যেমন থাকবে, তেমনি জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়– বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান শিক্ষাসহ টেকনিক্যাল শিক্ষা, যুব-প্রশিক্ষণ, কমিউনিটি ক্লিনিক, লাইব্রেরি ইত্যাদি থাকবে। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়ার আগে সুশিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আদর্শ শিক্ষক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমাদেরকে গড়তে হবে। আমার পৈতৃক জমিজমা, বাড়ির আশপাশ যতকিছু আছে, সবই শিক্ষা-সেবার কল্যাণে ট্রাস্টের নামে রেজিস্ট্রি করে দিয়েছি। সব কাজ আমার জীবদ্দশায় শেষ করে যেতে পারবো কি-না আমার জানা নেই। এ সম্পদ সাধারণ মানুষের সম্পদ। আমার অবর্তমানে কেউ-না-কেউ ট্রাস্ট পরিচালনার দায়ভার নেবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আপনারা সাথে থাকবেন, আমি তা জানি। এ জনপদকে উন্নত করতে শিক্ষার আলো এবং সেবা দেওয়া ছাড়া আর তো কোনো বিকল্প পথ আমার জানা নেই। আমি আপনাদের মধ্য থেকে বক্তব্য আশা করছি। এখানে কোনো সমজিদ কমিটি নেই। জনপ্রতিনিধিরা একটা কমিটি আজ ঘোষণা করবেন– এ অনুরোধ করছি।

ইউনিয়নের চেয়ারম্যানসহ অনেকেই তাদের সুন্দর মতামত দিলেন এবং শিক্ষা-সেবা ট্রাস্টের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করলেন। শেষে মসজিদের জন্য একটা কমিটি গঠন করলেন।

সবার স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখে গ্রামের স্বেচ্ছাসেবীদের মধ্যে উৎসাহের কলরোল তৈরি হলো। মিটিং শেষে সবাই চলে গেলেন। বাবুই মাস্টারও পরের দিন ঢাকায় ফিরবেন বলে জানালেন।

বাবুই মাস্টার দেখলেন, গ্রামের কুচক্রীমহলের বিভাজনের পাতা-ফাঁদে অধিকাংশ লোকই পা দিলো না। তারা শিক্ষা-সেবার উন্নয়নের সঠিক পথটা বেছে নেওয়াতে তিনি অনুপ্রেরণা পাচ্ছেন। তবে তিনি জানেন, এবার গ্রামের কাউকে কাউকে বেছে নিয়ে গোপন কুটিল গুটি চালা হবে। তবু তিনি গুরুর বদখসলত মানতে নারাজ। ভবিষ্যতে কোনো ব্যক্তি কোনো সদিচ্ছা নিয়ে নিঃস্বার্থভাবে গ্রাম উন্নয়নের কাজে এগিয়ে আসবে কি না– এ প্রচেষ্টার সফলতা বা বিফলতা তা বলে দেবে।

বিকেল হতে-না-হতেই হাজিগুরুর পারিবারিক লোকজন হাজিগুরু যে নিষ্পাপ ও সহজ-সরল মানুষ এবং মস্তবের কেস করা ও ইনজাংশন জারি করার ব্যাপারে তার কোনো হাতই নেই এবং কিছুই জানে না, তা বাবুই মাস্টারের কাছে প্রমাণ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো। হাজিগুরু যে গ্রামের বিভিন্ন জনকে ডেকে শিক্ষা-সেবা কমপ্লেক্সে কাজ করতে আসতে নিষেধ করছে, তাদের মিথ্যা বলে হটিয়ে দিতে চাচ্ছে, কাজটা ভণ্ডুল করে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, সে-কথা পুরোপুরি অস্বীকার করতে লাগলো। তারা বাবুই মাস্টারকে হাজিগুরুর সঙ্গে বসিয়ে মীমাংসা করিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিলো। সে-সাথে একটা কথা বার বার বললো যে, পাড়ার যেসব লোক বাবুই মাস্টারের কাছে মিথ্যা কথা লাগিয়ে হাজিগুরু সম্বন্ধে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করেছে, তাদের থেকে সাবধান হতে হবে এবং এ কাজ থেকে দূরে রাখলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তাহলে কাজটাও নির্বিঘ্নে সমাধা হবে।

তাদের কথায় একচোখা স্বজনপ্রীতি দেখে বাবুই মাস্টার ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন এই ভেবে যে, তাঁর কোনো স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ বোধশক্তি আছে বলে হাজিগুরুর পারিবারিক লোকজন স্বীকার করে না। এতে তিনি মনক্ষুন্ন হলেন। তিনি বুঝলেন, তাঁর জীবদ্দশায় হাজিগুরু ও মস্তব পালোয়ানের সাথে কাজ করা হয়তো আর সম্ভব হবে না। তারাও আমৃত্যু এ প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষতির চেষ্টা ও প্রতিহিংসা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না। চিন্তাধারা ও বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য থাকলে কোনোভাবেই

একসাথে চলা যায় না; কোনো না কোনো সময়ে বিরুদ্ধতা চলেই আসে। তিনি তাদের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন না। বললেন– স্রষ্টা তোমাদের দুটো চোখ দিয়েছেন একসাথে ব্যবহার করে কোনো কিছুকে দেখার জন্য, যাতে তোমরা বিচারভ্রষ্ট না হও; একটা চোখ দিয়ে দেখলে সৃষ্টির মৌলিক উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। সবকিছু পরে বিবেচনা করা যাবে বলে তিনি কথা এড়িয়ে গেলেন এবং তাদের সাথে ভিন্নধর্মী গল্পের প্রসঙ্গে এলেন। গল্প করে বললেন:

একটা বাস্তব গল্প বলি– তোমাদের জানা দরকার। তোমাদের তখনো জন্ম হয়নি। আমাদের এই গ্রাম থেকে দু-গ্রাম পরের গ্রামে এক কুখ্যাত, দুর্ধর্ষ ডাকাত বাস করতো। তার চোখ দুটো ছিল লোভাতুর ও কুদৃষ্টিতে ভরা। তার খারাপ দৃষ্টিতে পড়লে জীবন হারানো অনিবার্য হয়ে যেত। গ্রামের কোনো নারী তার চোখে পড়লে সম্ভ্রম হারাতে বাধ্য হতো। কত মায়ের বুক যে সে খালি করেছে তার হিসাব তার নিজের কাছেও ছিল না। এ অঞ্চলে ডাকাতির পাশাপাশি সে ভারত থেকে বিড়ির পাতা ও মসলা আনার কালোবাজারি করতো। বর্ডারে ছিল তার পসার। এলাকার সাধারণ মানুষ তার ভয়ে থরহরি কম্পমান থাকতো। রাত হলে তার সাথে পথে দেখা হওয়ার তুলনায় বাঘের সাথে দেখা হওয়াকে মানুষ শ্রেয় মনে করতো। নৃশংসতার এমন কোনো দিক নেই যেখানে তার পদচারণা ছিল না। যে কারো সম্পদকে সে নিজের সম্পদ বলে দাবি করতো এবং তা বলপূর্বক দখলে নিতো। মানুষ প্রাণের ভয়ে স্বেচ্ছায় তার বাড়িতে সম্পদ দিয়ে আসতো। কারো কিছু করার ও বলার ছিল না। সে ছিল অতিমাত্রায় হিংসুটে, অত্যাচারী ও কুটিল বুদ্ধির লোক। তার পথ দিয়ে হাঁটা দেখলে মানুষ রাস্তা ছেড়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকত। সে বুক ফুলিয়ে চলতো। স্বাধীনতা অর্জনের দুবছর পরের কথা। দেশে তখন আইনশৃঙ্খলার বালাই নেই। প্রত্যেকের হাতেই আগ্নেয়াস্ত্র। যে যেভাবে খুশি চলছে। একদিন সন্ধ্যার পর হঠাৎ দুটো গুলির শব্দ পশ্চিম মাঠের দিক থেকে ভেসে এলো। মানুষ সচকিত হলো। রাতে আর বিষয়টা নিয়ে কেউ ঘাটাঘাটি করলো না। সকালে লোকমুখে শোনা গেলো– ডাকসাইটে সেই ডাকাত সর্দার পশ্চিম মাঠের দক্ষিণে বহমান খালের ধারে গুলিবিদ্ধ মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। শক্তির দাপট-পর্ব শেষ। খালে স্রোত বয়ে চলেছে। কারা তাকে মেরেছে, তা আজও অজানা। ভাই-

ভাতিজারা লাশ বয়ে বাড়িতে নিয়ে এলো। কবরস্থ করার তোড়জোড় শুরু হলো। এলাকার অনেক লোক দেখতে এলো। বাড়ির পাশে রাস্তায় লোকজনের ভিড়। বাড়ির ভিতরে লাশ। বড় ভাই অন্য একটা ঘরের পিঁড়েয় দুই হাঁটুর উপর হাত কনুইসহ মেলে দিয়ে মাথা গুঁজে ভাবলেশহীন-নিষ্প্রাণ বসে আছে। নীরবে চোখের পানি পড়ে পড়ে চোখ-জোড়া লাল হয়ে গেছে। স্নেহ-সোহাগী জগৎ-জান্নাতি মা বুক চাপড়ে বিলাপধ্বনিতে চারপাশ মুখরিত করে তুলছে। বিলাপের সুরে বলছে, 'আমার বাবার মতো ভালোমানুষটার বুকি কিডা গুলি করলো। আমার ঘরে দিনি-দুপারি এমন ডাকাতি কিডা করলো। বাবা, তুই উঠে আমার কোলে আয়।' স্ত্রী লাশের পাশে বসে আঁচলে মুখ ঢেকে সুর করে কাঁদছে। অনেকেই গিয়ে লাশের পাশে দু-দণ্ড নির্বাক দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এসে রাস্তায় বসে গল্প করছে। রাস্তায় বসা লোকদের হাসি হাসি মুখ, অথচ কারো মুখে হাসি নেই। এ-হাসি সে জীবদ্দশায় কর্মের মাধ্যমে অর্জন করেছে। ভিতর বাড়িতে মায়ের বুকফাটা আর্তনাদ। একটু বেলা বাড়লে লাশ দেখতে গেলাম। রাস্তায় ও বাড়ির ভিতরের পরিবেশ দেখে প্রথমেই থতমত খেয়ে গেলাম। মনে প্রশ্ন আসতে লাগলো, লাশের মা-বউয়ের বিলাপ করে কান্নার আন্তরিকতায় কি কোনো লোক-দেখানো লৌকিকতা, কিংবা অপরিপূর্ণতা আছে? সাধারণ মানুষের এ পরিত্রাণের নীরব খুশির উৎস কোথায়? এই সমাজ একজন মায়ের বুকফাটা আর্ত-চিৎকারেও কেন অলক্ষ্যে হাসে? স্বার্থান্ধ হাজিগুরু গং প্রতিহিংসার এ পঙ্কিল পথ থেকে পিছিয়ে আসবে কী?

(ইউনাইটেড হাসপাতালের করোনা বেড, ২২.০৯.২০২০)

আলেক মাস্টারের বিবেকবান সমাজ

সন্ধ্যার পর ক্রমশ গভীর-ঘন অন্ধকারে চারদিক ঢেকে গেছে। থমথমে পরিবেশ। সন্ধ্যার আগ থেকেই জনমানুষের চলাচল থেমে গেছে। বাইরে হাঁটতে গা ছমছম করছে। বাড়ির দক্ষিণ দিকে কিছু দূরে তেমাথা রাস্তার এক কোণে চায়ের দোকানে একটা ক্ষীণ আলো জ্বলছে। এই নিকষ অন্ধকারে তা নিতান্তই অপ্রতুল। ফাঁকা মাঠ। ঝোপ-ঝাড়ের দিকে তাকালেই ভয়ে গা কাঁটা দিচ্ছে।

মাগরিবের নামাজ পড়ে জায়নামাজেই অনেকক্ষণ বসে ছিলেন আলেক মাস্টার। তারপর শোয়ার ঘর ছেড়ে পায়ে পায়ে দক্ষিণের বৈঠকখানার ভেজানো দরজাটা খুলে দোতলায় খোলা জানালার পাশে চেয়ার টেনে বসে মাঠের দিকে তাকিয়ে আছেন। আগামী কালের ঘটনা নিয়ে গভীর চিন্তায় তিনি নিমগ্ন, যদিও বিগত আড়াই মাসের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে আগামীকালের ফলাফল দিবালোকের মতো পরিষ্কার। তবু অপেক্ষার প্রয়োজন।

বেশ কিছুক্ষণ পর আলেক মাস্টারের স্ত্রী এসে চেয়ার ধরে পাশে দাঁড়ালেন। আলেক মাস্টার হঠাৎ কারো সংস্পর্শে কিছুটা চমকে উঠলেন। স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন– এই অন্ধকারে একা বসে কী ভাবছো?

কী ভাবছি তা তুমি কিছুটা হলেও আঁচ করতে পেরেছো। ভাবছি আগামীকালের জাতীয় নির্বাচন এবং শেষে সহিংসতার রূপ নেবে কি-না তা নিয়ে। এমন অস্থিতিশীল বানোয়াট মিথ্যার পরিবেশ আমার জীবনে কখনো দেখিনি। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও না।

আলেক মাস্টার আঠারো বছর ধরে অবসরে আছেন। হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন। সময়ের দু-বছর আগেই স্বেচ্ছায় অবসরে গেছেন। স্কুলে কমিটির দলবাজ কর্মকাণ্ড এবং ফান্ড তছরুপের প্রতিবাদে এক মিটিংয়ে তিনি ঘোষণা দেন– তিনি এই লুটপাটের পরিবেশে আর শিক্ষকতা পেশা চালিয়ে যেতে পারছেন না, অবসরে যাচ্ছেন। তার নৈতিকতা সর্বজনবিদিত। তাঁর সাথে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন এমন

অনেকেই মারা গেছেন কিন্তু তিনি এখনো শারীরিক সুস্থতা নিয়ে জীবন-যাপন করছেন। তিনি তাঁর নৈতিকতা এবং নিরপেক্ষ মতামতকে কোনো স্বার্থ বা দলবাজের কাছে বন্ধক রাখেননি। তিনি দলকানাও নন। এখানেই তাঁর সফলতা। সেজন্য এলাকার মানুষ দলমত নির্বিশেষে তাঁকে সমীহ করে চলে।

'রাতে ভাত, না রুটি খাবে' কথার উত্তরে আলেক মাস্টার বললেন– অনিয়ম, মিথ্যাচার, বিবেকহীন কথাবার্তা শুনতে শুনতে জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছি। বাঁচার আগ্রহ হারিয়ে ফেলছি। আজকে দু-মুঠো ভাত খেতে পারলে ভালো লাগতো। তুমি তো জানো, স্কুল কমিটির কাজ হলো স্কুল ও ছাত্রছাত্রীদের উন্নয়নের কথা ভেবে স্কুলের উন্নতি করা। কিন্তু তারা যখন স্কুলের নিয়োগ থেকে টাকা হাতিয়ে নেয়, নিম্নমানের শিক্ষক টাকার বিনিময়ে নিয়োগ দেয়, তা শিক্ষা ধ্বংসের নামান্তর। সেই শিক্ষক ঐ স্কুলে ত্রিশ বছর চাকরি করলে, ঐ ত্রিশ বছর যত ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়, সবার জীবনটা নষ্ট করে দেয়া হয়। এ-নিয়ে এ দেশে কেউ কথা বলে না, সব জেগে ঘুমায়। শিক্ষক খারাপ হলে ছাত্রছাত্রী গড়বে কে? এছাড়া কমিটির রাজনৈতিক সদস্যরা যখন স্কুলের অন্যান্য ফান্ড বিভিন্ন অজুহাতে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেওয়ার জন্য কমিটিতে ঢোকে, তখন আর ওটা স্কুল থাকে না, লুটপাটের আখড়া হয়ে যায়। যখন যে দল ক্ষমতায় আসে, স্কুলটা সে দলের উচ্ছিষ্টভোগীদের পেট ভরার ও দলবাজি করার আস্তানা হয়ে দাঁড়ায়। এদেশে 'মহান' রাজনীতিবিদরা পথের মল দিয়ে কুকুর পোষে। এদের স্বার্থহানি হলে যে কাউকে কামড়ায়। এ দেশে সব পেশা বাদ দিয়ে রাজনীতিই এখন উপায়-উপার্জনের অন্যতম লাভজনক পেশা, সাইড বিজনেস হিসেবে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। আমার অসংখ্য ছাত্র বিভিন্ন দলভুক্ত হয়েছে। একজন মাঝে-মধ্যেই ফোন করে। অনেক টাকার মালিক, ব্যবসাপাতি গুছিয়ে ফেলেছে। সে প্রায় বলে– 'স্যার, রাজনীতি আমার কোনো নীতি-আদর্শ-বৈশাদৃশ্য নয়, এটা আমার ব্যবসার প্রসার এবং বিপদের আশ্রয়। যদি বিপদেই পড়ি, দলকে কিছু টাকা ধরিয়ে দিতে পারলেই পার পেয়ে যায়। রাজনীতি আমার অর্থ উপার্জনের উপায়– আপদ-বিপদের লিয়াজোঁ অফিস।' সেজন্য এক দিনেই পদত্যাগ করে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। অনেক বছর পর আগামীকাল ওখানে ভোট দিতে যাব ভেবেছি। ভোট দেওয়াও হবে, পরিবেশটাও দেখা হবে। চলো খেয়ে আসি।

–না, রেডি করতে আরো দশ-পনেরো মিনিট সময় লাগবে। তুমি পনেরো মিনিট পরে আসো। একথা বলতে বলতে আলেক মাস্টারের স্ত্রী ভিতরের ঘরে চলে গেলেন।

আলেক মাস্টার রাতের খাবার খেয়ে একই জায়গায় একই চেয়ারে আবার বসলেন। একটু পর নীচের ঘরের বাইরে কে যেন কড়া নাড়ছে। তিনি সেদিকে কান খাড়া করলেন। বাড়ির কাউকে দরজা খুলে দিতে বললেন। একটু পর নেতা রফিক উঠে এলো। সালাম দিলো। আলেক মাস্টার তাকে বসানোর ব্যবস্থা করলেন। এ বাড়িতে রফিক নিয়মিত আসে। আলেক মাস্টারের ছাত্র। তাছাড়া রফিকের বাপ ছিল আলেক মাস্টারের বন্ধু। এক সাথে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন। রফিকের বাপ মারা যাবার পর থেকেই রফিক আলেক মাস্টারকে অভিভাবক ও গুরুজন মানে। তার সব কথা আলেক মাস্টারকে বলে। স্যারকে শ্রদ্ধা করে।

–স্যার, আপনাকে দিয়ে আমাদের এই স্কুলকেন্দ্রের ভোট শুরু করাবো বলে আশা করে আছি। আমি আপনাকে সকালে সাথে করে নিয়ে যাব। এসব কথা বলার জন্য আমি আপনার সাথে দেখা করতে এসেছি। স্থানীয় পত্রিকার সাংবাদিককেও বলে রেখেছি। সে ভোটকেন্দ্রে ভোট দেওয়া অবস্থায় আপনার একটা ছবি নেবে, সংবাদ করবে। রফিক আবেদন পেশ করলো।

এলাকার পরিবেশ কেমন? ভোট কি আদৌ কাল হবে, না-কি গোলযোগ হবে? কোনো ভোট হবে বলে তো আমার মনে হচ্ছে না। আমি খুব ভয়ের মধ্যে আছি। আলেক মাস্টার খোলাখুলি বললেন।

–না স্যার, সবকিছু টিপটপ। গোলযোগ হবে কী করে! ওরা তো মাঠেই আসতে সাহস পাবে না, রাস্তায়ও বেরোবে না। কোনো অসুবিধে নেই। আমাদের লোকজন এখনো স্কুলে কাজ গোছাচ্ছে। রাত আড়াইটা পর্যন্ত ওখানে ওরা কাজ করবে। তাছাড়া সকালে এসে স্কুলের সামনের মাঠে যারা লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে, তাদেরকেও ঠিক করে রেখেছি।

–তোমার এসব কথা শুনে আমার উদ্বিগ্নতা আরো বেড়ে যাচ্ছে। শেষে আমি ভোট দিতে যাব কি-না আবার ভাবতে হবে। তোমাদের রাত আড়াইটা পর্যন্ত ভোটকেন্দ্রে কী? লাইনে দাঁড়ানো লোক তোমরা ঠিক করবে কেন? প্রতিটা বিবেকবান লোকের কাছেই এটা অন্যায়। মানুষ তার বিবেকবোধকে এত নীচে নামিয়ে নিয়ে যেতে পারে!

আমরা যদি বিবেকবিরুদ্ধ যে কোনো কাজ ইচ্ছে করলেই করতে পারি, তাহলে সমগ্র ইতরপ্রাণি থেকে আমাদের পার্থক্য কোথায়? ভোট এবং রাজনীতিই জীবনের সবকিছু নয়। বিষয়টা মানুষের রুচিবোধ। রুচিবোধের এতটা অপমান, পুরো মানব সভ্যতার অপমান। মানুষের বুদ্ধি আছে। অন্যান্য প্রাণি থেকে তার বুদ্ধি শতগুণ বেশি। তাই বলে বিবেকের বাইরে যে কোনো রুচিহীন কিছু করা অতি জঘন্য। আমি তো তোমাকে এ-শিক্ষা আমার ছাত্র থাকাকালে দিইনি! এসব কথা বললে যদি আমার বিরুদ্ধে কিছু হয়, আমার নামে যদি কেস হয়, তুমি কি রক্ষা করতে পারবে?

–স্যার, আমি কী করতে পারি! আমিও তো এগুলো করতে চাইনে। থানা ও জেলা পর্যায় থেকে দলীয় নির্দেশ আসে। দলে থাকতে হলে আমাদেরকে এগুলো মেনে চলতে হয়। কাজ দেখাতে হয়। নইলে দলে ক্রমশ উপরের পদ পাওয়া যায় না। আপনি আমার শিক্ষাগুরু। আপনার কাছে আমার লুকানোর কিছু নেই। দল করতে হলে এগুলো আমার করতেই হয়। আমার অধীনের কর্মীদের দিয়ে দলের কাজ করাতে হয়। কাজ শেষে তাদেরকে উপযুক্তভাবে সন্তুষ্ট করতে হয়। নইলে পরের কোনো কাজে আর লোক পাওয়া যায় না। ব্যর্থতার দায় তো আমাকেই বহন করতে হয়। টাকার সংস্থানটা পর্যন্ত চাঁদা আদায় করে করতে হয়। আর দলীয় কাজে চাঁদা যেহেতু আদায় করতেই হয়, টাকার একটা বড় অংশ নিজের পকেটে রাখলেও কেউ ধরতে পারে না। এছাড়া সরকার উন্নয়ন বাজেটের নামে দল পোষার জন্য প্রতিটা থানা পর্যায়ের নেতাদের হাতে যে টাকা ও গম বরাদ্দ দেয়, এগুলোর হিসাব কেউ কোনোদিন নেয় না। সবাই বোঝে, কী কাজে ব্যয় হবে। আর ছোট থেকে মাঝারি চামচা-চ্যালা নিজেরাই বিভিন্ন জায়গা থেকে আদায়-রোজগার করে খায়। এ টাকাও কিন্তু অনেক। এগুলো তাদের ব্যক্তিগত লাভ। আমরা এগুলোর দিকে তাকাইনে। চেয়ারম্যান-মেম্বারদের নামে যে গম-চাল আসে, তারও ভাগ কেউ কেউ নেয়, অল্প কিছু খরচ করে দলের কাজ করে, বাকিটা পকেটে যায়। এভাবে আয়-রোজগার তো কম হয় না। তারপরও কাজ করাতে গেলে টাকা দিতে হয়। হোটেলে খাওয়াতে হয়। টাকা ছাড়া কেউ কিছু বুঝতে চায় না, শুনতেও চায় না। দিন যত যাচ্ছে, আয়-রোজগারের আওতা ততো বাড়ছে, তবু এদের খাই-খাই স্বভাব যায় না। এসব কারণে টাকা ছাড়া দল চালানোও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। খেতে দাও, অথবা খাবার

সুযোগ করে দাও– নইলে টিকিটিও দেখতে পাবে না– এভাবে চলছে। বড় বড় সব রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গসংগঠন অগণিত। এসব নেতার সংখ্যা বাড়ানোর জন্য করতে হয়। বয়স-ভিত্তিক, শ্রেণিভিত্তিক, পেশাভিত্তিক, ফ্রি-ল্যান্স, ভুঁইফোড় ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত। এদের সাথে প্রতিযোগিতা করে আমাদের টিকে থাকতে হয়। নীতি-নৈতিকতা দেখাবো, না-কি দলের তাঁবেদারি করবো বলুন? এছাড়া, নিয়মিত নতুন নতুন নামের মোড়কে নেতা গজাচ্ছে। নেতা হতে পারলেই পোয়া বারো। ক্ষমতার দাপট, সাধারণ মানুষের কাছে কোনো জবাবদিহিতা নেই। দলের কাছে কিছুটা জবাবদিহিতা করতে হয়। এখানে চাপাবাজির অনেক দাম। দলে ইদানীং কর্মী বলতে কেউ নেই। সবাই নেতা। সবাই যার যার আখের গোছানো ও নামকা ওয়াস্তে স্বনামে-বেনামে স্লোগান দিতে অতি ব্যস্ত। এখানে মানুষ নামে ভালো-মন্দ বলতে কিছু নেই। এটাই রেওয়াজ। সব দল তো এভাবেই চলে। আমরা সবাই কুবুদ্ধি ও কু-সিস্টেমের গোলাম হয়ে গেছি। দলে যত বেশিদিন থাকবো, আমার কূটবুদ্ধি তত বাড়বে। আপনি কি জানেন– আপনার বউমা ও ছেলে-মেয়ে পর্যন্ত আমার কথা বিশ্বাস করতে চায় না? আমি রাজনীতিতে না এলে ভালো করতাম, এখন পেছানোরও কোনো পথ নেই। পিছিয়ে গেলে মারা পড়ে যাব।

–তাহলে আমি আগামীকাল সকালে ভোটকেন্দ্রের প্রথম ভোটার হিসেবে ভোট দিতে যাচ্ছিনে। অন্য কোনো সময়ে গিয়ে ভোটটা দিয়ে আসবো। আমি ভোটকেন্দ্রটা অন্তত একবার দেখতে চাই। বয়স যা বেড়েছে, আগামী নির্বাচন পর্যন্ত ভোট দিতে পারবো কি-না সন্দেহ। আলেক মাস্টার দৃঢ়তার সাথে বললেন।

–এটা আমাদের দলীয় সিদ্ধান্ত। আপনার মতো একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রের প্রথম ভোটটা দেবেন। এটা ছবি উঠিয়ে পত্রিকায় ফলাও করে প্রচার করতে হবে। আপনি তো এ অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধে এলাকার লিডার হয়ে আপনি যুদ্ধ করেছিলেন। আপনার প্রতি সবার শ্রদ্ধা আছে।

নীচের দরজায় আবার কে যেন কড়া নাড়লো। রাত বেশ হয়ে গেছে। সাড়ে দশটা বাজে। আলেক মাস্টার দরজা খুলে কে এসেছে দেখতে বললেন। নূরুল বাসার ভিতরে ঢুকলো। রফিকের মতো নূরুলেরও এ বাসায় অবাধ যাতায়াত। নূরুলের আব্বা আলেক মাস্টারের বন্ধু ছিলেন। আলেক মাস্টার, নূরুলের আব্বা ও রফিকের

আব্বা একসাথে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। নূরুলের আব্বা মারা গেছেন। নূরুল ও রফিক একসাথে লেখাপড়া করেছে। দু-জনের বাড়ি দুই গ্রামে। দু-জনে সহপাঠী। রাজনৈতিক কারণে বর্তমানে দু-জনের পথ ভাগ হয়ে গেছে– মুখ দেখাদেখি বন্ধ। একে অন্যের প্রতিপক্ষ– দলের ভিন্নতা, দলীয় শত্রুতা। আলেক মাস্টার নূরুলকে নিজের ছেলের দৃষ্টিতে দেখেন, ক্লাসে পড়িয়েছেন।

নূরুল সোজাসুজি দোতলার ড্রইং রুমে ঢুকে রফিককে দেখে হতচকিত হয়ে গেল। কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। আলেক মাস্টার নূরুলকে বসতে বললেন। কেমন আছে জিজ্ঞেস করলেন। নূরুল কথা বলতে প্রথমত ইতস্তত করতে লাগলো। তারপর মুখ খুললো। বললো– পুলিশ রাতে বাড়িতে হানা দিয়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আজ দেড় মাস ধরে পালিয়ে পালিয়ে থাকছি। আমাদের উপর দিয়ে খুব অত্যাচার যাচ্ছে। গায়েবি মামলা দিয়ে রেখেছে। মামলার সংখ্যাও অনেক। পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে। মনে হচ্ছে, ভোটের দিনটা পার হয়ে গেলে অত্যাচারের মাত্রাটা কমে আসবে। আমাদের একজনকে বিশ দিন আগে পুলিশের সাথে দেখা করতে পাঠিয়েছিলাম। পুলিশ আমাকে ভোটের আগ পর্যন্ত দূরে চলে যেতে বলছে। আমি বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে থাকছি। পুলিশ আসার কথা শুনলে গা ঢাকা দিচ্ছি। ওরা আমাদের কল্পিত মামলা দিয়ে জেলে ভরছে, অত্যাচার করে এলাকাছাড়া করছে। কর্মীদের কারণে এলাকা ছাড়তে পারছিনে। ওরা আমাদেরকে ভোটের মাঠেই আসতে দেবে না, কোনোভাবেই জিততে দেবে না, রাতেই ভোটের কাজ শেষ করবে– এটা আমরা বুঝি। তবে ন্যূনতম একটা সৌজন্য, চক্ষুলজ্জা তো থাকা দরকার, সেটাও ওরা দেখাচ্ছে না। ভোটের মাঠ ছেড়ে চলে গেলেও তো ওরা মুখ দিয়ে সাতকূল ধুয়ে ছাড়বে, এখানেও অসুবিধে। আমাদের পোলিং এজেন্টগুলোকে ওরা মারপিট করছে, কাউকে গ্রেফতার করিয়েছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ওরা থানায় বসে মিটিং করে। কাকে কাকে ধরতে হবে, সব প্রতিদিন থানায় বসে মনিটরিং হয়। এর মধ্যে আজ দেড় মাস থেকে রফিকরা তো আমাদের এলাকার কোথাও দাঁড়াতেই দিচ্ছে না। নির্বাচনী ক্যাম্প, ব্যানার পুড়িয়ে দিচ্ছে। কোথাও সমাবেশ করতে গেলে দলীয় লোকজন পুলিশকে সাথে নিয়ে তাড়া করছে, লাটিচার্জ করছে, অনেককে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে

পুরেছে। জামিনও দিচ্ছে না। আমরা খুব অসুবিধার মধ্যে আছি স্যার। এ এক ভয়াবহ, জঘন্য, অভিনব অরাজকতা। এ দেশে আমাদের রাজনীতি করা, আর বুনো শুয়োরের অত্যাচার পাহারা দিয়ে ক্ষেতরক্ষা করা একই কথা। শত শত মিথ্যা মামলা মাথায় নিয়ে কতদিন আর টিকে থাকা যায়! কল্পিত ঘটনা দেখিয়ে হাজার হাজার মানুষের নামে ভুয়া মামলা দিচ্ছে। মৃত মানুষের নামেও মামলা হচ্ছে। গত বিশ দিন আগে আপনার বাড়ির সামনে রফিকদের দলের কোনো মিটিংই হয়নি। হলে আপনি দেখতেন। সে-মিটিংয়ে নাকি আমাদের দলের লোকজন আক্রমণ করেছে। এজন্য থানায় শতাধিক লোকের নামে গায়েবি মামলা করেছে। অনেককে ধরে নিয়ে গেছে। কাউকে ধরার চেষ্টা করছে, সেখানেও আমি আসামি। কী বলবো, আমার ঘৃণা প্রকাশের কোনো ভাষা নেই। দৈনিক পত্রিকাও তো এসব নিয়ে সেরে-সমঝে কিছু কথা লিখছে। বুঝিনে, আমাদের অপরাধটা কী! এখান থেকে ষাট কিলোমিটার দূরে বিরোধী পক্ষ পাঁচ মাস আগে এক মিছিল বের করেছিল। সেখানে পুলিশের গুলিতে মিছিলকারীদের একজন মারা যায়। পুলিশ খাতাপত্রে দেখাচ্ছে যে, বিরোধীরা নিজেদের মধ্যে গোলাগুলি ও মারামারি করেছে এবং একজন মরেছে। বিরোধীদের শত শত লোককে খুনের কেসের আসামি করেছে। সেই কেসে আমাদের পাশের বাড়ির এক দর্জি ছেলেকে রফিকদের লোক আসামির তালিকায় ঢুকিয়ে দিয়েছে। গরিব দর্জি ছেলের তো এখন জীবন-মরণ সমস্যা, ঘরছাড়া। জমি বিক্রি করে মামলা চালাতে হচ্ছে, জামিনের টাকা খরচ করতে হচ্ছে, আবার গ্রেপ্তার ঠেকাতে হচ্ছে। মাঝখান থেকে গ্রেফতার বাণিজ্য করে পুলিশের পকেট ফুঁলে-ফেঁপে উঠছে। পুলিশ উৎসাহিত হচ্ছে। আমরা অত্যাচারিত হচ্ছি। টাকা আর কত ঢালবো? টাকা ঢালতে ঢালতে ফতুর হয়ে যাচ্ছি। একটা ইতরপ্রাণির সাথে মানুষ যে আচরণ করে, রফিকেরা আমাদের সাথে তারচে খারাপ আচরণ করছে। মূলত মুখেই রাজনীতি শব্দটা আমরা ব্যবহার করি; বাস্তবে আমরা যা করি, তা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং দস্যুনীতি ছাড়া আর কিছু না। এ দেশে কোনো বিবেকবান মানুষ আছে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। অনেক কিছুই আপনার সামনে হচ্ছে? প্রতিবাদ করতে গেলে আপনি খারাপ হবেন। আপনাকে দমন করার জন্য প্রয়োজনে আপনার নামে কেস হবে, ভুয়া অপবাদ আসবে।

আপনার কথা কেউ শুনবে না। রফিকের কথাই বেদবাক্য। আপনার বাড়িতে এসেছিলাম গ্রেফতার হবার ভয়ে। ভেবেছিলাম, আগামীকাল ভোট– রাতটা আপনার এখানে নিরাপদে কাটিয়ে দেবো। থাকা আজ আর হবে না। এই যে, রফিক আমাকে দেখে ফেললো– একটু পরেই পুলিশে গোপনে খবরটা দিয়ে ধরিয়ে দেবে। পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করবে, টাকা আদায় করবে। ভাবছি, আরো কয়েকটা দিন গা-ঢাকা দিয়ে থেকে দেখি, পরিস্থিতি কোথায় যায়। তারপর বাকি সিদ্ধান্ত নেবো।

এতক্ষণে রফিক কথা বলে উঠলো। বললো– বিরোধী দলে থাকতে গেলে একটু-আধটু অসুবিধার মধ্যে তো থাকতেই হয়। আর নির্বাচন নিয়ে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করলে জনগণ তা প্রতিহত করলে আমাদের কী করার আছে! তাছাড়া পুলিশ যে-কোনো মূল্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করবেই। আমরা দেশের উন্নয়ন ও কল্যাণ চাই বলে জনগণ ও পুলিশকে সাথে নিয়ে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছি। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছে, হাজতে পুরছে– এতে আমাদের তো কিছু করার নেই। আইন নিজ গতিতে চলবে। অন্যায়কারী কাউকে ছাড় দেয়া হবে না। এটা তো আমাদের নেতা-নেত্রী বলেই দিয়েছেন।

নূরুল কথা না বাড়িয়ে চুপ করে থাকলো। সংক্ষেপে বললো– স্যার, কাল সকালে দেখেন রফিকদের অত্যাচারে আমাদের কোনো লোক ভোটকেন্দ্রে যেতে পারবে না। জীবনের ভয় কার না আছে! মাঠে যে লোকগুলো সকালে এসে দাঁড়াবে, তারা দুপুর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে। ওদের ছবি নিয়ে পত্রিকায় এবং টিভিতে বারবার দেখানো হবে। কেউ টুঁ-শব্দটা পর্যন্ত করবে না। ভোটের একদিন পর সব স্বাভাবিক। এমন দো-আশলা রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এ-দেশে বাস করা জীবন্মৃত অবস্থার সমান।

আলেক মাস্টার বললেন– যে যে দলই করো না কেন, তোমাদের দু-জনের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্কটা ভালো রেখ। বিপদে একজনের পাশে আরেকজন দাঁড়িও। এই কলুষিত রাজনীতি জীবনের সবকিছু না। দু-জনে রাজনৈতিক কূটচাল চেলে তো আর দাম্পত্যজীবন চলে না, সংসারজীবনও না। তোমরা দু-জন বন্ধু ছিলে।

তোমাদের দু-জনের বাপেরাও বন্ধু ছিল। এই বিকৃত রাজনীতি আমাদেরকে তেমন কিছুই দেবে না, কেবল শান্তিপ্রিয় সমাজটাকেই ধ্বংস করে দেবে; সামাজিক বিদ্বেষ, অস্থিরতা, অশান্তি বাড়াবে। শিশু-কিশোরদের প্রতিহিংসা শেখাবে। সুস্থ সমাজব্যবস্থা বিকশিত হতে দেবে না। এই সমাজেই আমাদের সবাইকে বাস করতে হবে। আমরা যত দলকানা হবো, সামাজিক অস্থিরতা ততো বাড়বে; ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব ততো বাড়বে। মানুষের সামাজিক বন্ধন ততো শিথিল হয়ে আসবে। এমন হলে একজন মৃতের খাটলি কাঁধে নিতে গেলেও সে কোন দল করতো, তা আগে জিজ্ঞেস করবে। সমাজে আমরা বড্ড প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠছি। এর পরিণতি ভালো না। আমাদের রাজনীতিবিদদের এগুলো ভাবা দরকার। তার আগে, রাজনীতিবিদ হতে গেলে একজন বিবেকবান সুস্থ মানুষ হওয়া দরকার। তারপর দেশ সেবার প্রশ্ন আসে। বাঁদর দিয়ে তো আর রুটি ভাগাভাগির কাজ হয় না! রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নে দেশ ছেয়ে গেছে। এভাবে কোনো দেশ চলতে পারে না। আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম, নতুন দেশের নতুন নামের জন্য যতটা না-করেছিলাম, তার চেয়ে শোষণ থেকে মুক্তি ও অন্যায়-অবিচার থেকে মুক্তি বেশি চেয়েছিলাম। এর সাথে উদ্দেশ্য ছিল– সাম্য, সামাজিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। অতীতের এসব সুখস্মৃতি মনে এলে খারাপ লাগে। আমরা বড্ড বিবেকহীন হয়ে গেছি, আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েছি। রাজনীতির যাঁতাকলে ফেলে স্বদেশী ও বিদেশী দিয়ে যে নব্য শোষণ এ দেশে শুরু হয়েছে, আমি প্রকৃতপক্ষে আশার আলো আমার জীবনে দেখিনে। আমিও অনেক ভয়ে ভয়ে আছি। উচিত কথা বলতে গিয়ে যে কোনো সময় ছদ্মবেশী মুক্তিযোদ্ধা হয়ে না পড়ি! কিংবা আমারও নূরুলের দশা হয় কি না! এই শেষ বয়সে এসে আমি কোনো আন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে পারবো না। কালোকে কালো, ধলাকে ধলা আমাকে বলতেই হবে। শেষ বয়সে এসে কোনো রাজনৈতিক দলে আর নাম লেখাবো না। বিষবৃক্ষ নামে বাংলাভাষায় একটা শব্দ আছে। শব্দটা এ দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষেত্রে বর্তমানে নির্দ্বিধায় ব্যবহার করা যায়। বর্তমানে তো দল শব্দটার তুলনায় বিভিন্ন মোর্চার অভিধা দেশে চলনসই। কেউবা ধর্মের নামে, কেউবা 'বাম' নামে, কেউবা 'ডান'– অসংখ্য বিষবৃক্ষের প্রতিষ্ঠান। বিষবৃক্ষ প্রতিনিয়ত হিংসা, বিভেদ, বিদ্বেষ, অনৈতিকতা, জিঘাংসা ও শঠতা উদগীরণ

করছে। চরিত্র হরণকারী এ বিষবৃক্ষ থেকে যতটা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা যায়, মানুষের বৈশিষ্ট্য ততটাই অক্ষুণ্ন থাকে। তোমরা ভেবে দেখো কী করবে! আমি একজন বিচক্ষণ ডাক্তারকে এইডসে আক্রান্ত এক দম্পতিকে উপদেশ দিতে শুনেছিলাম, এইডসমুক্ত না-হওয়া পর্যন্ত কোনো সন্তানের জন্ম না দিতে। এদেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোরও উচিত, আপাতত কোনো সন্তান জন্ম না দেওয়া। অথচ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নামে নির্বিচারে লক্ষ লক্ষ বিষফল উৎপাদন করে চলেছে, যা সাধারণ মানুষের জীবনসংহারক হিসেবে কাজ করছে। ছোটবেলায় বক্কা বয়াতির ধুয়োজারি শুনতে যেতাম। তিনি গাইতেন–

'পাঁচ বউ তার নয়টা হুকো চারটে হুকো দেড়ি-ই-ই-ই,
তবু, তামুক খাওয়ার জন্যি-রে বউ বেড়ায় বাড়ি বাড়ি–
আ-হা-আ, আ-আ- ।'

ঊনপঞ্চাশ বছর পর আমরা দেখতেই পারছি, আমরা আমাদের উদ্দেশ্য থেকে যোজন যোজন দূরে চলে এসেছি। উদ্দেশ্যের বিপরীতে চলছি। যদি এদেশে সৎ লোকের তালিকা তৈরি করতে যাও– দেখবে, পনেরো কোটি লোক নাম লেখাবে। ব্যাংক ব্যবসার লাইসেন্স দিতে চাও– বারো কোটি লোক নাম লেখাবে। ব্যাংক লুটেরার তালিকা তৈরি করতে চাও, সেখানেও প্রায় বারো কোটি লোকের নাম পাবে। কে ভালো, কে মন্দ তার সংজ্ঞাই পৃথক হয়ে গেছে। লুটপাট করতে চাও? প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে চাও? অল্প পরিশ্রমে ফন্দিবাজি করে টাকার পাহাড় গড়তে চাও? বিচারে ফাঁসি থেকে বাঁচতে চাও? ক্ষমতার বেলেল্লা দাপট দেখাতে চাও? ওগো চতুর পথিক– এসো, রাজনীতির ছায়াতলে। যতটা উদগ্রভাবেই হোক, নিবিড় ছায়া দেবো। 'ভাত দেবো, কাপড় দেবো, গয়না দেবো, আরো কনে তোমায় দুলাবো বালিকা চৈতী কানের দুলে।' আলাদীনের প্রদীপ দেবো, সব দেবো, সব-সব। শেষ জীবনে এসে আমার চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই। ভাবছি, 'বিবেকবান-সমাজ' নামে একটা সমাজ কাঠামো তৈরি করবো। সুধী সমাজ, ব্রাহ্ম সমাজ, নাগরিক সমাজ, সাহিত্য সমাজ নামে সংগঠন থাকলে 'বিবেকবান-সমাজ' নামে কোনো সমাজও তো থাকতে পারে। এতে মানুষের চিনতে সুবিধে হবে– কাদের বিবেক আছে, আর কাদের নেই। সদস্য করার আগে বিবেক আছে, কি

নেই– কয়েকটা মাপকাঠি বা মানদণ্ড দিয়ে আগে মন-মানসিকতা পরীক্ষা করা হবে। যাকে-তাকে এ সমাজে ঢুকতে দেবো না। এছাড়া এই সর্বভেজালের দেশে কাউকে বিশ্বাস করা যাচ্ছে না, সে বিবেকসম্পন্ন লোক, না-কি বিবেকহীন। যাদের বিবেক নেই, তারা তাকে নিয়ে কে কি ভাবলো না-ভেবে চ্যাটাং চ্যাটাং মিথ্যা কথা বলে যায়, বিবেকবান লোক প্রতিবাদ-না করে লজ্জায় চুপসে যায়। এ এক গুমোট অবস্থা। এ থেকে উত্তরণ দরকার। এর চেয়ে 'বিবেকবান-সমাজ' নামে অরাজনৈতিক সংগঠন তৈরি করাই ভালো। কোনো বিষয়ে তাদের কাছে মতামত চেয়েও পাঠানো যাবে। তোমরা বিষয়টা নিয়ে ভেবে দেখবে। নিজের এলাকা থেকেই আগে শুরু করবো। দেশের প্রতিটা ইউনিয়নে বিবেকবান-সমাজ তৈরি করবো।

নূরুল আলেক মাস্টারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরের অন্ধকারে মিশে গেল।

রফিক কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো– স্যার, আমি ভোটকেন্দ্রের দিকে যাচ্ছি। দেখে আসি কাজ কতটুকু এগোলো। কাল সকালে কিন্তু আমি নিজে এসে আপনাকে নিয়ে গিয়ে প্রথম ভোটার হিসেবে ভোটটা দেয়াবো। আপনি প্রস্তুতি নিন। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে আবার ফিরে আসবো। রাতে এখনো অনেক কাজ বাকি। আমি চলি। দরজাটা আটকানোর ব্যবস্থা করুন।

রফিক রাতের খাবার খেয়েছে কি-না আলেক মাস্টার জিজ্ঞেস করলেন। সকালে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার বিষয়টা ভেবে দেখতে হবে বলে জানালেন।

রফিক স্কুলের ভোটকেন্দ্রে পৌঁছে দেখলো রুমের ভিতরে আলো জ্বেলে কাজ চলছে। বাইরে কয়েকজন আনসার ও দলীয় লোকজন পাহারা দিচ্ছে। রফিক দরজা খুলতে বলে ভিতরে ঢুকলো। কিছুক্ষণ বসে কাজ দেখলো। তারপর একজনকে আলেক মাস্টারের ভোটার তালিকায় সিরিয়াল নম্বরটা বের করে ভোট দেয়ার কী অবস্থা জানতে চাইলো। একজন সাহায্যকারী দু-তিনবার মিলিয়ে দেখে জানালো যে, আলেক মাস্টারের ভোটটা দেওয়া হয়ে গেছে। রফিক উত্তেজিত হয়ে উপস্থিত সবাইকে একটু বকাবকি করলো। ভাবছে, স্যারকে এখন কীভাবে

জানাবে যে, তাঁর আর ভোটকেন্দ্রে আসার দরকার নেই। ভাবতে ভাবতে বাইরে বেরিয়ে এলো। বড্ড অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে পড়ে গেলো। মোবাইল ফোনটা পকেট থেকে বের করে আলেক মাস্টারকে ফোন দিলো। বললো– স্যার, এত রাতে বাসায় এসে আপনাকে আর কষ্ট দিতে চাচ্ছিনে। আমি ভেবে দেখলাম, আপনার মতো একজন দলনিরপেক্ষ মানুষের আমার সাথে এসে প্রথম ভোট দিয়ে ছবি তোলার দরকার নেই। এতে আপনার সম্মানহানি হবে। আমি আগামীকাল সকালে আপনার সাথে দেখা করবো।

পরদিন সকাল ন'টার দিকে আলেক মাস্টার দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, পথে লোক চলাচল কম। স্থানীয় কিছু উঠতি নেতা-কর্মী রাস্তা দিয়ে জোরে হেঁটে চলে যাচ্ছে। নূরুল ও তার দলের কেউ কোথাও নেই। তিনি বাড়ির ভিতর ঢুকে চেয়ার টেনে পত্রিকার পৃষ্ঠা ওল্টাতে লাগলেন।

রফিক বাড়ির ভিতর ঢুকলো। স্যারকে সালাম দিলো। আলেক মাস্টার সকাল সাড়ে দশটার দিকে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে নিজের ভোটটা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

রফিক আলেক মাস্টারকে নিরুৎসাহিত করলেন এই বলে যে, স্যার, ওখানকার পরিবেশ আজ খুব একটা ভালো না। ওখানে বড় লাইনে আপনাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। আপনার মতো লোক ওখানে আজ না যাওয়াই ভালো। আগামী নির্বাচনে আপনাকে সাথে করে আমি ভোটকেন্দ্রে নিয়ে যাব।

আলেক মাস্টার যা বুঝলেন, মনে মনে বুঝলেন। কোনো কথা প্রকাশ করলেন না। তিনি হয়তো তার প্রস্তাবিত 'বিবেকবান-সমাজ' নিয়েই নিজের ভাবনাকে ব্যস্ত রেখেছেন।

(ঢাকা, পল্লবী, ২৯.১২.২০১৮)

হেলাল দপ্তরির ঘণ্টা

কলেজের কর্মচারী ও শিক্ষকদের মাথায় হাত উঠলো। আজ একটা মাস ধরে অফিসে এলে সবার একই আলোচনা। গ্রুপে গ্রুপে বসে একই কথা– আমরা যাব কোথায়, আমাদের পরিণতি কী! সবাই খুব হতাশায় ভুগছে– অফিসের কোনো কাজকর্ম হচ্ছে না বললেই চলে। মালিকপক্ষ ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। পুরো ঢাকা শহরেই হরেক-রকমের ব্যবসা। টাকা তৈরি করার কায়দাকানুন জানা আছে। যে ব্যবসায় হাত দেয় সেখান থেকেই টাকা আসে। সবাই বলে, এদের মনে হয় ব্যক্তিগত টাকশাল আছে। ব্যবসায়ী হলেও মানুষ হিসেবে ভালো। বড় পিরের মুরিদ। নামাজ-কালাম পড়েন। নিয়মিত ওমরাহ করেন। ইসলামি জেওর-লেবাসধারী। এই সুবিধাটা কলেজের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নিয়েছেন। সুলতান সাহেব বললেই শহরের সবাই চেনেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য টাকা খরচ করতে বললে কোনো না নেই। এটা তাঁর সমাজকর্ম। বিল্ডিং বললে তিনি সেরা আধুনিক বিল্ডিংই বোঝেন। প্রতিটা পছন্দে রুচিশীলতার নান্দনিক ছাপ। বেশি ছিমছাম পরিবেশ, বেশি মূল্য নির্ধারণ, বেশি আয়-রোজগার।

ঢাকার কেন্দ্রস্থলে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে প্রায় বারো বছর আগে একটা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নিজে দেখাশোনা করার সময় নেই। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে খুব বিশ্বাস করেন। তাঁদের উপর নির্ভর করে চলেন। অধ্যক্ষ যা বলেন, মালিকপক্ষ মহাসত্য বলে মেনে নেন। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ মহোদয় ব্যক্তিগত জীবনে আর্থিক দিক থেকে সৎ। এটা বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে পরীক্ষিত। সুলতান সাহেবের কাছে এ দু-জনের এটা একটা বড় পুঁজি। অধ্যক্ষ সাহেব লেখাপড়া ভালো জানেন ও কথাবার্তায় চৌকস। সবার সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেন। মার্জিত পরিবারের সন্তান। হাসি মুখে কথা বলেন। প্রতিষ্ঠানের জন্য সময় দেন। ব্যবস্থাপনার প্রতিটা কাজে বিজ্ঞান-তত্ত্ব খাটাতে বেশি পছন্দ করেন। সমাজবিজ্ঞান এবং মৌলিক বিজ্ঞান যে এক নয়– এটা প্রায়শই ভুলে যান। একবার যদি কারো সম্বন্ধে খারাপ ধারণা পোষণ করে থাকেন, তা অপ্রকাশিত

অবস্থায় আজীবন জের টানেন। আবার এর উল্টোটাও আছে। কারো প্রতি একবার বিশ্বাস এনে ফেললে, কালবৈশাখীর প্রলয়-তাণ্ডবও তাঁর বিশ্বাসকে ভাঙতে পারে না। এ-এক আজব বৈশিষ্ট্যের মানুষ। নিজে যা বুঝবেন, যত তর্ক করেই হোক সেটাকেই প্রতিষ্ঠা করবেন। চিরসত্য বলে ধরে নেবেন। কগনিটিভ বায়াস বলতে দর্শনশাস্ত্রে একটা কথা আছে, সেটা মানেন না। অনেকটা কান-পাতলা স্বভাবের। ইউরিয়া ও ফসফেট সার দেওয়া মাটিতে উর্বর পরিবেশ-পরিস্থিতিতে যত্নে বেড়ে ওঠা লকলকে গাছের মতো লতিয়ে শহুরে পরিবেশ-অভিজ্ঞতায় বড় হয়েছেন। এই নিষ্করুণ পৃথিবীর কঠিন ও নির্মম বাস্তবতার ঘা খেতে অভ্যস্ত নন। মানুষ চিনতে ভুল করেন। জীবনের সবকিছুকে শহরের গণ্ডিতেই বিচার-বিবেচনা করেন। সবকিছুকে ম্যাথমেটিক্স-এর ফর্মুলায় ফেলে, কখনো কম্পিউটারের প্রোগ্রামে ফেলে বিবেচনা করেন। সামাজিক বাছ-বিচারে সমাজবিজ্ঞানে কখনো-কখনো দুই আর দুই পাঁচ হয়, কখনো হয় তিন। এগুলো বিবেচনায় আনতে অপারগ। কোনো প্রতিষ্ঠানের আগাম দশ-পনেরো বছরের বাস্তব ভিশন হৃদয়পটে ভাসিয়ে তুলতে পারেন না। গতানুগতিক মুখস্থ ধারার বাইরে আসতে পারেন না। নিয়মতান্ত্রিক আগল থেকে নিজেকে কোনোক্রমেই মুক্ত করতে পারেন না। চিন্তাধারায় একটা নির্দিষ্ট সীমার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন না। একই গণ্ডিতে ঘুরপাক খান– প্রকাশ করেন না, কাজের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। তাই জীবনে অধ্যক্ষ ছাড়াও বাঁধাধরা আমলা হওয়া সম্ভব। সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ হলে গতানুগতিক ধারায় ছকেবাঁধা নিয়মে সামনে এগোনো সহজ। বেসরকারি কলেজে সেভাবে চললে প্রতিষ্ঠা পাওয়া অতটা সহজ নয়। সমাজের ভাষা বুঝে উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন সৃষ্টিকুশল আশাবাদী উদ্যোক্তার ভূমিকা তাঁর কাছে আশা করা বাতুলতা মাত্র। মৌলিক বিজ্ঞানের সাথে সমাজবিজ্ঞান ও লিবারাল আর্টস যথাযথ সমন্বয় না হলে প্রতিষ্ঠান, জীবনপথ ও পেশা যা হয় তা-ই হচ্ছে।

উপাধ্যক্ষ কানকথা বেশি বিশ্বাস করেন। প্রতিটা জিনিসের নেগেটিভ দিকটা প্রথমত আমলে নেন, রগচটা ভাব দেখান। তারপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় আসেন– সময়ের কাজ সময়ে বোঝেন না। বারবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন।

লক্ষ্য নির্ধারণ ও লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপাদানগুলো নির্বাচন এবং তার যথাযথ সমন্বয় করার কাজ আদৌ বোঝেন না। কম্পিউটারের কার্সর দিয়ে অসীম জীবনের চেতনার সমীকরণ মেলাতে চেষ্টা করেন। কার্সর ঘোরালে ছবি ঘোরে, কিন্তু জীবন যে ঘোরে না– তা বুঝতে অপারগ। যন্ত্রপাতির পূজার চাইতে স্বাধীন-চেতা জীবন-বিরহের পাখার গণ্ডি যে যোজনব্যাপী বিস্তৃত, তা অজানাই রয়ে যায়। স্থির কোনো সিদ্ধান্তে আসতে অনেক সময় নেন। ফলে চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে অবস্থা বারবার হয়। তিনি তোষামুদে হতে পছন্দ করেন। মুড নিয়ে থাকলেও মনের মধ্যে একটা অপ্রকাশিত সরলতা কাজ করে। দক্ষ ব্যবস্থাপনায় লবডঙ্কা।

কলেজ প্রতিষ্ঠার চার-পাঁচ বছর পর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কিছুটা বাড়লো। এতে সমস্ত শিক্ষকসহ হেড ক্লার্ক আলাউদ্দিন মিয়া, সহকারী হেড ক্লার্ক রোহেলা বানু এবং লাইব্রেরিয়ান মতলব মিয়া অনেক উজ্জীবিত হলো। তারা তিনজন একসাথে বসে বলাবলি করতে লাগলো– আমরা কলেজ প্রশাসনের অংশ। আমাদের সহায়তা ছাড়া ছাত্রছাত্রী বৃদ্ধি কোনোক্রমেই সম্ভব হতো না। রোহেলা বানুর মধ্যে প্যাঁচ একটু বেশি। সে অন্যদেরকে বুঝিয়ে বলতে লাগলো যে, আমাদের অস্তিত্বকে জানান দিতে হলে, কিংবা অফিসের গুরুত্ব বাড়াতে গেলে কোনো ছাত্র বা শিক্ষক অফিসে কাজের জন্য এলে কাজটা সাথে সাথে করে দেবেন না। কাজটা যে কঠিন বোঝাতে হলে একটু ঘুরালেও ঘুরাতে হবে। তাতে কলেজে আমাদের গুরুত্ব বাড়বে। আরো দু-জন সে-সাথে সায় দিলো। তারা আলাদাভাবে ছাত্রছাত্রী বৃদ্ধিকে পুঁজি করে অবসর সময়ে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের কাছে ঘেষা শুরু করলো। একদিন তিনজনে বসে গল্প করার সময় মতলব মিয়া অন্যদের বললো যে, আপনারা কি জানেন! স্যার না বিজ্ঞান বিভাগের ভালো কথা বললে খায় ভালো, খুব পুলকিত হন, এটা আমি দেখেছি। আসলে আমাদের স্যারেরা খুব ভালো। তাঁদের দু-জনের ত্যাগে, আমাদের সহযোগিতায় কলেজ একদিন বড় হয়ে উঠবেই।

বিকেলের দিকে যখন কলেজ ফাঁকা হয়ে যায়, তিনজন তখন পালাক্রমে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের রুমে যাতায়াত ও কথাবার্তার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। কোন কথায় কর্তা পুলোকিত হন, তা বুঝে সে সুযোগ তারা নিতে চাইলো। কিছুদিন

যাতায়াতের পর কোন বিভাগের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা ভালো– এ নিয়ে আলোচনা হতে লাগলো। চালাক প্রকৃতির বলে রোহেলা বানু এবং মতলব মিয়া বিজ্ঞান বিভাগের কথা উঠলেই একবাক্যে ভালো এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ ও মানবিক বিভাগের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা ততটা ভালো না– বলা শুরু করলো। বিভিন্ন কথা একটু রং লাগিয়ে একপাশ বিবেচনায় এনে অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষের কানে লাগাতে লাগলো। প্রথম দিকে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নিজেদের মতামত ওদের কাছে না-দিলেও দিনে দিনে মতামত জানানো শুরু হলো। দু-জনই অফিস স্টাফ খুব বিশ্বস্ত, তা বিভিন্ন জায়গায় বলতে লাগলেন এবং এদেরকে আপন ভাবতে লাগলেন। দিনে দিনে ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক বিভাগের শিক্ষকদের সম্বন্ধে খারাপ কথা এক-কান আরেক-কান করতে করতে শিক্ষকদের কানেও পৌঁছালো। শিক্ষকরা অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ সম্বন্ধে সরাসরি মন্তব্য থেকে বিরত থাকলেন। তবে একজন সহকর্মী অন্য সহকর্মীর কাছে কষ্টের কথা জানালো। কলেজব্যাপী ওপেন সিক্রেট হয়ে গেল যে, আলাউদ্দিন মিয়াসহ অফিসের সবাই ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক বিভাগের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের দোষ ধরে বেড়ান এবং বিজ্ঞান বিভাগের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট।

সোলাইমান মুন্সি ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের প্রধান। তিনি একদিন অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে গিয়ে কলেজের কর্মচারীরা যে পক্ষপাতদুষ্ট কথা সবসময় বলেন এবং সে-মতো আচরণ করেন তা জানালেন। অধ্যক্ষ মহোদয় সোলাইমান মুন্সির কথায় বিরক্ত হলেন এবং কথাকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করলেন। বিষয়টা স্বকল্পিত বললেন এবং সরাসরি অফিস স্টাফের পক্ষ নিলেন। কথা কোথা থেকে হচ্ছে, তিনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে জানালেন। বিষয়টা নিয়ে অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং যার-যা-খুশি স্বাধীন মতামত কমনরুমে বসে শিক্ষকরা দেওয়া শুরু করলেন। এ-সাথে কলেজ অফিস ও লাইব্রেরিতে বিজ্ঞানের শিক্ষকরা গেলে ভালো ব্যবহার করে, কিন্তু ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের শিক্ষকদের ভালো চোখে দেখে না– এমন কি বসতেও বলে না, এসব কথা বলা শুরু হয়ে গেল। অধ্যক্ষ মহোদয় অফিসকেই সমর্থন করে চললেন। অনেকেই চাকরি যাবার ভয়ে মুখ খুলতে রাজি হলেন না,

কিন্তু সব জায়গাতেই ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক বিভাগের বঞ্চনার কথা ফুসফাস চলতে থাকলো। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ মহোদয় স্টাফ নিয়ে মনে মনে ভাবেন, 'তুমি তাই, তুমি তাই গো, আমার পরান যাহা চায়।'

সোলাইমান মুন্সি শক্ত ধাতের লোক, নীতিতে অটল। স্বার্থবাদী ফাঁকিবাজ লোক তাঁর কাছে কাবু। তারা গোপনে গোপনে বিরোধিতা করে, মোনাফেকি করে, বিষ ছড়ায়। মুন্সি মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে চান। প্রতিটা ছাত্রছাত্রী তার অভিভাবকের এক টুকরো ভবিষ্যৎ স্বপ্ন– এটা মন থেকে ভাবেন, শিক্ষাপ্রশাসনে দক্ষতা দেখান, শিক্ষকদের বিপদে পাশে দাঁড়ান; কিন্তু বিভাগের দায়িত্বপালনে ব্যত্যয় ঘটলে, শিক্ষকদের কাজে দোষ-ত্রুটি পেলে মৌখিক ধোলাই দেন। বিভাগের অল্প তিন-চারজন শিক্ষক এ নিয়ে ক্ষুব্ধ। এরা দল পাকায়। এরা কলেজের কাজকে অন্যের কাজ ভাবে। ভাবে, সংসারের কাজ মানে নিজের কাজ। এরা ছাত্রদের কাছে জনপ্রিয় শিক্ষক হওয়ার জন্য উপর-উপর ভাসা-ভাসা পড়ায়, নির্বাচিত কিছু প্রশ্নের নোট মুখস্থ করিয়ে কলেজের পরীক্ষাগুলোতে বেশি বেশি নম্বর দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের 'অল্প-পড়ায় অধিক-নম্বর' প্রাপ্তির প্রত্যাশার পর্যায়কে বাড়িয়ে দেয়। ভালো শিক্ষকেরা বেশি শেখানোর জন্য পরিশ্রম করে মরে। তাঁদের পরিশ্রম পণ্ডশ্রম হয়। ভালো পড়ালেও, যথাযথ নম্বর দিলেও– ছাত্রদের মন ভরাতে পারেন না। ফাঁকিবাজ ট্যাক্টফুল(?) শিক্ষকদের খপ্পরে পড়ে ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়া না করে শুধুই বেশি বেশি নম্বর চায়, ভালো গ্রেড চায়। ফাঁকিবাজ শিক্ষকেরা ধন্বন্তরী যুগোপযোগী পদ্ধতি 'কম টাকা, বেশি লাভ– বেশি কাপ চা' বিজ্ঞাপন, কিংবা অর্থনীতির গ্রেসাম্‌সের 'ব্যাড মানি ড্রাইভ্‌স আউট গুড' ওয়ান ফ্রম দ্য মার্কেট– তত্ত্বের এদেশীয় শিক্ষাহারা গ্রেড-প্রতিযোগিতামূলক সমাজে প্রয়োগ করে সফলকাম হচ্ছে। মানসম্মত শিক্ষাদানে ইচ্ছুক নীতিবান শিক্ষকেরা ঠিকমত পড়াতে পারেন না বলে অপপ্রচারিত হচ্ছেন। শিক্ষাঙ্গনে তাঁরা ক্রমশই অযোগ্য প্রমাণিত হচ্ছেন। কেউ কেউ সসম্মানে পেশা থেকে সরে পড়ছেন; অপরদিকে ধোঁকাবাজরা ক্রমশই আসন পাকাপোক্ত করছে। নীতিবান আদর্শ শিক্ষকেরা ভবিষ্যৎ-কানা ছাত্রছাত্রী ও অপরিণামদর্শী নীতিহীন প্রশাসনের কাছে অপাঙ্‌ক্তেয় হচ্ছেন। ফাঁকিবাজ কৌশলী

শিক্ষকরা ধোঁকাবাজি করে, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অমিয় সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দিয়ে পূজিত হচ্ছে। শিক্ষাঙ্গনে এ এক অভিনব জটিল মারপ্যাঁচ চলছে। প্রকারান্তরে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এতো অল্প বয়সে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে জীবনের এ শুভঙ্করীর ফাঁকি বুঝে ওঠা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়– পরিণামে ভোগে। এ অবস্থা দেশব্যাপী। এর ফলে এ 'অতি চালাকের দেশ'-এ শিক্ষা শেষ, শিক্ষাঙ্গন শেষ, শিক্ষার্থী শেষ, ভবিষ্যৎও শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। বিভিন্ন অজুহাতে কলেজের কাজ ফাঁকি দেওয়া এ অল্প কয়েকজন আধুনিক শিক্ষকের অতি-চালাকি স্বভাব দেশব্যাপী চালাকির সাথে মিলে গেছে। এরা বাকপটু এবং মিথ্যা কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে পারে বলে এ কলেজেও এদের দাপট বেশি। প্রশাসন ও নীতিনির্ধারকদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বেশি।

অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ মহোদয় তাঁদের মনের অজান্তেই কলেজকে বিজ্ঞান কলেজের আদর্শ রূপে মনে মনে ভাবতে শুরু করলেন। ভাবনাটা বিভিন্ন শিক্ষামহলে আলোচনায় চলে এলো। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ ও মানবিক বিভাগকে কলেজের অলঙ্কারের মতো সাক্ষীগোপাল হিসাবে তাঁরা ধরে রাখতে চান– দিনে দিনে এটা ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ ও মানবিক বিভাগের শিক্ষক এবং কর্মচারীদের চোখ এড়ালো না। শিক্ষাসমাজেও তা প্রকাশ পেলো। অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ মুখে তা স্বীকার করেন না। এটা একটা ভালো বিজ্ঞান কলেজ হবে– মনের ভেতরে এ অনুচ্চারিত মনোভাব কাজ ও টাকা-পয়সা বণ্টন, সুযোগ-সুবিধা এবং শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে ফুটে উঠতে লাগলো। খরচ যা হয়, বিজ্ঞান বিভাগের জন্য বণ্টন বেশি। কলেজের অধিকাংশ রুম বিজ্ঞান বিভাগের দখলে। অপ্রয়োজনেও তারা তা ব্যবহার করে। বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকরা কোনো বিষয় নিয়ে এলে হাসিমুখে তার বরাদ্দ মেলে। কেউ ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ ও মানবিক বিভাগের কোনো বরাদ্দের জন্য এলে নিরপেক্ষতা দেখানোর জন্য কখনো-সখনো বরাদ্দ মিললেও অনেক সময় আলোচনায় তর্কের সূত্রপাত হয়। এ এক প্রচ্ছন্ন অসহনীয় অবস্থা। এ যেন উটপাখির মতো বালিতে ঠোঁট গুঁজে, চোখ বুজে নিজের বড় অবয়বকে ঢাকার বৃথা চেষ্টা। বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকরা তাদের আপনজন, প্রতিটা কাজেই তা বোঝা

যায়। ভাবখানা দেখলে এমনটাই মনে হবে, 'কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা।' কিন্তু 'মনে মনে'। বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা হবে– সেও জানা, কিন্তু 'মনে মনে'। সবার সাথে মৌখিক ভালো সম্পর্ক রখেবো এটা আমার লৌকিকতা– ভালো পরিবারে জন্ম নিয়েছি তাই। কামার যা গড়ে, তা মনে মনে গড়ে; গড়ার পরে বোঝা যায়, কী গড়লো। বেশি সময়ই খোটা দিয়ে বলে, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ ও মানবিক বিভাগের মধ্যে জটিলতা বেশি। এরা আমাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করে– কলহে বিশ্বাসী। আপেক্ষিক এসব বিষয় প্রমাণ করা কঠিন হলেও এগুলো সবই যে অপব্যবস্থাপনার ফসল– তা বুঝতে চায় না। অফিস স্টাফ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক, কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীদের সেবা দিতে পেরে অধ্যক্ষ মহোদয়ের সামনে এসে তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলে। বোঝাতে চায়, আমরা তাই, তাই গো, আপনাদের পরান যাহা চায়।

এ সুযোগ ঐ তিন-চারজন শিক্ষক কাজে লাগাতে ভুল করলো না। ব্যবসায় বিভাগের তিন-চাটুকার বললেই ওদেরকে ব্যবসায়-শিক্ষা বিভাগের সবাই চেনে। তারা অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের সাথে নিয়মিত দেখা করা শুরু করে দিলো। এমনকি এদেরকে বাদ দিয়ে গোপনে সুলতান সাহেবের কানে অধ্যক্ষ সাহেব ভালো এবং নিজের ব্যবসায়-শিক্ষা বিভাগ খারাপ, মুন্সিকে দিয়ে বিভাগের উন্নতি হবে না– মতামত দিতে লাগলো। ইনিয়ে-বিনিয়ে একটাই বক্তব্য সবখানে যে, বিভাগীয় প্রধান সোলাইমান মুন্সি প্রেজেন্টেবল নয়, সুবিধামতো আমাদের পছন্দের লোক বসাও। আমরা এনে দিচ্ছি। 'ওলোট-পালোট করে দাও বাবা, আরো ফাঁকি দিয়ে খাই।' অধ্যক্ষ মহোদয়ও খুব আহ্লাদিত ও খুশি, কী বল্লেরে চাচা, খাঁটি দুধে-ধোয়া কথা। ব্যবসায় বিভাগের লোকই খারাপ, এরা শুধু গ্রুপিং করে। সোলাইমান মুন্সি আসলেই লোক ভালো না; নইলে তাদের বিভাগের লোক তাকে খারাপ বলবে কেন! নতুন লোক একটা বসাতে তো হবে নিশ্চয়ই। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের লোক যেহেতু খারাপ, একজন বিজ্ঞান বিভাগের দো-আঁশলা লোক ওখানে বসালে কেমন হয়! সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে। সময় হলেই মিটাবো মনের অব্যক্ত ক্ষুধিত আশা।

তিন-চাটুকার বলে, সোলাইমান মুন্সি ব্যবসায় বিভাগ চালাতে জানেন না। আধুনিক স্মার্ট লোক দরকার। সতীর্থদের সাথে বলে, সংসার সমাজ ফেলে এখানে প্রতিদিন রাত পর্যন্ত বসে থাকা কি সম্ভব? আমরা শিক্ষকতা করতে এসেছি, গার্মেন্টসে চাকরি করতে তো আসিনি। কোম্পানির চাকরি ছেড়ে এ পেশায় এসেছি। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যদি এখানেই থাকবো, বেতন দ্বিগুণ দিতে হবে। আমার সময়ের দাম আছে। সোলাইমান মুন্সির যাবার কোনো জায়গা নেই। তাই এখানে পড়ে আছে। তার বউ ছেলে-মেয়ে দেখা লাগে না, আমাদের লাগে। গুল্লি মারো কলেজের কাজকর্ম। নিজের কাজ আগে, তারপর কলেজ, 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম'। কলেজ বড় হলে লাভ হবে সুলতান সাহেবের, সুখ্যাতি হলে হবে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ গোল্লায় গেলেই-বা আমার কী, উন্নতি হলেই-বা আমার কী লাভ! ঘরের শত্রু বিভীষণ অবস্থা।

তারা প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতির মধ্যে লাভ খুঁজে পাচ্ছে না, অথচ অধ্যক্ষের কাছে গিয়ে মোসাহেবির মধ্যে লাভ খুঁজে পাচ্ছে। তারা প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলার ধার ধারতে চায় না– কলেজের নির্ধারিত কাজকে ফাঁকি দিতে চায়। সুযোগ পেলেই বিনা ছুটিতে কলেজ কামাই। সকাল ন'টায় কলেজে এলে ক্লাস নেওয়া, কাউন্সিলিং সময়, বিভাগের কাজ মিলিয়ে চারটে পর্যন্ত অফিস। ক্লাসটা শেষ তো কাজ শেষ। দুপুরের দিকে কর্তার সামনে দিয়ে একবার ঢুঁ মেরে লাপাত্তা। আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। কেউ খোঁজও নেয় না। পিয়নকে জিজ্ঞেস করলে বলে মুখস্থ কথা– স্যার লাঞ্চে গেছে। লাঞ্চ সেরে স্যারের ফেরা আর জোটে না। হয়তো বাইরে কোথাও টিউশনিতে ব্যস্ত। বিশেষভাবে দরকার হলে, কোথাও খুঁজে না পেলে, পরের দিন অধ্যক্ষ জিজ্ঞেস করতে পারেন। হাসিমুখে একটা সহজ উত্তর রেডি করাই থাকে– স্যরি স্যার, সিনসিয়ারলি স্পিকিং, বাসা থেকে হঠাৎ একটা খারাপ সংবাদ পেয়ে জরুরিভাবে না গিয়ে পারা গেল না, স্যরি, রিয়েলি স্যরি স্যার। স্মার্টলি কথাটা বলতে পারলেই নিজেও আঁতেলের ভাব নিয়ে সরে আসা যায়, আবার স্যারও সন্তুষ্ট হন। এগুলো তো সবাই পারে না। যাদের বিবেকের দংশন নেই, যারা নিজেকে সত্য-মিথ্যা দিয়ে ফলাও করে উপস্থাপন করতে পারে, চাপাবাজিতে ওস্তাদ– তারা

পারে। যুগটাই তো চাপাবাজদের যুগ। ওরাই সর্বেসর্বা। সব জায়গায় মানানসই। আত্মজিজ্ঞাসার বালাই নেই, কোনো নৈতিকতা নেই, মুখের কোনো জড়তা নেই– এরাই সফলকাম, সমাজে এরা চালু লোক নামে খ্যাত। চারদিক এদের জয়-জয়কার। বড়কর্তারাও এদের গুণকীর্তনে মুগ্ধ। তেল ও সুবিধা 'দেবে আর নেবে, মিলিবে মিলাবে, যাবে না ফিরে, এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'।

কলেজে হেলাল উদ্দিন নামে একজন কর্মচারী প্রথম থেকেই আছেন। হেলাল দপ্তরি নামে পরিচিত। কলেজেই রাত্রিযাপন করেন। প্রত্যেক পিরিয়ডে ঘণ্টা দেওয়া থেকে শুরু করে অধ্যক্ষের কাগজপত্র, ফাইল গোছানো তাঁর কাজ। তিনি নিভৃতচারী স্বভাবের লোক। কম কথা বলেন, কাজ করেন বেশি। কলেজের প্রতিটা জিনিস চোখে চোখে রাখেন। ছোট পর্যায়ের কর্মচারী হলেও সূক্ষ্মদর্শী একজন অসাধারণ মনের মানুষ। প্রতিটা কাজ তাঁর নখদর্পণে। মাঝে-মধ্যে অধ্যক্ষের চেয়ারের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। কলেজের পরিস্থিতি নিয়ে অনুযোগের সুরে কাজটা ভালো না মন্দ হচ্ছে– অল্প কথায় ভদ্রভাবে জানিয়ে চলে আসেন। তাঁর কথা তেমন কেউ গুরুত্ব দেয় না, বিবেচনাও করে না। তবু তিনি বলেন। অফিসে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দ্বিমুখী আচরণের কথা বলেন। তাদের মিথ্যা কথা কারো কানে লাগিয়ে কান ভারী করার কথা বলেন। সোলাইমান মুন্সি একজন সৎ ও কর্মঠ লোক এবং প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছু বোঝেন না– তা বলেন। শুধু ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগেই নয়– প্রত্যেক বিভাগেই বেশ কিছু ফাঁকিবাজ শিক্ষক আছে, সে-কথাও বলেন। মৃদু ভাষায় বলেন। অধ্যক্ষ মহোদয় তাঁর কথা কানে তোলার সময় পান না। কলেজের প্রতিটা পিরিয়ডে ঘণ্টার ধ্বনি বেজে উঠলে সবাই তা কানে তোলেন এবং ভাবেন, এটা হেলাল দপ্তরির কাজ।

একটা বেসরকারি কলেজের বেশ কিছুসংখ্যক শিক্ষক ফাঁকি দিলে, কলেজ প্রশাসনসহ প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারী সবাই একটা বিভাগের প্রতি ঝুঁকে পড়লে, ভবিষ্যৎ উন্নতির রূপরেখা না বুঝলে, হাম বেশি বুঝনেওয়ালা ভাব নিলে, আক্কেল না থাকলে এবং অন্য বিভাগ দুটোর প্রতি মনে মনে বিমাতাসুলভ আচরণ করলে– সে প্রতিষ্ঠান চলে কীভাবে! একই রকমের ফাঁকি বিজ্ঞান বিভাগের

শিক্ষকরা বেশি দিচ্ছে, সেগুলো অধ্যক্ষ ও তাঁর অধীনস্থের চোখ এড়িয়ে যায়। দেখেও না-দেখার ভান করেন। 'যত দোষ, নন্দ ঘোষ।' প্রশাসনিক স্টাফ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকদের সাথে সখ্য গড়ে তোলে, সে-কথা অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষকে কথায় কথায় শোনাতে তারা পছন্দ করে। আর বাকি দুটো বিভাগের উপর খড়্গহস্ত, দোষ-ত্রুটি ধরা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। কথায় আছে, 'হিংসার গাছ বাড়ে না'। তবু এর ভিতর দিয়ে অভিভাবকহীন বৈপিত্রেয় সন্তানের মতো একপেশে হয়ে বেড়ে উঠছে দুটো বিভাগ। হাল ধরেছেন সোলাইমান মুন্সিসহ আরো কিছু বিভাগীয় শিক্ষক-কর্মচারী।

সোলাইমান মুন্সির উন্নয়ন পরিকল্পনা আলাদা। তিনি কলেজের জন্য প্রচুর সময় দেন, কলেজকে নিয়ে ভাবেন। তিনি চান প্রথম থেকেই মানের ক্ষেত্রে কোনো আপস না করা। মান একবার নীচে নেমে গেলে, উপরে উঠানো অনেক কঠিন। 'সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়।' 'সময় থাকতে সাধু সাবধান' হওয়াই ভালো। প্রথম দিকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীকে কলেজে ভর্তি করা। শিক্ষকদের চেষ্টার মাধ্যমে তাদেরকে দিয়ে ভালো রেজাল্ট করানো। শিক্ষার মান নিয়ে আপস না করা। এভাবে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক মহল যদি বুঝতে পারে যে, এ কলেজে ভালো ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয় এবং ভালো রেজাল্ট করা যায়, তাহলে পরবর্তী বছর থেকে ভালো ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির চাপ বেড়ে যাবে। প্রয়োজন সত্য কথাটা উপযুক্ত মাধ্যম ব্যবহার করে উপযুক্ত সময়ে বাজারে জানান দেওয়া। মধ্যম মানের বা নিম্নমানের ছাত্রছাত্রীরা আপনা-আপনি ক্রমশই দূরে সরে যাবে। যা কিছু করা হোক– কলেজে অভিভাবকদের সম্পৃক্ততা বাড়িয়ে, তাদের সচেতনতাকে জাগিয়ে– এ কলেজ যে একটা ভালো কলেজ, তা জানান দেয়া যায়, আবার কলেজটাও ভালো কলেজ হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়। এসব বিষয়ে উদাসীন হলে ভালো ছাত্রছাত্রী কোনোদিনই স্বেচ্ছায় এখানে ভর্তি হতে আসবে না। এ দেশে নিম্নমানের ছাত্রছাত্রীর অভাব নেই। আজীবন মধ্যম ও নিম্নমানের ছাত্রছাত্রী নিয়ে জীবন কাটাতে হবে। ঢাকা শহরে এমন শতেক কলেজ সাধারণ কলেজ হিসেবে জীবন

কাটাচ্ছে। কোনো উন্নতি নেই, বন্ধও হয়ে যায় না। দিন এনে দিন খাওয়া কিসিমের অবস্থা। এই তাল বুঝতে না পারলে কলেজের উন্নতি অসম্ভব। ভালো মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়ার বিষয়ে দলে চলে। একবার সাধারণ আর-দশটা কলেজের মতো কলেজ হিসেবে জনসমাজে স্বীকৃতি পেয়ে গেলে, সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ুয়াদের কলেজ বলে প্রতিষ্ঠা পাওয়া দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার শামিল। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় মধ্যম ও নিম্নমানের ছাত্রছাত্রীরা পড়ালেখায় উদাসীন। এরা শিক্ষাবিমুখ। রাতদিন মোবাইল ফোন ও ফেসবুকের মতো বিষয় নিয়ে পড়ে থাকে। শিক্ষকদের ডাকে এরা সাড়া দেয় না। কোনো কিছু মনোযোগ দিয়ে শিখতে চায় না, শুধু ভালো গ্রেড পেতে চায়। এরা কখনো জীবনের উচ্চ-পর্যায়ে যেতে পারেও না। এরা জীবনের লক্ষ্যবিমুখ, ভবিষ্যৎ উদাসীন। যত নসিহতই করা হোক না কেন, এদের অধিকাংশই মূল শিক্ষাজীবন থেকে ছিটকে পড়বে। অল্প-পড়া পেশা নিয়ে জীবন কাটাবে। শিক্ষকরাও এদেরকে পড়িয়ে তৃপ্তি পায় না। অভিভাবকমহল বেশি পরিমাণ টাকা খরচ করে মানসম্মত কলেজে ছেলেমেয়েকে পড়াতে আগ্রহী। ছেলেমেয়ে লেখাপড়া ভালো করে শিখুক– এটা তাঁরা চান। ছাত্রছাত্রী ভবিষ্যৎ শিক্ষা-সচেতন না হলে, মনোযোগী না হলে সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। ইনপুট ভালো না-হলে কোয়ালিটি আউটপুট পাওয়া সবসময়ই অসম্ভব। প্রসেস উন্নয়ন করে আউটপুটের আংশিক উন্নয়ন সম্ভব। প্রসেস উন্নয়ন আবার ভালো পরিবেশ ও উন্নত ডিভাইসের উপর নির্ভর করে, বিমাতাসুলভ পরিবেশে অবনতি হয়। 'গার্বেজ ইন, গার্বেজ আউট'– কথাটা পুরোপুরি সত্য।

কলেজ নিয়ে এমন অসংখ্য উন্নয়নের টেকনিক্যাল কথা মুন্সি বলেন। কে শোনে কার কথা! সোলাইমান মুন্সির কোনো কথা অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ কানে তোলেন না, দুর্ব্যবহারও করেন না। ধীরে ধীরে এড়িয়ে যান। সোলাইমান মুন্সি ব্যবসায়-শিক্ষা বিভাগের লোক– এটাই তাঁর বড় অপরাধ। তাঁর উদ্ভাবনী দক্ষতার কাছে টেকা যায় না– আরো অপরাধ। তিনি আবার স্পষ্টবাদী, প্রয়োজনে চাঁচাছোলা কথা বলেন– এটা আরেকটা অপরাধ। একে তো মেথর-ঘরের লোক, তার উপর আবার পায়খানা করে ফেলেছে– ঘৃণ্য কাজ, অতি জঘন্য অপরাধ, অচ্ছুত প্রজাতি।

অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ ট্যাক্টফুল এবং ভদ্র ঘরের সন্তান, তাই কাউকে ঘাটাতে চান না। মালিকপক্ষকে মুন্সিকে নিয়ে খারাপ ধারণা দিলে, অগোচরে দেন। মুন্সির উন্নয়ন চিন্তাধারায় 'কানে দিয়েছেন তুলো, পিঠে বেঁধেছেন কুলো'। নিন্দুক মহল অধ্যক্ষকে এসে জুজু বুড়ির ভয় দেখান, তাঁর কথামতো চললে পরে আপনারা বিপদে পড়ে যাবেন। যত ভালো কথাই বলুক, নিলেই আপনাদের অযোগ্যতা প্রমাণিত হবে, এড়িয়ে চলুন। এখন থেকে সাবধান হোন। এই যে অভিভাবকমহলকে সম্পৃক্ত করার কথা উনি বলছেন না? এতে আপনাদের টাকাই শুধু খরচ হবে। অভিভাবকমহল তো তাদের ছেলেমেয়েদের এখানে ভর্তি করেই ফেলেছে, তাদেরকে সম্পৃক্ত করার আবার দরকার কী? দিন গেলে কোয়ালিটি ছাত্রছাত্রী এমনিতেই আসবে। আমাদের ভালো বিল্ডিং দেখেই আসবে।

এসব কথা মুন্সির কানে পৌঁছলে তিনি মৃদু হাসেন। বলেন, বিশ্বের এমন কোনো প্রতিষ্ঠান আমার চোখে পড়েনি, যারা প্রডাক্ট কোয়ালিটির সাথে আপস করে ভালো ব্রান্ডেড প্রতিষ্ঠান হতে পেরেছে। আর শিক্ষাঙ্গনের মুখপাত্র– এর ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকমহল। তাদের মুখেই জয়, আবার তাদের মুখেই ক্ষয়। কলেজে পড়ার চাপ একটু বেশি দিলে ছাত্রছাত্রীরা কখনো কখনো নাখোশ হলেও বাজারে ভালো কলেজ নামটা ভালো ছাত্রছাত্রীরাই ছড়ায়। অভিভাবকমহল সব সময় বেশি বেশি পড়ানোর পক্ষপাতী। তাঁরা পকেট থেকে টাকা দেওয়ার কারণে ছেলেমেয়ে মিছেমিছি পড়ে সার্টিফিকেট পাক, এটা কখনোই চান না। কলেজের সুনামটা অভিভাবকমহল দিয়েই বেশি ছড়ায়। তাঁরা সমাজে বিভিন্ন পর্যায়ের লোকের সাথে মেশেন এবং কলেজের অনুকূলে বিজ্ঞাপনের কাজ করেন। সব কিছুই তো বোঝার বিষয়। কেরানিকুলের কথামতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালালে এবং তাদের যুক্তিকে স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিলে– এত বড় বড় পোড়-খাওয়া শিক্ষক রাখার প্রয়োজন কি! এডুকেশনাল ম্যানেজমেন্টের দক্ষতারইবা দরকার কি!

অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ শুধু সস্তা জনপ্রিয়তার পথ খোঁজেন। লেখাপড়ায় বেশি চাপ দিতে নিষেধ করেন– এতে না-কি ছাত্রছাত্রীরা বাজারে কলেজ নিয়ে দুর্নাম ছড়াবে।

ছাত্রছাত্রীদের মন জয় করার জন্য বেশি বেশি নম্বর দিয়ে সহজে পাস করিয়ে দিতে বলেন। এতে ছাত্রছাত্রীরা নাকি বেশি উৎসাহিত হবে এবং বেশি বেশি ছাত্রছাত্রী আনবে, কলেজের সুনাম বাড়বে, শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি হবে ইত্যাদি।

এর মধ্যে বাতেন মিয়া নামের একজন অফিস এক্সিকিউটিভ কলেজের অফিসে যোগদান করলো। হেড-ক্লার্ক, সহকারী হেড-ক্লার্ক পদ আর কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বর্তমানে ব্যবহার করে না। এসব নামের পরিবর্তে ডাইরেক্টর প্রশাসন, ডেপুটি ডাইরেক্টর প্রশাসন, অফিস এক্সিকিউটিভ ইত্যাদি পদবি ব্যবহার করে। বাতেন মিয়া দুই মাসের মধ্যে তার সহকর্মীদের তরিকা ধরে গ্রুপে মিশে গেলো। আস্তে আস্তে অধ্যক্ষের পাশে জায়গা করে নিলো। অধ্যক্ষের বাসার সুবিধা-অসুবিধা, সেবাদান চালাতে থাকলো। বাকি তিনজনের সাথে কুটিল পরামর্শে যোগ দিলো। টেকনিক প্রয়োগ করে বাকি তিনজনের থেকেও আরেক ধাপ উপরে উঠে অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষের বেশি কাছে চলে গেলো। শিক্ষকরা এদেরকে চার খলিফা নামে আখ্যায়িত করলো। কর্তা খুশি তো দুনিয়া খুশি–তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ দেখাতে লাগলো। ক্রমশ ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক শিক্ষা বিভাগে শিক্ষকদের উপর দাপট বাড়িয়ে দিলো। যেসব কর্মচারী-কর্মকর্তা 'চার খলিফা'কে সাধন-ভজন করতে পারে, খলিফাদের সাথে তাদের পদোন্নতিও ত্বরান্বিত হলো। 'বাবু যত বলে পারিষদ-দলে বলে তার শতগুণ।' খলিফারা ক্ষমতায় কলেজের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলো। বাতেন মিয়া গ্রামের বাড়িতে ছুটি নিয়ে গেলে ফিরে এসে মা-বাবা, ভাই-বোন কেমন আছে, তার আব্বা সালাম জানিয়েছেন ইত্যাদি অধ্যক্ষকে বলে। চলতি পথের বাজার থেকে কাঁঠাল, রুইমাছ ভালো দামে স্যারের জন্য কেনে। স্যারের বাসায় পৌঁছে দিতে পেরে তৃপ্তি পায়। স্যার, 'এসব এনেছো কেন, এটা ভালো না' বললে প্রত্যুত্তরে আনুগত্যের হাসি মুখে ফুটিয়ে, মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলে, 'গাছের কাঁঠাল স্যার, পুকুরের মাছ স্যার। বাড়িতে গেলাম তাই আপনার জন্য নিয়ে এলাম, স্যার'! অধ্যক্ষের কাছে সে খুব কর্মঠ ও বিশ্বস্ত লোক হয়ে গেলো; সে তার বুদ্ধিমত্তা দেখিয়ে অফিসের অনেক টাকা সাশ্রয় করে দেয় ইত্যাদি। এর প্রমাণ অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষকে ইনিয়ে-বিনিয়ে দিতে শুরু

করলো। তাঁরা তাতেই খুশিতে গদগদ। সে নিজে অগোচরে কিছু কৃত্রিম সমস্যা তৈরি করে, অধ্যক্ষের সামনে এসে সে সমস্যার সমাধান করে কৃতিত্বের দাবিদার হয়। সে ছাড়া অফিসের কেনা-কাটা, স্পট কোটেশন নেওয়া আর চলে না। তার কাছে অফিসের গোপন রাখার কিছু নেই। সন্ধ্যার আগে অফিস খালি হয়ে গেলে এই চারজন অধ্যক্ষের সাথে একসাথে বসে। কখনো পালাক্রমে বসে গল্প করে, আর পায়ের উপর পা তুলে বসে চা খায়। বিভিন্ন ব্যক্তি ও কাজের আলোচনা, সমালোচনা করে। তাদের আলোচনাই চূড়ান্ত। এদের সাথে করে নেওয়া সিদ্ধান্ত অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ শিক্ষক পরিষদের মিটিংয়ে পাস করিয়ে নেন। এরা কলেজের নীতি-নির্ধারকের ভূমিকায় চলে এলো। বিভাগীয় প্রধানদের কোনো মূল্যই আর থাকলো না। শিক্ষকেরা বিষয়টাকে একজন অধ্যক্ষের সম্মানের অধঃপতন হিসেবে দেখে কানাঘুষা করা শুরু করে দিলো। কিছুদিন পর দুর্মুখেরা বলাবলি করতে লাগল যে, বাতেন মিয়া কলেজের প্রতিটা কেনাকাটায় লাভ করেছে এবং সাপ্লায়ারদের পকেটম্যান হয়ে গেছে। এখানে মাল সাপ্লাই দেওয়ার জন্য কোনো এক আত্মীয়কে সাথে নিয়ে গোপনে অংশীদারী ব্যবসায় নেমেছে। সব অভিযোগ অপপ্রচার ও কুৎসা বলে অধ্যক্ষ উড়িয়ে দিতে থাকলেন। সোলাইমান মুন্সি ক্রয় কমিটির একজন সদস্য। বাতেন মিয়ার এমন উল্টাপাল্টা কাজ-কারবারে আপত্তি তোলাতে তাঁকে বিভিন্ন গায়েবি অপবাদ দিয়ে অধ্যক্ষ ও সুলতান সাহেবের কান ভারী করে বহাল তবিয়তে টিকে থাকলো। ক্রমশ সুলতান সাহেব ও তাঁর ছেলের আরদালি ও তথ্য সংগ্রহের নির্ভরযোগ্য উৎসে পরিণত হলো। অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ এতে খুব খুশি। এমন কি অধ্যক্ষ বাতেন মিয়ার কাজে কোনো ভুল, নিজের ভুল বলে গায়ে পেতে নিতে থাকলেন। দিনে দিনে বছর পেরোতে থাকলো।

আলাউদ্দিন মিয়া ও বাতেন মিয়াকে বিভিন্ন কাজের প্রয়োজনে সুলতান সাহেব ও তার ছেলের সাথে দেখা করার ব্যবস্থা অধ্যক্ষ মহোদয় করে দিলেন। দু-জনে অধ্যক্ষ মহোদয়কে যুগের শ্রেষ্ঠ মহামানব এবং তারা দু-জনে কলেজের উন্নতির কাজে সদাসর্বদা নিবেদিতপ্রাণ বলে মালিকপক্ষের কাছে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে থাকলো।

বাতেন মিয়ার বাড়ি থেকে তার বিয়ের বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। বাতেন মিয়া একদিন সন্ধ্যার আগে অফিসে একাকী স্যারের সাথে খোশগল্পের সময় বললো, স্যার, আপনার অনুমতি ছাড়া বাড়ি থেকে বিয়ে দিতে চাচ্ছে না। ঢাকাতে তো আপনিই আমার গার্ডিয়ান। অধ্যক্ষ মহোদয় সহাস্যে বললেন, বিয়ের বয়স হয়েছে– আপত্তি তো কোথাও দেখিনে। করে ফেলো। সাত দিনের মাথায় আবার সন্ধ্যার আগে কথাচ্ছলে বাতেন মিয়া বিয়ের কথা পাড়ল। বলল, স্যার, মেয়েপক্ষের কাছে আমার পদ অফিস এক্সিকিউটিভ বলতে খুব লজ্জা লাগে, তারাও গুরুত্ব দেয় না, নিজেকে ছোট ছোট মনে হয়। আমার পদের নামটা এসিসটেন্ট ডাইরেক্টর করা যায় না! আবার কিছু বেতন না বাড়লে বিয়ে করে খাবো কী! নইলে তো বিয়ে করা যাচ্ছে না।

অধ্যক্ষ মহোদয় 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, কথা তো সত্য। আর তুমি অফিসের জন্য যেভাবে কষ্ট করো, তোমার একটা ভালো পদ পাওনা হতেই পারে। আমি বিষয়টা ভালোমাতো দেখবো' বলে হাসতে লাগলেন। বাতেন মিয়ার বাতেনি চাল ধন্বন্তরি দাওয়া হিসেবে কাজে দিলো।

বাতেন মিয়া, আলাউদ্দিন মিয়া, রোহেলা বানু ও মতলব মিয়ার পদোন্নতি, অফিসের সুযোগ-সুবিধা নেওয়া ও বেতন বৃদ্ধি নিয়ে শিক্ষক, অফিস ও বিভিন্ন বিভাগের অফিস-কর্মচারীদের মধ্যে চাপা অসন্তোষ দেখা দিলো, কেউ মুখ খুলে কিছু বললো না। বছর গড়াতে থাকলো। কিছু কিছু কর্মচারী এদের রোষানলে পড়ায় সাত-আট বছর প্রমোশন আটকে গেলো। কলেজের ছাত্রসংখ্যা বেশি বাড়লো না। গতানুগতিক বিজ্ঞান কলেজ বলেই বাজারে প্রচার পেতে থাকলো। অবকাঠামোগত উন্নয়ন মালিকের নিজের হওয়াতে বড় আটতলা চোখধাঁধানো বিল্ডিং হলো, দেয়ালে পরিপাটি শিল্পকর্ম বসানো হলো, কলেজের সামনে গ্লাসের মধ্যে টাকা খরচ করে বাহারী আয়োজনে নকশিকাঁথার উপস্থাপন হলো, কিন্তু প্রশাসনিকভাবে অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার, ঊর্ধ্বতন-অধঃস্তন বাছবিচার, একটা স্ট্র্যাটিজিক প্লান এবং সে মোতাবেক দায়িত্ব সাজানো ও তার প্রয়োগ, ভালো ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণ, কোয়ালিটি শিক্ষা নিয়ে ভাবনা ও ভাবনার বাস্তবায়ন,

অসংখ্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে ভালোগুলোকে কলেজের জন্য বেছে নেওয়ার সৌভাগ্য– এক যুগেও হলো না। ভালো ছাত্রছাত্রী এলো না। 'কেউ ফেরে না খালি হাতে খাজারে তোর দরবারে' চলছে। প্রয়োজনীয়-সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয় না। কলেজের শিক্ষাকার্যক্রম ঢিমেতেতালাভাবে চলতে থাকলো। বিজ্ঞান কলেজ বানানোর অব্যক্ত স্বপ্ন শিকেয় উঠলো।

অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ এবং 'চার খলিফা' মালিকপক্ষকে কলেজের অর্জনের অনেক ভালো ভালো দিক খুঁজে বের করে তালিকা তৈরি করছেন, দেখাচ্ছেন। তবু বারো বছর পর এসে সুলতান সাহেব বেঁকে বসেছেন। তিনি ব্যবসায়ী মানুষ, ব্যবসা ভালো বোঝেন। তিনি কলেজ ব্যবসায় আর টাকা খরচ করতে চান না। 'আছিলাম বোকা, হইলাম বুদ্ধিমান' বলে বুঝতে শিখেছেন। কোটি কোটি টাকার বিল্ডিং কলেজের জন্য আর দিয়ে রাখতে চান না। তাই, কর্মকর্তা-কর্মচারী-শিক্ষক সবারই হাত মাথায় উঠেছে। মাথায় হাত দিয়ে তারা ভাবতে বসেছেন। মাথা চুলকাতে গিয়ে মাথার চুল উঠে যাচ্ছে। এর মধ্যে সুসংবাদ একটা হলো, 'চার খলিফা' ও বিভাগীয় 'তিন কুচক্রী' শিক্ষকের অপতৎপরতায় সোলাইমান মুন্সিকে বিভাগীয় প্রধানের পদ থেকে দু-বছর আগেই সরিয়ে দিয়ে সাধারণ কলেজশিক্ষক হিসাবে রাখা হয়েছে। সোলাইমান মুন্সি কোনো প্রতিবাদ করেননি। তাঁর কথা হলো, কোনো কথা যেহেতু শোনে না, কাজও করতে দেয় না, পরিকল্পনা মোতাবেক চলে না, সুনির্দিষ্ট অর্গানোগ্রামও মেনে চলে না, কোনো স্ট্রাটিজিক প্লানও করে না, কথাও নেয় না– সেখানে অহেতুক তর্কাতর্কি না করে সাধারণ শিক্ষক হয়ে থাকাই ভালো। তারা সবাই উন্নতি করুক, আমরা ছাত্রছাত্রী পড়াই, তাঁরা কী করে দেখি। তবে তিনি এই কলেজের চাকরি থেকেই অবসরে যেতে চান, কলেজের সুখে-দুঃখে থাকতে চান। তবু ঐ অপশক্তি কলেজ থেকে মুন্সিকে মিথ্যা দুর্নাম দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে মাঠে নেমেছে। তাদের মনের কথা হলো– 'সোলাইমান মুন্সি সৎ হোক, আর অসৎ হোক, এতে আমাদের কিছু যায়-আসে না। উনি আমাদের আর্থিক উন্নতির পথে বাধা। আমরা ভালো থাকি, মুন্সি তা চান না। মুন্সির ঐ সততা ধুয়ে পানি খেলে আমাদের জীবন চলবে

না। আমরা যদি মালিকপক্ষের সাথে সদ্ভাব গড়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি, তাতে মুন্সির কী? এ দেশে তো এভাবেই মানুষ উন্নতি করছে। মুন্সি যুগের অনুপযুক্ত হলে, আমাদেরও যে অনুপযুক্ত হতে হবে, এমন তো কোনো কথা নেই!'

ঐ সময় হেলাল দপ্তরি অধ্যক্ষের কাছে একটা প্রশ্ন উঠিয়েছিলেন– স্যার, আমার মনে হয় সোলাইমান মুন্সি একজন সৎ ও ভালো মানুষ। তাঁর পরামর্শগুলো অনেক ভালো। কলেজের উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট। ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক বিভাগের মধ্যেও তো বিজ্ঞান আছে; যেমন– হিসাববিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ব্যবসায়-বিজ্ঞান। এগুলোকে আপনারা দূরে ঠেলে দিয়ে শুধু আপনাদের বিজ্ঞান নিয়ে চলতে চান কেন? এতে কলেজ কোনোদিনই পরিপূর্ণতা পাবে না। তাছাড়া আপনাদেরকে যারা কুকথা লাগায়, কুমন্ত্রণা দেয়– এরা সবাই মতলববাজ। অধ্যক্ষ মহোদয় ধমকের সুরে বলেছিলেন, তুমি অত বুঝবে না। আমরা সেই ক্লাস নাইন থেকে আমাদের বিজ্ঞান পড়ে আসছি, এদিকে তো আমাদের টান থাকতেই পারে। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ ও মানবিক বিভাগ– ওদের ভাষা ভিন্ন, ওদের কথা আমরা বুঝিনে, ওদের মধ্যে জটিলতা বেশি, ওরা আমাদের সাথে চলতে পারে না। ওদের মধ্যে বিজ্ঞান থাকলেও পার্থক্য আছে। আমরা ওদের তুলনায় অনেক ভালো ছাত্র ছিলাম। তুমি এগুলো নিয়ে ভেবো না– এগুলো বুঝবে না। আর তুমি যাদেরকে কুমন্ত্রণাদাতা বলছো– এরা সবাই ভালো লোক, আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী– এরা কলেজের জন্য রাত-দিন কাজ করে যাচ্ছে।

আসলে ধারণাগতভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের চিন্তাধারা যদি পক্ষপাতদুষ্ট হয়, সেখান থেকে ফিরিয়ে আনা আর সম্ভব হয় না। নিজের অজান্তেই নিজে ভোগে, অন্য অনেককেই ভোগায়। দিনে দিনে মালিকপক্ষের অজান্তে, কিংবা বেশি বোঝার কারণে একটা প্রতিষ্ঠানের অমিয় সম্ভাবনা নীরবে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। কে সত্য, কে মিথ্যা তলিয়ে দেখার ফুরসত কোনোদিনই আর হয় না। সময়ের অতিক্রমণে সবই নীলিমায় উধাও হয়ে যায়।

সিদ্ধান্ত পাকাপাকি হয়ে গেছে। ছাত্রছাত্রীদের অন্য একটা কলেজের সাথে মার্জ করে দিতে হবে। সুরম্য কলেজ ভবনকে বহুতলবিশিষ্ট আধুনিক বিপনি-বিতান করা হবে। সে মতো, আগামী সেপ্টেম্বরের বিশ তারিখে সমস্ত কর্মচারী-শিক্ষক কলেজে আসবেন। পাওনাদি বুঝে নিয়ে কুশল বিনিময় করে সারিবদ্ধ অবস্থায় সবাই একসাথে নেমে যাবেন। রুচিশীল মালিকপক্ষের সিদ্ধান্তে ভদ্রভাবে বিদায়!

হেলাল দপ্তরির কলেজ বন্ধ হয়ে যাওয়া নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। তিনি নির্বাক। কেন আজকের এই পরিণতি তা তিনি মনে মনে জানেন, বোঝেন; কিন্তু কিছু করার নেই। তাঁর কথা শোনার মতো কোনো লোকও নেই। তাঁর চাকরি পাওয়া নিয়েও কোনো চিন্তা নেই– ছোট্ট একটা পদ, কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা আছে, কোথাও-না-কোথাও একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। না হলে পথের ধারে একটা ছোট্ট দোকান দিয়ে বসবেন।

একদিন বিমর্ষ অবস্থায় অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ বসে কথা বলছেন। হেলাল দপ্তরি সেখানে এলেন। স্বাভাবিকভাবে অধ্যক্ষের চেয়ারের পাশে যেভাবে দাঁড়ান, সেভাবে দাঁড়ালেন। বললেন, স্যার একটা গল্প বলবো? আমার কথা তো কেউ শোনে না, আপনাদের অনুরোধ করছি শোনার জন্য। জানিনে জীবনে আপনাদের মতো এতো গুণীজ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে কাজ করার সৌভাগ্য আমার আর হবে কী-না। বলবো? অধ্যক্ষ মহোদয় সম্মতি দিলেন।

হেলাল দপ্তরি মুখ খুললেন: আমাদের গ্রামের পাশে ছোট্ট একটা বাজার। সপ্তাহে দুই দিন হাট বসে। দুই জন চর্মকার প্রতি হাটবারে এসে একটু দূরে দূরে রাস্তার ধারে বসে জুতা সেলাই ও রং করে। তাদের কথা ও কাজে কেউ তেমন একটা কর্ণপাত করে না। দু-জনই আপন ভাই। একদিন দু-জনই কাজ করছে। হঠাৎ ছোট ভাইটা উঠে এসে বড় ভাইকে জিজ্ঞেস করলো– আমার মাথায় তো এটা কিছুতেই খেলছে না দাদা, এ দেশে তো অধিকাংশই মুসলমান। আমি না সেদিন ঠাকুরের কাছে শুনলাম, রাম নাম না জপলে কেউ সগ্‌গে যাবে না। তাহলে এত মুসলমান, কেউ কি সগ্‌গে যাবে না? ওরা তো রাম নাম জপে না। বড় দাদা

অনেকক্ষণ চুপ থাকলো। বললো– তাই তো, বড় চিন্তার কথা! তুই তো আমার মাথাটা ঘুরিয়ে দিলি রে। একটু ভাবতে দে। এত লোক নরকে গেলে তো চলে না! সগ্‌গে না গেলে কী করে হয়! সগ্‌গ তো ফাঁকা পড়ে থাকবে। একটু ধৈর্য ধর, ভেবে দেখি। ছোট ভাইটা তার জায়গায় গিয়ে কাজে মন দিলো। একটু পরে বড়ো ভাই হাতের ইশারায় আবার ছোট ভাইকে কাছে ডাকলো। বললো– এতো ভাবিসনে রে, যাবে যাবে, ওরাও যাবে। অনেক ভেবে দেখলাম। ওরা রাম নাম বলে না সত্যি। কিন্তু মুসলমানরা কথায় কথায় ঐ-যে 'হারাম' 'হারাম' কথাটা বলে। ওর মধ্যেও তো রাম নাম লুকিয়ে আছে রে। তাই সগ্‌গে ওরাও যাবে। তুই ওদের নিয়ে আর এত ভাবিসনে।

গল্পের তত্ত্বকথা অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ বুঝতে পারলেন কি-না কিছুই বললেন না। কিন্তু দু-জনেই এতো বিষণ্ণতার মধ্যেও একটু হাসলেন। হেলাল দপ্তরি তাঁর কাজে চলে গেলেন।

বিশ তারিখ সকালবেলা কলেজে এসে সোলাইমান মুন্সি হেলাল দপ্তরিকে একটা রুমে একাকী ডাকলেন। তাঁকে বুঝিয়ে বললেন। খাতার একটা পৃষ্ঠা ছিঁড়ে মাঝখানে আধ ইঞ্চির মতো কাচি দিয়ে কেটে গোলাকার ছিদ্র করলেন। যখন সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী-শিক্ষক সারিবদ্ধ অবস্থায় নীচের রাস্তা দিয়ে কলেজ কম্পাউন্ড থেকে বের হয়ে যাবে, তখন অধ্যক্ষ মহোদয় তাঁর সাত তলায় অবস্থিত অফিস রুমের জানালা দিয়ে বাম চোখ বন্ধ করে ডান চোখ মেলে এই কাগজের ছিদ্র দিয়ে সারিবদ্ধ সবার চলে-যাওয়া দেখবেন। মুন্সি সাবধান করে দিলেন, ভুলেও যেন অধ্যক্ষ মহোদয় কাগজের ফাঁকা দিয়ে নিজের দিকে না তাকান। এতে তাঁর ক্ষতি হবে।

হেলাল দপ্তরি তাই করলেন। বিদায়ের সময় হলে অধ্যক্ষ মহোদয়কে বিস্তারিত বুঝিয়ে বলে হেলাল দপ্তরি ঢং ঢং ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজিয়ে চললেন। ঘণ্টাধ্বনি অনেকক্ষণ চললো। অধ্যক্ষ মহোদয় জানালায় দাঁড়িয়ে কাগজের ছিদ্র দিয়ে সহকর্মীদের 'সারিবদ্ধ বিদায়' দেখলেন। সারির মাঝে-মধ্যে কোনো কোনো

জায়গায় তাঁর দৃষ্টি আটকে যাচ্ছে। অনেক মানুষের লাইনে কেউবা গরু, কেউবা ধূর্ত শিয়াল, কেউ বুনো শুয়োর, কেউ আবার গাধার রূপে লাইন ধরে সামনে চলেছে। এমন সংখ্যা আট-দশজনের হবে। অধ্যক্ষ মহোদয় আশ্চর্যান্বিত হলেন। তাড়াতাড়ি কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রাখলেন। হেলাল দপ্তরিকে সোলাইমান মুন্সিকে খুঁজতে পাঠালেন। হেলাল দপ্তরি সমস্ত বিল্ডিং তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সোলাইমান মুন্সির দেখা পেলেন না। সোলাইমান মুন্সি হয়তো ততক্ষণে লাইনে মিশে গেছেন।

(পল্লবী, ঢাকা: ০৫.১০.২০২০ইং)

পিতৃপক্ষ

আজগর আলি সাহেব একজন সমাজসেবক ও সমাজসচেতন মানুষ। তিনি দীর্ঘ বছর ধরে কলেজে শিক্ষকতা করেন। বর্তমানে অবসরের বয়স শেষ হবার পরও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে চাকরির এক্সটেনশন নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি সমাজের অন্তর্নিহিত ভাবধারা, জনমত নিয়ে ভাবেন ও বিশ্লেষণ করতে ভালোবাসেন। ইদানীং তিনি প্রতিদিন কলেজ থেকে বাসায় আসার পর বারান্দায় একটা চেয়ার নিয়ে বসে দূর অজানার দিকে তাকিয়ে থাকেন। কখনো মুখে হাত দিয়ে ভাবেন। বিভিন্ন বিষয়ে সবসময় অন্যমনস্ক ভাব পরিবারের সবাই লক্ষ করেন। তিনি সবসময় কী যেন একটা কিছু ভাবেন, বোঝা যায়। কারো সাথে কোনো কথা শেয়ার করেন না। সমাজের উন্নয়নমূলক কাজ করে যান। স্মৃতিশক্তি যেন একটু বেশি কমে যাচ্ছে বলে পরিবারের সবার কাছে মনে হয়। পরিবারের কেউই ভয়ে তাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে না। তিনি চলাফেরা ও কথায় ভাবগম্ভীর মনোভাব বজায় রাখেন।

তাঁর একমাত্র ছেলের নাম রাহবার। ছেলেটা বাপের পিছলাগা। কাছে কাছে থাকতে পছন্দ করে। আজগর আলি সাহেবও ছেলেকে একজন দেশপ্রেমী আদর্শবান মানুষ ও নিজের মতো করে গড়তে চান। রাহবার দশম শ্রেণিতে পড়ে। পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি বাইরের বই ও পত্রিকা বেশি পড়ে। এ নিয়ে রাহবারের মা অনেক সময় ছেলেকে রেজাল্ট খারাপ হবার ভয়ে বকাঝকাও করে। এতে রাহবার কিছু মনে করে না।

রাহবার তার দাদা-দাদিকে চোখে দেখেনি। রাহবারের মা-ও শ্বশুরশাশুড়িকে দেখেনি। রাহবারের দাদা স্বাধীনতার নয় বছর পর বুকের অসুখে মারা যান। আজগর আলি সাহেব প্রায়ই গল্প করেন– তিনি সততা এবং অন্যান্য গুণাবলিতে তাঁর আব্বার মতো হয়েছেন। তাঁর আব্বাও একজন দেশপ্রেমী ও সমাজসেবক ছিলেন। মানুষের বিপদে পাশে থাকতেন। নীতিতে অটল ছিলেন। কোনো প্রকার লোভ তাঁর নীতি-নৈতিকতাকে স্পর্শ করতে পারতো না। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ব্যবসার সম্পদ লুট হয়ে যাওয়াতে এবং খানসেনাদের অত্যাচারে ব্যবসা ছেড়ে

বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন। ব্যবসার দেনা শোধ দেওয়ার জন্য তাঁর আব্বা গ্রামের অনেক জমি বিক্রি করে ফেলেছিলেন। ঐ সময় রেজিস্ট্রি ছাড়াই নামমাত্র মূল্যে টাকা নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে যুদ্ধের পর জমির দাম বেড়ে দশ গুণ হলেও উনি সেই আগের মূল্যে জমিগুলো রেজিস্ট্রি করে দিয়েছিলেন। এতে পরিবার আর্থিক সংকটে পড়েছিলো। আর্থিক সততার ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান ছিল অবিসংবাদিত এবং অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। মানুষ তাঁর কথাকে দলিলের মতো মূল্য দিত। জনহিতকর কাজে নিজের পকেট থেকে অকাতরে দান করতেন। ব্যবসাতে অধিকাংশ মহাজনই ছিলেন হিন্দু। কেউ কেউ ঐ সময় ওপারে চলে যান, আবার কেউ কেউ খানসেনাদের হাতে মারা যান। ফলে ব্যবসার পাওনা টাকা আদায় না হওয়াতে এবং গোডাউন লুট হয়ে যাওয়াতে তিনি পথে বসে যান। একসময় টাকার শোকে সব হারিয়ে ক্রমশ বিছানাগত হয়ে যান। তবু তিনি নীতি বির্সজন দেননি। দেনার টাকা কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করে দেওয়ায় এলাকায় তাঁর সুখ্যাতি বেড়ে যায়। তাঁর নৈতিকতার ভিত এত মজবুত ছিল যে, যুদ্ধের আগে ও যুদ্ধের সময় মানুষ টাকা-পয়সা ও স্বর্ণালংকার কাপড়ের পোটলায় বেঁধে তাঁর কাছে আমানত হিসেবে রেখে যেত। প্রয়োজন হলে সেই পোটলাবাঁধা অবস্থায় আবার ফেরত নিয়ে যেত। আজগর আলিকে তাঁর বাবা এই উপদেশ সবসময় দিতেন যে, কোনো আমানতকে কখনো খেয়ানত করবে না। যে অবস্থায় মানুষ তোমার কাছে সম্পদ রেখে যাবে, চাওয়ামাত্র ঠিক সেই অবস্থায় তাকে ফেরত দেবে। আমানতের টাকা নিজের কাজে সাময়িকভাবে হলেও ব্যবহার করা মস্ত বড় অপরাধ।

আজগর আলি সাহেব আরো অনেক কথা তাঁর আব্বাকে নিয়ে বলেন। আব্বা তাকে নিয়মিত উপদেশ দিতেন। বলতেন, তোমার শরীরে যেন কোনো অবৈধ রোজগারের রক্ত তৈরি না হতে পারে। অবৈধ রক্তে তৈরি শরীরের কোনো ইবাদত-বন্দেগি যতই করো না কেন, কবুল হবে না। তোমার মুখের কথার মূল্য থাকতে হবে। কথার বরখেলাপ কোনো মুসলমান করে না।

বাল্যকালে আজগর আলিকে তিনি খুব শাসনে রাখতেন। নিজেদের কোন কোন গাছের কোন আকারের আম, তিনি তা চিনতেন। অন্য অপরিচিত কোনো আম

আজগর আলির হাতে দেখলে, আম কোথায় পেয়েছে তা জিজ্ঞেস করতেন। সত্য কথা বলতে হতো। পথে কোনো গাছের নীচে কুড়িয়ে পেয়েছি বললে আজগর আলিকে সাথে নিয়ে তিনি ঐ গাছের তলায় যেতেন এবং আম যেখানে পড়ে ছিল, সেখানে রেখে আসতে বলতেন। কোনো দিন কারো কোনো জিনিস না-বলে ধরতে নিষেধ করতেন। প্রতি সপ্তাহে এক দিন রাতে খাবারের পর ছেলে-মেয়েকে সাথে নিয়ে বসতেন। কখনো ফেরদৌসি লিখিত শাহনামা, কখনো বুখারি শরিফ, কখনো বানু মোল্লার সায়েরি বা অন্যান্য বইয়ের অংশবিশেষ পড়ে তার ব্যাখ্যা তাদেরকে শোনাতেন এবং সে-মতো চলতে বলতেন। জীবনের প্রতিটা পর্যায়ে সততার নীতি মেনে চলতে বলতেন। ত্যাগের মহিমায় জীবনকে উৎসর্গ করতে বলতেন। উচ্চশিক্ষা শিখতে উৎসাহিত করতেন এবং উপার্জন করে হালাল রুজি না খেলে ঐ রক্ত শরীরে থাকাকালীন কোনো প্রকার ইবাদত গ্রহণযোগ্য হবে না বলতেন। জীবনে সব সময় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে বলতেন। কোনো প্রকার উগ্রপন্থা এড়িয়ে চলতে বলতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর চার কিলোমিটার পথ হেঁটে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে বাড়ি আসতেন। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের মধ্য দিয়ে দুটো পথে বাড়ি আসা যায়। দু-দিন দু-পথ দিয়ে বাড়ি আসতেন। বাড়ি আসার পথে গ্রামগুলোতে কার বাড়িতে সন্ধ্যায় হাঁড়ি চুলায় ওঠেনি, খোঁজ নিতেন। হাঁড়ির খরব নিতেন। প্রয়োজনে বাড়িওয়ালাকে সাথে করে নিজের বাড়িতে আনতেন। চাল-ডালের ব্যবস্থা করতেন। এই ইউনিয়নে তাঁর সুনামে মানুষ পঞ্চমুখ ছিল। আব্বার বলা কথা ও কাজগুলো আজগর আলি জীবনে চলার পাথেয় হিসেবে নিয়েছেন।

একদিন রাহবার ঘরের বারান্দায় আব্বার পাশে বসে আজগর আলির মন খারাপ ও দুশ্চিন্তার কারণ জানতে চাইল। আব্বা ও দাদার রাজনৈতিক অবস্থানও জানতে চাইল। প্রথমত, আজগর আলি ছেলের প্রশ্নে একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। তারপর নিজেকে সংযত করে ছেলেকে অতীত-বর্তমান মিলিয়ে অনেক কথা বললেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছেলের মতামতও চাইলেন। তিনি বললেন:

বাংলাদেশ ভারতবর্ষেরই একটা অংশ ছিল। তাই বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও কৌশলগত অবস্থা জানতে হলে এ তিন দেশের

ইতিহাস জানা জরুরি। বাংলাদেশের ইতিহাস জানতে গেলে সাতচল্লিশ থেকে না শিখে বৈদিক যুগ থেকে ইতিহাস পড়তে হবে। ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের দুইশ' বছর টিকে থাকার স্বরূপ ও কারণ বুঝতে হবে। ইংরেজ শাসনামলে যতগুলো বিদ্রোহ হয়েছিল তার প্রকৃতি ও ঘটনা বুঝতে হবে। বাঙালি মুসলমানদের শেকড়ের সন্ধান করতে হবে। ইংরেজ শাসন আমাদেরকে দুইশ' বছর ধরে অত্যধিক অত্যাচর, নির্যাতন, দমন ও শোষণ করেছিল, যা আমরা মাত্র তেহাত্তর বছরে অবলীলাক্রমে ভুলতে বসেছি। কেবল পশ্চিম পাকিস্তানি শাসন, শোষণ, নির্যাতন, দমনকে রাজনীতির স্বার্থে ধরে রেখেছি। এক যাত্রায় দুই ফল হতে পারে না। দুটোকেই বিশ্লেষণ করা দরকার। বর্তমান প্রজন্মকে অতীত জানতে দেওয়া দরকার। যে জাতি তার অতীতকে ভুলে যায়, সে জাতি নিঃস্ব। এজন্য বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রাবন্ধিকের লেখা পক্ষীয়-বিপক্ষীয় রকমারি প্রবন্ধ পড়তে হবে। অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত তিনটা দেশের নেতাদের জীবনী পড়তে হবে। সামাজিক ও ধর্মীয় ঘটনার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে হবে, মাথায় ধরে রাখতে হবে। ইতিহাস বলতে বিজেতাদের একতরফা, কখনো অবাস্তব গুণকীর্তন এবং বিজিতদের একচেটিয়া অপবাদকে বোঝায়। এ-বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। এজন্য বিভিন্ন লেখকের একই বিষয়ে লেখা ঘটনাবলি পড়তে হয়, বুঝতে হয়, মেলাতে হয়, উপলব্ধিতে আনতে হয় এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাস্তবতার আলোকে ভাবতে হয়। আলোকিত মানুষ হতে গেলে অন্তত নিজের দেশের খুঁটিনাটি ঘটনা ও ইতিহাস জানা ও বিশ্লেষণ বাধ্যতামূলক। জীবনের যে-কোনো জানা ও পড়া বৃথা নয়, কোনো-না-কোনো সময় তা কাজে লাগে। জীবনে একপক্ষীয় একদেশদর্শী বলা বা লেখা কোনো ঘটনা অন্য আরো প্রমাণ ছাড়া নির্দ্বিধায় বিনা-বিশ্লেষণে মান্য করে, কোনো ব্যক্তি বা দলকে অন্ধের মতো পূজা করে কলের পুতুল হয়ে না চলাই ভালো। পক্ষের হোক, বিপক্ষের হোক– সত্য ইতিহাস জানা দরকার। সে-জন্যই তুলনামূলক বিশ্লেষণ দরকার। এ দেশে খণ্ডিত ইতিহাস মনমতো রূপায়িত করে শেখানো হয়, যা একটা জাতিকে বিপথে চালিত করার নামান্তর।

বর্ণপ্রথাভিত্তিক এবং জাত-অজাত বাছবিচারকেন্দ্রিক হিন্দুত্ববাদী ধর্মব্যবস্থায় অবিভক্ত ভারতে গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতাভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপরেখা তৈরি কীভাবে সম্ভব, এই পরস্পর বিপরীতমুখী চিন্তা-চেতনা সচেতনমহলে ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের প্রারম্ভ থেকেই চলে আসছে। তাছাড়া ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন কোনোদিনই মেনে নিতে পারেনি। সে তুলনায় বরং ব্রিটিশ শাসনকে তারা স্বাগত জানিয়েছিল। সে-ধারা এখনো অব্যহত। ভারতের ফতেপুর সিক্রিতে গেলে যে মুসলমান-বিদ্বেষী ডকুমেন্টারি ফিল্মগুলো দেখানো হয়, এসব তার প্রমাণ। এছাড়া এ উপমহাদেশে হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে হিন্দু জমিদারদের দ্বারা সংখ্যালঘু মুসলমানরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য ও নিগ্রহের শিকার হয়। এজন্য অবিভক্ত ভারতে ব্রাহ্মণ্যবাদ সমর্থিত ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় ১৯০৬ সালে ঢাকায় রাজনৈতিক দল হিসেবে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের জন্ম হয়। এই দলের বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান, খাজা নাজিমউদ্দিন, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ এ দেশের অনেক জাতীয় নেতার পূর্বপুরুষরা ছিলেন। তখন নিখিল ভারত মুসলিম লীগ বলতে পুরো ভারতবর্ষের অবহেলিত মুসলমানদের রাজনৈতিক দলকে বোঝানো হতো। প্রথম থেকেই আমার দাদা এই দলের একজন সমর্থক ছিলেন। আমার দাদা পূর্ব পাকিস্তান অঞ্চলে বাড়ি হলেও কলকাতায় একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ছিলেন। দাদার অন্য ভাইগুলোর কেউ কেউ উচ্চপদে সরকারি চাকরি করতেন। সামাজে তাঁদের অবস্থান মজবুত ছিল।

ঐ সময়ে প্রভাবশালী হিন্দুরা ব্রিটিশ শাসনের ছত্রছায়ায় প্রভাব খাটাতো। মুসলমানদের সামাজিক সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, সমতার ভ্রাতৃত্ববোধ প্রভৃতি ভিন্নতার কারণে হিন্দুত্ববাদের রোষানলে পড়ে। হিন্দুরা জাত-পাত মানবিচার একটু বেশি বেশি করতো। দাদার ছেলেদের দু-জন এবং এক ভাই ইংরেজি শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত ও বড় পদে চাকরি এবং দাদার আর্থিক উন্নতিতে তারা ভীষণ প্রতিহিংসায় ভুগতো। দাদাকে বিভিন্নভাবে ইংরেজদের দিয়ে হয়রানি করাতো।

ব্রাহ্মণ্যবাদ ও উগ্র হিন্দুত্ববাদ বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রচিন্তার মধ্যে প্রকাশ্যভাবে রূপ নিলেও তখনো এর হিন্দুত্ববাদী অস্তিত্ব ও জুলুম ভারতবর্ষের হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে প্রকট ছিল। কোনো এলাকার প্রভাবশালী হিন্দু পরিবার একটা মুসলমান পরিবারের শিক্ষা ও আর্থিক উন্নতি কোনোক্রমেই ভালো চোখে দেখতো না। সে-জন্য শিক্ষিত মুসলমান পরিবার রাজনৈতিক সচেতনতার কারণে, রাজনৈতিক আশ্রয় হিসেবে এবং মুসলমানদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ছায়ায় অবস্থান নিতো। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মুসলমানদের ঢালাওভাবে 'পাতি-নেড়ের জাত' বলে গালি দিত এবং তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতো। আমি অনেক ভেবে দেখেছি যে, কোনো একটা সম্প্রদায় এরকম সামাজিকভাবে অবিচার, নিগ্রহ এবং অচ্ছুত সম্প্রদায় হিসেবে বেশিদিন একসাথে বাস করতে পারে না। মনের অজান্তেই বিকল্প আশ্রয়ের পথ খোঁজা প্রকৃতিগতভাবেই যৌক্তিক, যার বহিঃপ্রকাশ হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি। এতে শুধু মুসলমানদের একতরফাভাবে দোষারোপ না করে বলা যায়– 'আপন ঘরের খবর নে না'। এর আগে ১৯৪০ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে পেশকৃত লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে বাংলাদেশের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু তৎকালীন প্রভাবশালী হিন্দু নেতৃত্ব এবং মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর অনীহা ও দুরভিসন্ধির কারণে ১৯৪৭ সালেই বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র (অথবা তখন নতুন কোনো নামে) অস্তিত্বশীল হতে পারেনি। এ ছাড়া পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তানের অস্তিত্বের মধ্যে ভাবী বাংলাদেশের আবির্ভাব নিহিত ছিল– এ কথা অস্বীকার করার জো নেই।

বর্ণের ভিত্তিতে উচ্চবর্ণ, মধ্যবর্ণ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে যে বর্ণবিভেদ প্রকট ছিল, মধ্যম ও নিম্নবর্ণের হিন্দুরা বিকল্প পথ না পেয়ে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সাথে সহাবস্থানে নিগৃহীত অবস্থায় থাকতে বাধ্য হয়েছিল। এতদিনে ধীরে ধীরে ভারতে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়াতে বর্ণবৈষম্যবাদ তরিকায় কিছুটা ভাটা পড়ে গেছে এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি এখন ভারত ভূখণ্ডে গোঁড়া হিন্দুত্ববাদী শক্তি হিসেবে উত্থান ঘটছে, যার জটিল প্রভাব পুরো ভারত উপমহাদেশে পড়ছে। আর

মুসলমানদের চিন্তাধারা, স্বকীয় সংস্কৃতি, জীবনধারা ও সামাজিক আচরণ এবং বৈশিষ্ট্যের কারণে তাদের জন্য পৃথক দুটো বা একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের গুরুত্ব অনস্বীকার্য হয়ে ওঠে। দুটো পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রের ধারণাই সঠিক ছিল। অবাস্তবভাবে সুদূরের দুটো পৃথক ভূখণ্ডকে এক রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল বলেই পৃথককরণ প্রকৃতিগতভাবেই অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। তবে সত্য যে, মুসলমানদের জন্য দুটো পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র না হয়েও পূর্ব পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল বলেই পরে বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হতে নিজেদের স্বার্থে ভারত সহযোগিতা করেছিল ভালো, অন্যথায় দেরীতে হলেও বাংলাদেশ স্বাধীন হতো। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পাওয়া ছিল ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি। আমার এ কথার বেশকিছু জানার জন্য এবং তাৎপর্য বোঝার জন্য তুমি 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী (শেখ মুজিবুর রহমান)' বইটা পড়বে, এতে অনেককিছু বিশ্লেষণ করতে সহজ হবে।

উন্নত সমাজব্যবস্থার এ যুগেও আমি নিজে চার বছর ভারতে পড়াকালীন প্রতিহিংসাপরায়ণ সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্ববাদের মুসলমানদের প্রতি অহেতুক বিদ্বেষ হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। আমার শুধু মুসলমান নাম দেখে দুইশটা কোম্পানির পদস্থ ব্যবস্থাপকরা তথ্য সংগ্রহে তিন মাসের অধিক সময় ঘুরিয়েছিল। শেষে ভিন্ন কৌশলে আমাকে তা সংগ্রহ করতে হয়েছিল। তখন থেকেই হিন্দুত্ববাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের কুটিল গুপ্তমন্ত্র সম্বন্ধে আমার চোখ খুলে গেছে। বাপ-দাদার বলা কথার সত্যতা নিজে খুঁজে পেয়েছি। নেতারা মুখে মধু মেখে যেসব কথা বলে, নিখাদ বাস্তবতা তার ভিন্নরূপ। মধ্যম ও নিম্নবর্ণের অনেক হিন্দুই আমার বন্ধু, যারা এ দেশ থেকে ভারতে গিয়ে বসতি গড়েছে। আমি তাদের ওখানে নিয়মিত যাতায়াত করি। তারাও এ দেশে আমার বাড়িতে আসে। তারা ওখানে স্থানীয় বসতিদের প্রতিহিংসার আগুনে প্রতিনিয়ত পুড়ে মরছে। আমি ওখানে গেলে আমার কাছে ওরা এ অভিযোগ খোলা মনে করে ও বাস্তবতা দেখায়। নিজের চোখ ও কানকে তো কেউ অবিশ্বাস করতে পারে না। তাদের অনেকেই ওখানে গিয়ে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করছে। বর্তমানে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায়ও সাদা-কালো ভেদাভেদ ও হিন্দুত্ববাদের বর্ণপ্রথার ভেদাভেদের অস্তিত্ব খাতা কলমে না-থাকলেও মনের

গভীরে প্রকট বলে আমার বিশ্বাস। সে-সাথে হিন্দুত্ববাদের মুসলিম বিদ্বেষ স্মরণাতীতকাল থেকে আজ পর্যন্ত ভারতে সুস্পষ্টভাবে বিদ্যামান, যার কারণে জাতি ও ধর্মের ভিত্তিতে দুটো অখণ্ড রাষ্ট্র গঠিত হতে বাধ্য হয়েছিল। আমি বুঝি, বাঁধ দিয়ে নদীর পানিকে আটকে রাখা সম্ভব, মানুষের ভাঙা মনকে তো নয়ই। মাথায় আঘাত করে টাকের যত্ন চলে না।

আবার তখন মুসলমান পরিবারগুলোও ইংরেজি লেখাপড়া শিখতে আগ্রহী ছিল না। তাদের প্রতিবন্ধকতা ছিল হিন্দুত্ববাদী বঞ্চনা এবং কাঠমোল্লাতন্ত্র। তারা ইংরেজকে ঘৃণা করতে গিয়ে অদূরদর্শিতার কারণে ইংরেজি ভাষাকে ও বিজ্ঞান-শিক্ষাকে বর্জন করেছিল, যদিও সমগ্র বিশ্বে প্রচুর ইংরেজিভাষী লোক মুসলমান। যারা লেখাপড়ায় যেত, তারা ইংরেজি ও বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়ে কওমি মাদ্রাসায় শুধু আলিফ-বা-তা-ছা শিখে পীরতত্ত্ব ও মোল্লাতন্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পছন্দ করতো। এরা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানদের 'বিধর্মীদের শিক্ষা' এবং 'না-জায়েজ শিক্ষা' বলে ফতোয়া দিত। ফলে, দিনে দিনে মুসলমানরা একটা অনগ্রসর জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। সরকারি চাকরিতে এদের অবস্থান ছিল খুব কম। বর্তমানেও ভারতে মুসলমানেরা অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত, উৎপীড়িত, দলিত ও অনগ্রসর– লেখাপড়া ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে; নেতৃত্বশূন্য জনগোষ্ঠী। মুসলমানদের লেখাপড়ায় অনগ্রসরতাও এর জন্য অনেকটা দায়ী।

সাতচল্লিশের আগেই আমার দাদা মৃত্যুবরণ করেন। তিনি দেশবিভাগ দেখে মরতে পারেননি। তোমার দাদার ছোট দু-ভাই ছাত্রাবস্থায় কংগ্রেসের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। পরবর্তীকালে দু-জনই সরকারি চাকরিতে যোগ দেওয়ার কারণে কোনো দলের সরাসরি সমর্থন প্রকাশ করতে পারতেন না বটে, তবে পারিবারিকভাবে আওয়ামী মুসলিম লীগ ও পরে 'মুসলিম' শব্দটা বাদ গেলে আওয়ামী লীগের জোর সমর্থক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তোমার দাদা তাঁর বাবার নীতি অব্যাহত রেখে প্রথম বয়সে নিখিল ভারত মুসলিগ লীগের সমর্থক এবং দেশ বিভাগের পর মুসলিম লীগের সমর্থন অব্যাহত রাখেন। তিনি সমর্থন করতেন আমরা জানতাম। তিনি ছোট দু-ভাইয়ের সাথে পারিবারিক পরিমণ্ডলে

রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনাও করতেন, আমরা দেখেছি। পরবর্তীকালে এলাকার অনেকেই জানতেন। তবে তিনি কোনো মিটিং, মিছিলে কিংবা বক্তৃতায় অংশ নিতেন না।

স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধের বিরোধিতা করেননি। তাঁর ছোট ভাইয়ের সাথে বসে রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনা করতেন। ছোট ভাই এবং আমি মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক, উনি মুক্তিযুদ্ধের খারাপ পরিণতির কথা পারিবারিকভাবে বলতেন। তাঁর একটাই ভয় ছিল, ভারত সহযোগিতার ছদ্মাবরণে পূর্ব পাকিস্তানকে গ্রাস করবে। ভারত তখন তা করেনি, তারও কারণ ছিল। আমি তখন দশম শ্রেণির ছাত্র। যুদ্ধের আগে বিভিন্ন মিটিং, মিছিলে যেতাম। বড় কিছু বুঝতাম না বটে, নেতাদের পিছ পিছ ঘুরতাম। আত্মসচেতন ছিলাম। ওনার নাম শান্তি কমিটিতে লিখিয়েছিল কিন্তু উনি সেখানে যেতেন না। গ্রামের বাড়িতে থাকতেন। ক্রমশ মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের বাড়িতে এসে থাকা শুরু করলেন। তাঁদের জন্য একটা বড় ঘর ছেড়ে দেওয়া হলো। রাতে এলাকার কমান্ডারদের সাথে উনি আলোচনায় বসতেন। তাঁরা তাঁকে খুব সম্মান করতেন। উনি মফিজ উদ্দিন নামে পূর্ব-পরিচিত রাজাকারের কমান্ডারকে বলে পাঠালেন– আমি বাড়িতে থাকছি, আমার এলাকায় যেন কোনো খানসেনাকে অত্যাচার করতে পাঠানো না হয়। একদল দুষ্কৃতিকারী আমাদের পাশের গ্রামের হিন্দুদের বাড়ি লুটপাট করেছিল। উনি এলাকার লোক ডেকে দুষ্কৃতিকারীদের দিয়ে মালামাল ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাদেরকে দিয়েই প্রতিটা হিন্দুবাড়ি মুক্তিযুদ্ধকালে পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি নৈতিকতার ক্ষেত্রে কখনো কারো সাথে আপস করতেন না। তিনি মনে মনে মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করতেন না, আমার চাচারাসহ আমরা জানতাম। কিন্তু তিনি বলতেন– এ দেশের মানুষ যেভাবে পশ্চিমা সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেগেছে, দেশ একদিন স্বাধীন হবেই। আমি বিরোধিতা করে কী করবো। তবে আমার অতীত অভিজ্ঞতায় বলে, দেশটা একদিন-না-একদিন পার্শ্ববর্তী দেশের শোষণ ও করদরাজ্যে পরিণত হবে। এ উপমহাদেশে মুসলমান রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়বে। ভারত একদিন আমাদেরকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের তুলনায় বেশি শোষণ করবে।

ব্রাহ্মণ্যবাদ ও হিন্দুস্থানের উগ্র হিন্দুত্ববাদ সম্বন্ধে উনি বরাবরই নিরাশ ছিলেন এবং খারাপ ধারণা পোষণ করতেন। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সাথে উনি মিশতেন, ব্যবসা করতেন কিন্তু আমাদের বলতেন– এরা খুব পরশ্রীকাতর। এরা আর্যবংশের উত্তরাধিকার বলে মনে মনে গর্ব বোধ করে। এরা ইরানের উত্তরের কাস্পিয়ান সাগরের তীরে বসবাস করতো। সেখান থেকে ভারতে আসে, পরে আসে বাংলায়। এরা পারসিক, অগ্নিপূজক। আর্যদের লেখা ধর্মগ্রন্থের মূল নাম বেদ। তাই এদের ধর্মকে বলা হয় 'বৈদিক ধর্ম'। এই বৈদিক ধর্ম থেকেই সনাতন ধর্মের জন্ম হয়, যাকে আমরা হিন্দুধর্ম বলি। উভয়ই বহুত্বশক্তির পূজক– বহুত্ববাদী বলে এক ধর্মে বিলীন হতে বেশি সময় লাগেনি। তবে আর্যরা হয়েছে ব্রাহ্মণ– তাদের নাক উঁচু ভাব। পরবর্তীকালে সুলতান এবং মোগলরাও বাইরে থেকে ভারতবর্ষে আসে। তারা একত্ববাদে বিশ্বাসী বলে আর্যরা ও হিন্দুরা তাদেরকে ভারতবর্ষে কোনোদিন মেনে নিতে পারেনি। এখনও যেমন হিন্দুসমাজ মুসলমানদের ভারতে মেনে নেয় না। সমস্যার মূলটা এখানেই। এরা মন থেকে মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ঘৃণা করে; তবে তা প্রকাশ করে না। আমরা কোনো ব্রাহ্মণবাড়িতে গেলে, চলে আসার পরপরই জায়গাটা গোবর দিয়ে লেপে 'পরিষ্কার ও পবিত্র' করে ফেলতো। এতে আমরা ছোটবেলায় খুব কষ্ট পেতাম। ভাবতাম যে, আমরা গোবরের তুলনায়ও অপবিত্র! ওরা মুসলমানদের অচ্ছুত ভাবতো। তোমার দাদা বলতেন, ভারত পাকিস্তানকে ভেঙে দিচ্ছে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সুবিধার কারণে। দেশটাকে ভারত ভবিষ্যতে গ্রাস করবে এবং ছোট রাষ্ট্র হলে প্রতিটি পদক্ষেপে খবরদারি করবে। তখন আবার ব্রিটিশ আমলের মতো আমরা হিন্দুশাসক কর্তৃক নিগৃহীত ও অত্যাচারিত হবো। আমি বুঝতাম, দেশটা ভারতের হাতে চলে যাবে, আবার দাঙ্গা হবে, মুসলমানরা কথা বলার স্বাধীনতা হারাবে– তার মধ্যে এ ভয় সবসময় কাজ করতো। আমি এবং আমার দুই চাচা তাঁর বিরোধিতা করতাম। কখনো সান্ত্বনা দিতাম। তিনি তাঁর কথার পক্ষে যে যুক্তিগুলো দিতেন, তা এখন বেশি বেশি মনে পড়ে। তাঁর যুক্তিগুলোর কয়েকটা এরকম:

এক. আমরা ব্রিটিশ শাসনের নামে হিন্দুত্ববাদীদের শাসন ভারতবর্ষে দেখেছি, সেখানে মুসলমানরা ছিল নিষ্পেষিত, উপেক্ষিত ও নিগৃহীত। ভারত কখনো

মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশের বন্ধু হতে পারে না। ভারতের পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশগুলোরও একই অভিজ্ঞতা, সে অভিজ্ঞতা আমাদেরও অতীতে আছে; ভারত এখন বন্ধুত্বের মুখোশ পরে আছে ; মুখোশ খুললেই আসল চেহারা বেরিয়ে আসবে।

দুই. পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থান ভারতের পেটের মধ্যে। কৌশলগতভাবে ভারত পাকিস্তানকে নিয়ে খুব অসুবিধায় আছে। চীনও ভারতের শত্রু। তাই পূর্ব-পাকিস্তানটা কৌশলগত কারণেই ভারতের দরকার। অন্তত ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলো অর্থাৎ সেভেন সিস্টার্স শাসন করার জন্যও দরকার। সাতচল্লিশের দেশ-বিভাগের সময়ও ভারতীয় নেতারা পূর্ব-পাকিস্তানের অস্তিত্বকে মেনে নিতে পারেননি। কৌশলে দেশটাকে চারদিক থেকে কেটে-ছেটে ছোট বানিয়ে দিয়েছেন। তৎকালীন ইতিহাস ও নেতাদের পূর্ব-পাকিস্তান সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য এর প্রমাণ।

তিন. যুদ্ধ বাঁধলে ভারতকে পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান– দুটো সেক্টরের জন্য প্রচুর টাকার যুদ্ধাস্ত্র কিনতে হয়, সামাল দেয়াও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, সে অভিজ্ঞতা পাকিস্তান ও ভারতের '৬৫ সালের যুদ্ধে আছে। পূর্ব-পাকিস্তান তার আজ্ঞাবাহী হলে ভারতের প্রচুর টাকা সাশ্রয় হয়, খবরদারি ও শোষণ সহজ হয়। ভারত রাষ্ট্রের প্রতিটা প্রদেশকে– বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলোকে দমন-পীড়নের মাধ্যমে টিকিয়ে রাখা সহজ হয়।

চার. ভারতীয় বাণিজ্যের পশ্চাদভূমি ও চাকরির বাজার হিসেবে পূর্ব-পাকিস্তানটা তাদের দরকার। ভারতের সেভেন সিস্টার্সের সাথে যোগাযোগ ও আন্দোলন দমনের জন্যও পূর্ব-পাকিস্তানে অনুগত শাসন তাদের অপরিহার্য। আবার পার্শ্ববর্তী দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে শাসন ও অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করা তাদের মজ্জাগত ব্যাধি। এ দেশ ভারতের তাঁবেদার হলে এ উপমহাদেশে শক্তির ভারসাম্য নষ্ট হবে।

এসব কথার প্রতিবাদ আমরা কোনো দিনও করিনি, শুধু স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলেছি। জানতাম আব্বার বলা যুক্তিগুলো সবই সত্য, এগুলো তার পূর্ব-অভিজ্ঞতা ও সুচিন্তার ফসল।

আব্বা এ. কে. ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, বাংলাদেশে স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর এদেশের মানুষের উপর নির্বিচার গণহত্যা ও অত্যাচারের বিরোধী ছিলেন। ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণের নাগপাশে আবদ্ধ হবার বিকল্প হিসেবে তিনি আলোচনার মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যমূলক কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে একটা আলগা-বাঁধন কনফেডারেশন ব্যবস্থার মধ্যে সমাধান খুঁজতেন। তিনি উভয় পাকিস্তানের জন্য কৌশলগত অবস্থান বিবেচনা করে প্রায় স্বাধীনতার কাছাকাছি পৃথক সরকার, পৃথক সংবিধান, পৃথক মুদ্রাব্যবস্থা ইত্যাদির মধ্যে উভয়ের মঙ্গল খুঁজে পেতেন। তিনি পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের মোটা-মাথার দমন নীতির ঘোর বিরোধী ছিলেন। অতীত ভারতবর্ষে বসবাস করে হিন্দু জমিদার ও উগ্র হিন্দুত্ববাদের একপেশে নীতি, ধর্ম-বর্ণ বৈষম্যবাদের স্বাদ আগেই পেয়ে যাওয়াতে পূর্ব-পাকিস্তান ভারতের করদরাজ্যে বা শাসিত রাজ্যে পরিণত হোক– তা চাননি। তিনি অতি উৎসাহী ভারতীয় প্ররোচনায় পূর্ব-পাকিস্তানের ভাগ্য পরিবর্তনের কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চাননি। যদি নেওয়া হয় তা মুসলমানদের জন্য আত্মঘাতী হবে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল। তিনি বরং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণের নাগালমুক্ত হয়ে অধিক স্বায়ত্তশাসন নিয়ে একটা বৃহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের সাথে থাকার পক্ষপাতীও ছিলেন। তিনি মুজিব-ভুট্ট আলোচনা ভেঙ্গে যাওয়া এবং নির্মম গণহত্যায় মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি বিভিন্ন বিকল্প নিয়েও ভাবতেন। আবার স্বাধীনতা চাইলেও ভারতের সরাসরি সহযোগিতায় তা চাইতেন না। বর্তমানে এ দেশের উপর সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কালো-থাবার বিস্তার ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে, তা দেখে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলমানদের স্বাধীন অস্তিত্ব, পশ্চিম-পাকিস্তানের মতো আরেকটা শোষক রাষ্ট্রের উদ্ভব, সম্প্রসারণবাদের করদ-রাজ্য ভীতি অমূলক ছিল না। চিন্তাটা ছিল 'বাঘের ভয়ে উঠলাম গাছে, ভূত বলে পেলাম কাছে'র মতো সমস্যা। আমার তখন এত গভীরে বোঝার বয়স ছিল না। আমি পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাধীনতার বেশি কিছু ভাবতে পারতাম না। দেশ স্বাধীন হলো। তিনি

নিজেকে গুটিয়ে ক্রমশ ঘরে উঠে পড়লেন। বাইরে কম যাতায়াত করতেন। নিজেকে নিয়ে ঘরে ব্যস্ত থাকতেন। আস্তে আস্তে শয্যাগত হয়ে গেলেন। কয়েক বছর বিছানাগত থাকার পর হার্টের অসুখে মারা গেলেন।

বিগত কয়েক বছর ধরে পার্শ্ববর্তী দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে সম্প্রসারণবাদী কর্মকাণ্ড, নব্য-হিন্দু মৌলবাদের উত্থান, পক্ষপাতদুষ্ট রাজনীতির এক চোখা নীতি, এ দেশে ভারতীয়দের কর্মসংস্থান, অভিন্ন নদীর পানি-বণ্টন বঞ্চনা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে আমাদের দেশকে নিয়ে হাতের পুতুলের মতো খেলা করা, এদেশে মানুষ গুম হলে পার্শ্ববর্তী দেশের জেলে খুঁজে পাওয়া, অভ্যন্তরীণ বিষয়ে প্রতিটি পদক্ষেপে খবরদারির নাগপাশে আবদ্ধ করা, বরকন্দাজি আচরণ, অর্থনৈতিক শোষণ প্রতিনিয়ত আমাকে দংশন করছে, তোমার দাদার মুখচ্ছবি মনের চোখে ভেসে উঠছে, তাঁর বলা কথাগুলো বারবার মনে পড়ছে। তাঁর ভাবনা-চিন্তাগুলো আমাকে ভাবিত ও আলোড়িত করে তুলছে। অস্বস্তিতে ভুগছি, মন খারাপ থাকছে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে গেছি; ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের কথা ভাবছি। দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভেবে আঁতকে উঠছি। আমার কবরের ঠিকানা খুঁজছি।

রাহবার আজগর আলি সাহেবকে জিজ্ঞেস করলো– আব্বু, তুমি কি স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি? এ দেশে কে-না পক্ষের শক্তি! আমি বাংলাদেশের নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী। যারা স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি বলে দাবি করে, তাদের অনেককেই আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি ও তাদের অন্তরের খবর জানি। কোনো দেশের সাথে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ নিয়ে যুদ্ধ বাঁধলে আগেই যারা অন্য দেশের পক্ষ নেবে তাদেরকে দেশপ্রেমী বলা যায় না। তখনই প্রমাণ হয়ে পড়বে কে স্বাধীনতার পক্ষের, আর কে বিপক্ষের। যারা এ দেশকে অন্য দেশের সাথে মিশিয়ে এক করে ফেলতে চায়, প্রকৃতপক্ষে তারাই বিপক্ষের শক্তি। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এর উত্তর বাস্তবে দেখবে। এ ছাড়া প্রমাণ করার আর কোনো সুযোগ নেই। তোমার দাদার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আমি তো যুদ্ধের আগে মিছিলে গেছি, বক্তৃতা শুনেছি, যুদ্ধের সময় বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রুটি সংগ্রহ করেছি। আমি মনে করি, তোমার দাদাও পক্ষের শক্তি। তিনি জীবনের বিনিময়েও এ দেশের

আলাদা অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। অতীত অভিজ্ঞতার কারণে ভারতকে দেখে তাঁর একটা মনের ভয় সব সময় কাজ করতো, এটা আমি আগেই বলেছি। তাঁকে বলা যায় ভারতীয় কর্তৃত্ববাদী শোষণ ও আগ্রাসন-বিরোধী। পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণ থেকে তিনিও মুক্ত হতে চাইতেন। তিনি পাকিস্তানি শোষণ থেকে মুক্ত হয়ে ভারতীয় শোষণের নিগড়ে আবদ্ধ হতে কখনো চাননি। দ্বন্দ্বটা এখানেই। আমাকে বার বার সে-কথা তিনি বলতেন। তিনি পাকিস্তানি শাসকদের জুলুম ও নির্যাতন থেকে এলাকাকে বাঁচাতে সাধ্যমতো করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে রাতে রাতে আলোচনায় বসেছেন, সহযোগিতা করেছেন। নিজের বাড়িতে থাকার জায়গা করে দিয়েছেন। তাদের খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। তার সাধ্যমতো অনেক কিছুই করেছেন। স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ একটা রাজনৈতিক স্লোগান, রাজনৈতিক বিভাজন তৈরির চেষ্টা। কাকের ময়ূরপুচ্ছ ধারণের অপচেষ্টা।

আজগর আলি সাহেব রাহবারকে জিজ্ঞেস করলেন– তুমি কোন পক্ষ?

রাহবার বলল– আব্বু, পক্ষ-বিপক্ষ কথাবার্তা এই পঞ্চাশ বছর পর আর ভালো লাগে না। এ দেশ কখনই আর পাকিস্তানের সাথে যাবে না, এটা চিরসত্য। আমিও এদেশের ভারতসর্বস্ব জীবনব্যবস্থা, ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ, ভারতের প্রত্যক্ষ খবরদারি, ভারতের কাছে দেশীয় স্বার্থ বিকিয়ে দেওয়া, ভারতের দাদাবাবুগিরি আদৌ পছন্দ করিনে। এ একই কারণে ভারতের পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশগুলোও ভারতের উপর বিরক্ত ও ক্ষিপ্ত। এ দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী যে কোনো দেশপ্রেমী ব্যক্তি এগুলোকে মন থেকে মেনে নিতে পারে না, তা সে যে দলেরই হোক। কেউ কেউ নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য দলীয় তালে তাল দেয়, মনের কথাটা বলে না। ভারতের এই দাদাবাবুগিরি স্বভাব ও শোষণনীতির জন্য পার্শ্ববর্তী অন্য কোনো দেশের সাথেই তাদের সম্পর্ক ভালো না। তারা প্রতিটা দেশকে স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসেবে মন থেকে না মানলে সম্পর্ক ভালো থাকে কী করে! আমি নিশ্চিত, তারা সামনের দিনগুলোতে বিপদে পড়বেই। আমরা ছোট কম-শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে তাদেরকে কিছু না বলতে পারি, কিন্তু বাংলাদেশের কৌশলগত অবস্থানের কারণেই ভারত আমাদের সাথে সম্পর্ক ভালো রাখতে বাধ্য

হবে। আমাদের সাধারণ মানুষকে আত্মসচেতন হতে হবে এবং ক্ষমতায় যাওয়ার লোভে রাজনীতিকদের স্বদেশ-স্বার্থ বিকানো ও ভারত তোষণনীতি বন্ধ করতে হবে।

-আমি এ বিষয়টাতে তোমার দাদার সাথে এখনও দ্বিমত পোষণ করি যে, ভারতের সম্প্রসারণবাদী মনোভাব থাকলেও, আদিম যুগের মতো ঢাল-তলোয়ার নিয়ে কখনোই এ দেশ সহজে দখল করতে পারবে না। স্বাধীনতা এবং জনসমর্থন এ দেশের একটা শক্তি। ভারত অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করতে পারে, তাঁবেদার সরকার বসাতে পারে, খবরদারি করতে পারে; তবে এ দেশের সার্বভৌমত্ব এখনো বিদ্যমান। এমন স্বাধীন দেশ ভারতের চারপাশে আরো আছে। আমাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই। ভারতে অসংখ্য জাতি-গোষ্ঠী নিয়ে ফেডারাল শাসনব্যবস্থা। অনেক রাজ্য নিয়েই তারা সমস্যায় আছে। দিল্লি এটা জানে যে, বাংলাদেশের সাথে বেশি বাড়াবাড়ি করলে চীনের সহায়তায় পূর্ব-ভারতের সেভেন সিস্টার্সসহ আরো কিছু রাজ্য হাতছাড়া হয়ে যাবার সম্ভাবনা অমূলক না। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে তোমার দাদার ভারতভীতি এবং বর্তমান পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থার বাংলাদেশ এক নয়। এ-দিক বিবেচনায় স্বাধীনতা যুদ্ধে আমার ও তোমার ছোট দুই দাদার অবস্থান ঠিক ছিল বলে আমি মনে করি। আমি ভারতের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। তাদের দাদাবাবুগিরিতে আমার অনীহা। স্বাধীন বাংলাদেশ হবার কারণে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো যদি দেশকে পার্শ্ববর্তী দেশের তাঁবেদার রাষ্ট্র না-বানাতে চায়– তা পারবে; অর্থনৈতিক শোষণের বেড়াজাল থেকেও নিজের দেশকে মুক্ত করে উইন-উইন অবস্থানে রাখতে চাইলে– তাও পারবে। দরকার সদিচ্ছা ও জনসমর্থনের প্রতি শ্রদ্ধা। জনবলকে সুশিক্ষিত আত্মনির্ভরশীল জনসম্পদে রূপান্তর করা– এ সুযোগটা রয়ে গেছে। এটাই আমাদের সম্ভাবনা। আজগর আলি সাহেব থামলেন।

–আব্বু, তুমি কোনো রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করো না? রাহবার আব্বুর দিকে তাকিয়ে সকৌতূহলে জিজ্ঞেস করলো।

–স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে করতাম। যুদ্ধের পর লুটতরাজ, রাজনৈতিক উদগ্র দলবাজি, স্বজনপ্রীতি, একনায়কতন্ত্র, রাজনীতিকদের নীতিহীনতা, লাগামহীন দুর্নীতি ইত্যাদি দেখার পর রাজনৈতিক সমর্থন করার সাধ মিটে গেছে। দেখলাম,

যে-ই লঙ্কায় যায়, সে-ই রাবণ হয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে আমার তিনজন রুমমেট বাম রাজনীতিতে যোগ দেয়। বামপন্থি মনোভাব আমার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়, আমাকে প্রভাবিত করে। কিন্তু বাম রাজনীতির ধর্মবিদ্বেষী নীতি আমাকে ভাবিয়ে তোলে। আমি বাম দলে যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকি। এর পর থেকে এ দেশের কোনো রাজনৈতিক দল আমাকে আর আকৃষ্ট করতে পারেনি। আমিও মন থেকে কাউকে মানিয়ে নিতে পারিনি। কারো দু-দশটা ছিদ্র, কারো অগণিত ছিদ্র আমার চোখে পড়ে। এদেশে বিদ্যমান কোনো রাজনৈতিক দল দিয়ে প্রকৃত জনসেবা এবং দেশের উন্নয়ন সম্ভব বলে আমার মনে হয় না। বর্তমানে এদেশের রাজনীতি একটা লাভজনক ব্যবসা ও ক্ষমতার দাপট। হয়তো এমন রাজনৈতিক ছোট দল এ-দেশে আছে, যাদের কর্মকাণ্ড ও নীতিমালার সাথে আমি পরিচিত না-হতেও পারি। আমি বর্তমানে আসলে ইস্যুভিত্তিক রাজনীতি করি। কোনো ইস্যুতে এক দলকে, আবার অন্য কোনো ইস্যুতে আরেক দলকে সমর্থন করি। তোমার দাদার বলা অনেক কথাই আমার খুব খুব মনে পড়ে, পীড়া দেয়। আমার জীবদ্দশাতে এ দেশ নিয়ে আমার এ দুশ্চিন্তা এবং আত্মভোলা অবস্থা থেকে আমি কাটিয়ে উঠতে পারবো কি-না– বিশ্বাস হয় না। এদেশ আমার মাতৃভূমি, আমার বাপ-দাদার, আমার চৌদ্দপুরুষের ভিটেবাড়ি এখানে; আমি এ দেশের স্বাধীন-সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী। এ দেশের যে কোনো উন্নয়ন আমাকে আশান্বিত করে। তুমি দেশসচেতন ও রাজনীতিসচেতন থাকবে, রাজনীতি করা থেকে দূরে থাকবে। নিজস্ব একটা পেশা বেছে নিয়ে ক্যারিয়ার গড়ার চেষ্টা করবে। এর মধ্যেই আমি তোমাকে নিয়ে শান্তি খুঁজে পাবো। 'বুঝহ গুণিজন, যে জান সন্ধান!'

(পল্লবী, ঢাকা: ০৭.১০.২০২০ইং)

কুলকণ্টক

একরাম আজিজ মাস্টারের একজন গুণমুগ্ধ ছাত্র। তার বাবা বেঁচে নেই। ছোটবেলায় মারা গেছেন। ছাত্রবেলা থেকেই একরাম আজিজ মাস্টারের পিছলাগা হয়ে গেছে। তার পারিবারিক খোঁজখবর আজিজ মাস্টার রাখেন। পারিবারিক একটা স্নেহ-বন্ধন তৈরি হয়ে গেছে। একরামের বাড়িতে পিছুটান বলতে একমাত্র বৃদ্ধ মা। নিজের বলতে আর কেউ নেই। একরাম মাকে সেবা-যত্ন করে। খুব কর্মঠ ছেলে। দিনে দিনে সে বিকম পাস করলো। আজিজ মাস্টার খুব খুশি হলেন। কয়েক মাস পর আজিজ মাস্টার পুরোনো ছাত্রদের মাধ্যমে একরামকে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিলেন। হিসাবরক্ষক পদ। পদ বড় না, কিন্তু একরাম তার কর্মগুণে মালিকপক্ষকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হলো, প্রমোশন পেলো। সংসারে খরচ কম, বেতন অল্প হলেও একরাম সঞ্চয়ী। টাকা-পয়সা অপচয় করে না, কিছু টাকা-পয়সা জমলো। একরাম সন্ধ্যাকালীন কোর্সে এমকম ভর্তি হবার ইচ্ছে জানালো। আজিজ মাস্টার সম্মতি দিলেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্সে; ন'টার গাড়ি সন্ধ্যা ছ'টায় যায়। চার বছরের মধ্যে একরাম দ্বিতীয় বিভাগের ফলাফল হাতে পেলো।

আজিজ মাস্টার তাকে মায়ের সেবা-যত্ন করার কথা বলে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেন। একরাম সংসার পাতলো। সে আজিজ মাস্টারের সাথে দেখা করতে এলে প্রায়ই বলে– স্যার, চাকরির বয়স পাঁচ বছর হতে চললো, এই বেতনে আমার পোষাচ্ছে না।

অন্য একদিন একরাম বেতনের কথা উঠাতেই আজিজ মাস্টার তাকে জিজ্ঞেস করলেন- তাহলে কী করতে চাও তুমি?
–ব্যবসায় বিষয়ে পড়ালেখা করেছি, করলে ব্যবসা করবো। একরামের সোজা-সাপটা উত্তর। আমি সৎ থেকে ব্যবসা করতে চাই।

বর্তমানে এ-দেশের মানুষের মন-মানসিকতা ভালো না, নীতি-নৈতিকতার অবক্ষয় চলছে, মানুষকে বিশ্বাস করা যাচ্ছে না, বিশ্বাসের মান তলানিতে ঠেকেছে। তুমি যত

সৎ-ই হও, ব্যবসা করা কঠিন। দু-নম্বরি করতে না পারলে বর্তমানে ব্যবসা করে টিকে থাকা যাচ্ছে না। মিথ্যার বেসাতি চলছে। নুড পার্কে সবাই বিবসন হয়ে চলাফেরা করলে অল্প দু-একজনের পক্ষে আব্রু ঢেকে টিকে থাকা যায় না। দু-নম্বরির যুগে এক নম্বর হয়ে চলাটাও মহাপাপতুল্য। লোহার পরিবর্তে ফাঁকিবাজি করে বাঁশ দিয়ে তৈরি স্থাপনা ভেঙে ভালোমানুষের মাথায় পড়ে। পুরো সমাজব্যবস্থাই দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। নীতি নিয়ে টিকে থাকাই একটা ঝকমারি ব্যাপার। শুধু সৎ হলেই হবে না, চালাক-চতুর না হলে ব্যবসা চলবে না, তহবিল খুইয়ে হাত গুটিয়ে ঘরে বসে থাকতে হবে। ব্যবসার সোজা সমীকরণের দিন এদেশে শেষ। আমরা বক্রপথে চলতে শিখে ফেলেছি; অবৈধ রোজগারে ফলন বেশি– বুঝতে শিখেছি। এত তাড়াতাড়ি সোজা পথে ফিরে আসা সম্ভব হবে না। তুমি ভেবে দেখো; তারপর আবার আমাকে বলো। – আজিজ মাস্টারের এটা মুখস্থ মাস্টারি বয়ান।

এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই একরাম দুই কেজি আনার ও এক কেজি আপেল নিয়ে স্যারের বাসায় হাসতে হাসতে হাজির। –স্যার, আমি ফলের ব্যবসা করতে চাই। বেশ কিছু ফলের খুচরা ব্যবসায়ীর সাথে কথা বললাম। তারা পাইকারি মার্কেট থেকে কিনে আনে। পাইকাররা আবার ফল চীন অথবা ভারত থেকে বেশি আমদানি করে। কত সুন্দর আপেল ও আনার দেখুন! কাঁচামালে লাভ বেশি। একথা বলতে বলতে ব্যাগ থেকে আনার ও আপেল বের করে দেখাতে লাগলো। বললো– আপনি রাজি হলে এক সপ্তাহের মধ্যে আমি চিটাগাং যাব ফলের পাইকারি মার্কেট দেখতে। শুনলাম ঢাকার অনেক ব্যবসায়ী চিটাগাং থেকে মাল পাইকারি রেটে ঢাকায় এনে ব্যবসা করে। এরা সাপ্লায়ার।

সত্যি সত্যি এক সপ্তাহের মধ্যে একরামের চিটাগাং ঘুরে ফল ব্যবসায়ের সব রকমের খোঁজখবর নিয়ে আসা সারা। স্যারের বাসায় আবার ফল হাতে হাজির। –স্যার, আমি চিটাগাং গিয়েছিলাম, যারা বিদেশ থেকে ফল আমদানি করে তাদের অনেকের সাথে কথা বলেছি। ওখান থেকে এনে ঢাকায় পাইকারি বিক্রি করতে হবে। প্রথম দিকে বিশ্বস্ততা না আসা পর্যন্ত নগদ লেনদেন হবে, তারপর বাকি লেনদেনও কিছু কিছু হবে। আমি ঢাকায় যাদের মাধ্যমে ফল সাপ্লাই দেবো, তাদের সাথেও কথা

হয়েছে। একটা নির্দিষ্ট কমিশন তাদেরকে প্রতি একশ কেজিতে আড়তদারি হিসেবে দিতে হবে। ফল বিক্রি করে তারা নগদ টাকা দিয়ে দেবে। ঢাকায় আড়তদারদের কাছে নগদ টাকায়ও বিক্রি করা যায়, মাল পৌঁছলেই তারা টাকা দেবে। সেক্ষেত্রে তাদের কমিশন বেশি দিতে হয়। যে কোনো একটা করা যাবে।

–কত টাকা তুমি জমাতে পেরেছো, বলো? তা দিয়ে ব্যবসা করা যাবে কিনা দেখি। আজিজ মাস্টারের সন্দিগ্ধ প্রশ্ন।

–আমি এখন সংসার চালিয়েও দশ লাখ টাকা ব্যবসাতে খাটাতে পারবো। এটাই আমার মজুদ টাকা।

–বেশ ভালো। আমি তোমাকে সাত লাখ টাকার চেক দিচ্ছি। ব্যবসাতে খাটাও। তোমার সাথে কিন্তু আমার কোনো পার্টনারশিপ ব্যবসা না। তোমার লাভ হলে কিছু আমাকে দিও। আমার কোনো দাবি নেই। এই টাকাটা আমার হাতে আছে। বর্তমানে ব্যাংকে টাকা রাখাটা লাভজনক না। লাভ একেবারেই কম– এক ডিজিটে নেমে এসেছে, তার উপর আবার উৎসস্থলে আয়কর কর্তন দশ ভাগ। অথচ মানি ডিভ্যালুয়েশনের রেট প্রাপ্ত লাভের চেয়ে অনেক বেশি। তাই টাকা ব্যাংকে রাখা বা হাতে ধরে রাখা মানে টাকার মূল্য কমানো। এটাও এক ধরনের লোকসান। এটা কোনো কল্যাণ রাষ্ট্রও নয়, রাষ্ট্র কর্তৃক সোশ্যাল সিকিউরিটিও এখানে অনুপস্থিত। তাই ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য কিছু সঞ্চয় করতেই হয়। সেজন্য, সাধারণ মানুষ মহাবিপদে। আমার মতো ক্ষুদ্র শিক্ষক তো আরো বিপদে। তোমার হাতে টাকাটা দিলাম, তুমি এর সদ্ব্যবহার কর। কারো সাথে ব্যবসা করা সম্ভব হচ্ছে না। নিজে শিক্ষকতা করি। যার সাথেই ব্যবসাতে যাই, সেই-ই টাকাগুলো আর ফেরত দেয় না– কিছুদিন পর আসলসহ গায়েব করে দেয়। টাকা একটু হাতে এলেই পরিচিতজনরা চারপাশে ঘুর ঘুর করতে থাকে, টাকাগুলো কব্জা করার জন্য। আমি মিথ্যা কথা বলতে সাধারণত পছন্দ করিনে। সত্য বললেই টাকাটা তার হাতে হাওলাত হিসাবে চলে যায়। তারপর সম্পর্ক খারাপের দিকে গড়ায়। এটা আমার একটা জন্মগত স্বভাব। এ স্বভাব থেকে মুক্তি পেতে অনেক চেষ্টা করছি। আমৃত্যু হয়তো পারবো না। এজন্য নগদ টাকা হাতে রাখব না ভেবেছি। চেষ্টা করি, কিন্তু পারিনে। তাই তোমার কাছে রাখলাম। এ অবস্থায়ই হয়তো মরতে হবে।

ঐ দিনের মতো একরাম বিদায় নিলো। সে চিটাগাং থেকে ফল পাইকারি কেনে, ঢাকায় এনে পাইকারি বিক্রি করে। লাভ যা হয়, সংসার চালিয়েও কিছু বাড়তি থাকে। ফলের মধ্যে আনারস, আঙ্গুর এবং আপেল কেনে। একরাম নাকি একজন ভালো মহাজন চিটাগংয়ে পেয়েছে। তার চিন্তাধারা ভালো। নাম জগদীশ মালাকার। মাঝে-মধ্যে কিছু বাকি থাকলেও মাল দিয়ে দেয়। বেচা-বিক্রি করে একরাম টাকা ব্যাংক ড্রাফট করে জগদীশ বাবুকে পাঠায়। মহাজনের সাথে সম্পর্ক ক্রমশই গাঢ় হলো। আজিজ মাস্টারের এসব কথা শুনে ভালোই লাগলো। মালাকারের উপর শ্রদ্ধা জন্মালো।

চার-পাঁচ বছরের মধ্যে একরাম ঢাকার আশুলিয়ায় দশ কাঠা জমি কিনে ফেললো। সংসার ভালোই চলে। একটা ভালো রুচিশীল বাসায় উঠলো। স্যারের হাতেও লাভ বাবদ এক-আধ লাখ টাকা একরাম দেয়। ক্রমশই একরাম জগদীশ মালাকারের কাছে বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী হয়ে উঠলো। জগদীশ মালাকার মাঝে-মধ্যে পঞ্চাশ লাখ টাকা পর্যন্ত বাকি দিয়ে একরামের কাছে টাকা ফেলে রাখে।

ব্যবসার প্রসার বাড়তে থাকলো। জগদীশ মালাকার একদিন একরামকে প্রস্তাব দিল, চলুন দাদা আপনাকে ভারতের ফলের মোকাম চিনিয়ে নিয়ে আসি। আপনি আমার সাথে যাবেন, সেখানে আমার বাসায় থাকবেন, মাল কিনবেন, আমার সাথে মাল নিয়ে চলে আসবেন। আপনাকে আমি মোকাম চেনাবো। আমার অবর্তমানে আপনি নিজেই ভারতে গিয়ে মাল কিনে নিয়ে আসতে পারবেন, আমার মালও মাঝে-মধ্যে এনে দিতে পারবেন।

একরাম রাজি হলো। জগদীশ দাদার প্রতি কৃতজ্ঞ হলো। জগদীশ বাবু তাকে অনেক বিশ্বাস করে। জগদীশ বাবুর চট্টগ্রামে জন্ম, এখানেই বড় হয়েছে, সংসার হয়েছে। ছোট ব্যবসা থেকে পাইকারি মার্কেটের একজন বড় ফল ব্যবসায়ী হয়েছে। আরো দশটা ব্যবসায়ীর সাথে ভালো সম্পর্ক। সবাই তাকে ভালো বলে। জগদীশ বাবু এর জন্য সবার কাছে কৃতজ্ঞতা জানায়।

একরাম জগদীশ বাবুর সাথে ভারত গেলো ফল আনতে। জায়গাটার নাম নাসিক, মহারাষ্ট্রের একটা ফলের মোকাম। নাসিক পশ্চিম-ভারতের একটা প্রাচীন শহরও

বটে। হিন্দু ধর্মালম্বীদের জন্য পবিত্রতম স্থান। এখানে ভারত-বিখ্যাত পুরোনো মন্দিরও আছে।

ভারতজুড়ে এ জায়গার নাম সবাই জানে। পুরো এলাকায় ফলচাষি, ফলের জমি আর জমি। মাইলের পর মাইল ফল– গাছে ঝুলছে। দেখার মতো দৃশ্য। এলাকার চাষিরা খুব মিশুক প্রকৃতির। সহজ-সরল অমায়িক ব্যবহার। ফল-ব্যবসায়ীদের আপন করে নিতে জানে। সারা ভারতে এখান থেকে ফল সরবরাহ করা হয়। পুরো ভারতে যত আঙ্গুর কেনা-বেচা হয় তার অর্ধেকই উৎপাদিত হয় নাসিক অঞ্চলে। নাসিককে 'ওয়াইন ক্যাপিট্যাল অব ইন্ডিয়া' বলা হয়। নাসিকের রামায়ণকালীন নাম ছিল পঞ্চবতি। নাসিক অঞ্চল মানে ফলের রাজ্য।

একরাম জগদীশ মালাকারের সাথে নাসিক ঘুরে আসার পর দুজনের সম্পর্ক আরো মজবুত হলো। একরাম জগদীশ বাবু এবং নাসিক অঞ্চলের মনোমুগ্ধকর বর্ণনায় পঞ্চমুখ। জগদীশ বাবু সেখানে তার বড়দার বাসায় নিয়ে গেছে। বাসাতে বড়দা থাকে নীচ তলায়, জগদীশ বাবু থাকে দোতলায়। বড়দা বুড়ো হয়ে গেছে। তেমন আর চলতে ফিরতে পারে না। বৌদি গঙ্গা পেয়েছে। একছেলে মুম্বাইতে চাকরি করে। বড়দা ছোটখাটো ফলের ব্যবসা করে দিনাদিপাত করে। স্বাধীনতা-যুদ্ধের সময় বড়দা প্রথমে কলকাতায়, তারপর পবিত্র স্থান দর্শনে নাসিক যায়। নাসিক জায়গাটা তার খুব ভালো লাগলে পাঁচ বছর পর ঐ পুরোনো বাড়িটা কেনে। তখন থেকে বড়দা নাসিকে আছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও আর ফিরে আসেনি। ছোট ভাইকে বড়দা আদর করে নিজের বাসার দোতলাটা দিয়েছে। জগদীশ মালাকার নাসিক গেলে ওখানেই থাকে। বড়দা তাকে অনেকবার বলেছে নাসিকে স্থায়ীভাবে চলে যেতে। চট্টগ্রামে তার যে ব্যবসার প্রসার, এ সব ছেড়ে ভিন দেশে যেতে মন চায় না। যে দেশ তাকে এতকিছু দিয়েছে– তা ছেড়ে আবার ভিনদেশ কেন? সেই ছোটবেলা থেকে সবার সাথে জানাশোনা, সম্প্রীতি যেখানে জন্ম নিয়েছে– সেখানেই মরতে চায়। পরিবার-পরিজন সব চট্টগ্রামে। শহরে নিজে থাকার মতো একটা ঠাঁইও আছে। ঠাকুর তার আশীর্বাদে এ দেশে তাকে অনেক ভালো রেখেছে। দেশান্তরী হয়ে নতুন জায়গায় জীবনের বাকি কয়টা দিন আর যেতে চায় না। ছেলে-মেয়েরা এ দেশের পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে

উঠেছে। ঠাকুরের দয়ায় ঢাকাতে তার ১৫/২০ জন ফলের পাইকারি ব্যবসায়ী। ফল আনার সাথে সাথে বিক্রি হয়ে যায়। ফলের আমদানি ব্যবসায় ভগবান তার দিকে মুখ তুলে চেয়েছে। পরিবার-পরিজন নিয়ে প্রাচুর্যের মধ্যে ভালোই আছে। জীবনে আর কী চায়! ধর্মের কাজেও পিছিয়ে নেই। ফল কিনতে ভারতে গেলে বিভিন্ন তীর্থস্থানে গিয়ে অনেক ধর্মকর্ম করে। ভগবান তাকে অনেক ভালো রেখেছে।

জগদীশ মালাকার জীবনের প্রথম দিকে চট্টগ্রামের পাইকার ফল-মার্কেটের একজন স্থানীয় ব্যবসায়ী ছিলো। পৈতৃক সূত্রে এ ব্যবসা পেয়েছে। চোখ-কান খুললে অন্যদের সাথে ফল আনতে নাসিক যায়। ফল কেনার আগে প্রথমেই পঞ্চবতি মন্দিরে গিয়ে দেবীর পায়ে পূজা দেয়। দৈবজ্ঞানে সে বুঝতে পেরেছিল দেবী তার ব্যবসাতে আর্শীবাদ করেছে। ফিরে এসে ফল কিনে দেশে ফেরে। সে-থেকেই ফলের ব্যবসায়ে ফুলেফেঁপে উঠেছে। সবই দেবীর শুভদৃষ্টির ফল।

একরাম জগদীশ বাবুর কাছ থেকে কখনো ত্রিশ-চল্লিশ লাখ টাকার বাকিও নেয়। ফল বিক্রি করে আবার টাকা পরিশোধ করে। কখনো-কখনো জগদীশ বাবু একরামকে ফোন করে, দাদা, মালের চালান আসছে, কিছু টাকা পারলে পাঠান। একরাম সম্ভবমতো বিশ-ত্রিশ লাখ টাকা অগ্রিম পাঠিয়ে বুকিং দেয়। যথাসময়ে জগদীশ বাবু মাল ডেলিভারি দিয়ে ঢাকায় পাঠায়। একরাম ঢাকায় বসেই মাল বুঝে পায়। ব্যবসা মানেই বিশ্বাস। বিশ্বাস রক্ষা করলে উভয় পক্ষই লাভবান হয়। এভাবেই আদি যুগ থেকে ব্যবসা চলে আসছে। একরাম এর পরও একা একা অনেকবার নাসিকে গেছে। নিজের জন্য ও জগদীশ বাবুর জন্যও ফল এনেছে। দু-জনের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস জন্মেছে। জগদীশ মালাকার এজন্য অনেক সময় তার কাছ থেকে মালের রেট কম রাখে।

একরাম তার এলাকায় নীচু জমি দেখে কিছু জমি কিনলো– ভবিষ্যতে মাছ চাষের আশায়। ব্যবসা ভালোই চলছে। একরাম কিছু কিছু করে টাকা স্যারের হাতে দেয়। স্যার টাকা হাতে পেয়ে খুব সন্তুষ্ট হন। একদিন আজিজ মাস্টার একরামকে বললো– চলো একরাম রাজধানী শহরে একটা ভালো স্কুল দু-জনে তৈরি করি। আমার অবসরের সময় তো এসে যাচ্ছে। অল্প কিছু বিনিয়োগ করলেই হবে। তোমার ফলের

ব্যবসার ফাঁকে ফাঁকে স্কুলের কাজও তুমি দেখতে পারবে। আমিও তোমার সহযোগিতা করবো। কোয়ালিটি শিক্ষা দিতে পারলে অল্প দিনেই আমরা দাঁড়িয়ে যাব। একরাম স্যারের কথায় সম্মতি জানালো। স্কুল দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

একদিন একরাম আজিজ মাস্টারের বাসায় এলো। মনটা খুব ভার, চোখে পানি টলমল করছে। আজিজ মাস্টার জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কী হয়েছে? একরাম বললো– স্যার, সব শেষ। বড় রকমের ধরা খেয়ে গেছি। জগদীশ মালাকার তো চট্টগ্রামে নেই। ঢাকা ও চট্টগ্রামের অনেকেই তাকে খুঁজছে। প্রত্যেকের কাছ থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাট লাখ করে নিয়েছে। মাল নাসিক থেকে ছেড়েছে, তিন-চার দিনের মধ্যে চট্টগ্রাম পৌঁছে যাবে বলে সবার কাছ থেকে বরাবরের মতো টাকা নিয়েছে। আমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছে তেষট্টি লাখ। এবারকার মাল একটু কম রেটে দিতে পারবে বলে আমাকে জানালো। আমার কাছে অত টাকা ছিল না। সে ঢাকায় ফলের দোকান থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে তাকে দিতে বললো। বললো– তার মহাজনের বিপদে হঠাৎ করেই বেশি টাকা দেওয়া দরকার। ফল বিক্রি করতে পারলেই আপনার ক্যাশ টাকা পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যে হাতে চলে আসবে। আমি তো এভাবে নিয়মিত তার সাথে লেনদেন করে আসছি। কোনোদিন তো এমন হয়নি। সে নাসিক গেলে আমাদেরকে সাধারণত জানিয়ে যায়। পনেরো দিন ধরে লাপাত্তা। সে কয়েকদিন ধরে ফোন ধরছে না দেখে আমি চট্টগ্রাম গিয়েছিলাম। ওখানে অনেকের কাছ থেকেই টাকা নিয়েছে। ঢাকার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেও কোটি কোটি টাকা নিয়েছে। তার কাছ থেকে ফল নিতো এমন দু-জন ঢাকার ফল ব্যবসায়ীর সাথে চট্টগ্রাম দেখা হলো। চট্টগ্রামের বাড়িটাও মনে মনে বিক্রি করেছে, আমরা তা জানিনে। এখন পুরো পরিবার নিয়ে হঠাৎ উধাও। তার সাথে যারা ব্যবসা করতো সবারই এখন মাথায় হাত।

সংবাদ শুনে আজিজ মাস্টার হতভম্ব হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন– আচ্ছা, সেদিনও না এ-রকম একটা খবর পত্রিকায় যেন পড়লাম। খবরটা ঠিক মনে আসছে না, কোথায় যেন পড়লাম। মোবাইল ফোনে গুগল সার্চ দিলেন। বললেন– হ্যাঁ, এই তো পেয়েছি। '৩৫০০ কোটি টাকা নিয়ে চম্পট' শিরোনামে জানুয়ারি

১২. ২০২০, 'প্রথম আলো'তে প্রকাশিত হয় এ খবর। সেখানে লেখা হয়, 'পি কে হালদার এখন পলাতক। আর আমানতকারীরা দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন টাকা ফেরত পাওয়ার আশায়। ... পি কে হালদারের বিরুদ্ধে মামলা করছে দুদক। প্রথম আলোর দুই মাসের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, সব শেয়ার অন্যদের নামে হলেও ঘুরেফিরে আসল মালিক পি কে হালদারই, নিজের নামের সাথে মিল রেখে পি কে হালদার গড়ে তুলেছেন একাধিক প্রতিষ্ঠান, যার বেশির ভাগই কাগুজে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, দুই ভাই মিলে ভারতে হাল ট্রিপ টেকনোলজি নামে কোম্পানি খোলেন ২০১৮ সালে, যার একজন পরিচালক প্রীতিশ কুমার হালদার। কলকাতার মহাজাতি সদনে তাঁদের কার্যালয়।'

একরাম মলিন মুখে বললো– স্যার, এখন আমি কী করবো? খুনি মাজেদকে ভারত থেকে ধরে এনে ফাঁসি দেওয়া গেলে, এদেরকে ধরে এনে বিচার করা যাবে না কেন?

–ওসবের জন্য সদিচ্ছা দরকার। ওসব ভিন্ন কথা, ওগুলো এর ভিতর টেনে এনো না।

–আমি তার বাসা চিনি, আমি ভারতে তার বাসায় যাব।

–সেটাও ঠিক হবে না, মাথা ঠান্ডা রাখো। যে দর্জি পাজামা তৈরি করে, প্রাকৃতিক কর্ম সমাধা করার ব্যবস্থাও সে রাখে। টাকা সেখান থেকে আর কোনোদিনই আদায় করতে পারবে না, এটা জেনো। তোমার জন্য ওখানে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ।

–আমি তার টাকা মেরে দিইনে দেখে আমাকে বেশি বেশি বাকি দিয়ে আমার আস্থা অর্জন করে ফেলেছিল। আমি আর এমন কাউকে বিশ্বাস করবো না। এত বিশ্বাসের আড়ালেও এরা প্রতারক।

–তুমি এটাকে স্বাভাবিকভাবে নাও। এতোদিন সে তোমার সাথে ব্যবসা করে তোমার হাতে লাভটা দিয়ে রেখেছিল। ও ঠিকই জানতো, যে কোনো সময় তোমার হাতে দেওয়া ওর লাভটা ওর হয়ে যাবে, তোমার আসলটাও ওর হবে। এরা ব্যবসায়ীদের কলঙ্ক। ব্যবসারও একটা ধর্ম আছে। ইদানীং সে ধর্মটাও মানুষ আর রাখছে না। ধর্ম যদি না থাকে, সেখানে অধর্ম এসে স্থান করে নেয়, সামাজিক অশান্তি বাড়ে। তোমার অভিজ্ঞতার অভাব। এমন ঘটনা আমি সেই ছোটবেলা থেকেই অনেকবার দেখেছি। এক ঘরের চাল, এক শিল-পাটা গোপনে সাত জায়গায় বেচতে দেখেছি। এক জমি গোপনে পাঁচ জায়গায় বেচে কাউকে রেজিস্ট্রি

করে না-দিয়েও ভারতে পালিয়ে যেতে দেখেছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমনটি হয়। পত্রিকা খুললে তুমি এমন ঘটনা অহরহ দেখতে পাবে। ভারতে গিয়ে খুঁজে পেলে হয়তো দেখবে জগদীশ মালাকার তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছে। পাপ-তাপ স্খলন করতে হবে না! যত পাপ, ততো অনুশোচনা, তীর্থক্ষেত্রে ততো ভিড়। তবে কোনো কোনো পরিবারকে আমি সৎ জীবনযাপন করে ওপারে চলে যেতে দেখেছি। এদেশে তারা এখনো বেড়াতে আসে। আমিও ভারতে গেলে ওদের কারো কারো বাড়িতে বেড়াতে যাই। মালাকাররা একবারই যায়। এ-সমাজের সবাই এক-রকম নয়। তোমাকে ব্যবসাতে আরো সাবধান হতে হতো। ব্যবসা দ্বি-পাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক লেনদেন। শুধু একপক্ষ সততা দেখালেই চলে না, যেমন একজন ড্রাইভার ভালোভাবে ট্রাফিক আইন মেনে চললেই গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়বে না, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। তুমি ভারতে যাও, তার বাসাতেই যাও। কিন্তু একা না। পাঁচ-সাত জন একসাথে যাও। দেখো, সে কি বলে! আমি জানি, তাকে পাবে না। পেলেও, ওখানকার লোকজনও তার পক্ষ নেবে।

একরাম আরো তিনজন গুছিয়ে নিয়ে চারজনে মিলে নাসিক গেল। একরাম এর আগেও পাঁচ-সাত বার নাসিক গিয়ে একাকী ফল এনেছে।

তিন দিন পরই আজিজ মাস্টার একরামের ফোন পেলো। একরাম বললো– স্যার, আমরা ভালো আছি। জগদীশ মালাকার ভারতে এসেই নাসিক এসেছিল। সে বাসাটা ছেড়ে দিয়ে গেছে। ওটা ছিল ওর ভাড়ার বাসা, সেটা সে কোনোদিন প্রকাশ করেনি। নীচতলার ঐ ভদ্রলোক, যাকে সে বড়দা বলে পরিচয় করিয়েছিল, সেও বাসা ছেড়ে চলে গেছে। সেও নাকি তার আপন বড়দা না।
–ভারত বৃহৎ একটা রাষ্ট্র। কোথায় তোমরা তাকে খুঁজবে! সে ঐ এলাকায় আর আপাতত যাবে না। বর্তমানে ঐ দেশের কয়েকটা বড় তীর্থক্ষেত্র খুঁজলে কোথাও-না-কোথাও তাকে পাবে। সে এখন তীর্থ ভ্রমণে ব্যস্ত। আর সে যে কোটি কোটি টাকা এখান থেকে নিয়ে গেছে, এখন তার আর নাসিক না গেলেও চলবে। সে অন্য কোনো গোপন এলাকায় কয়েক বছর অন্য কোনো ব্যবসা করে খাবে। তোমরা দেশে চলে এসো।

কয়েক দিন পর একরাম ঢাকা এসে আজিজ মাস্টারের বাসায় এলো। আজিজ মাস্টার তাকে বললেন, জীবনে অভিজ্ঞতারও দরকার আছে। সাবধান হও। তবে যারা মানুষকে বিশ্বাস করে, প্রতিজ্ঞা যতই করুক না কেন, বার বার একই কাজ করে, এটা তাদের প্রকৃতিপ্রদত্ত স্বভাব। এ স্বভাব প্রতিজ্ঞায় বদল হয় না। মানুষকে ঠকানো যাদের স্বভাব, যতই তীর্থযাত্রা করুক না কেন, আজীবন তারা মানুষ ঠকাবে, এটাই তাদের প্রকৃতি। মানুষ তার মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। পরিবেশের কারণে কিছু স্বভাব দমন হয়ে থাকে মাত্র। জীবনটা কুসুমাস্তীর্ণ বিছানা নয়, এ-দেশের মানুষ তো রাজনীতির পঙ্কিলাবর্তে ঘুরপাক খেয়ে অনুকূল বাতাসে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ হারিয়েছে। চলার পথে হতোদ্যম হওয়া যাবে না। আশুলিয়ার জমিটার খরিদ্দার দেখো। আগে ফলের দোকানদারদের দেনা, যে কয়েক লাখ টাকাই হোক- শোধ করো। বাকি যে টাকা হাতে থাকে, তা দিয়ে আবার নতুন উদ্যমে ব্যবসা শুরু করো। ভবিষ্যতে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিও। তুমি আগে প্রতিষ্ঠিত হও-এই দোয়া করি।

(পল্লবী, ঢাকা: ০৯.১০.২০২০ইং)

বন্দিশালা

মনজুর মোর্শেদ ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে পুরো দেড় বছর জুতোর তলা ক্ষয় করে একটা চাকরি পেলেন। প্রথম চাকরি পাওয়ার যে কী আনন্দ! অন্য কাউকে বোঝানো যায় না। আজ থেকে মোর্শেদ সাহেবের কথা ও চলার মধ্যে একটা ভারিক্কি ভারিক্কি ভাব চলে এলো। কখন যে মনের মধ্যে এই ভারিক্কি ভাবটা এসেছে, তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। অজান্তে কিংবা আনমনে এসেছে। এই দেড় বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ছাড়েননি। এদিক-ওদিক করে হলেই থাকেন। এখন ভাবছেন, একটা বাসা ভাড়া নেবেন। ব্যাচেলরদের সহজে কেউ বাসা ভাড়া দিতে চায় না, তা তিনি জানেন। বন্ধুমহল ও পরিচিতজনদের সাথে নিয়ে একটা মেসের চারতলা ও পাঁচতলা ভাড়া নিলেন। প্রত্যেকে পৃথক রুম নিলেন। পরের মাসের এক তারিখে প্রথম চাকরিতে যোগদান করলেন।

মোর্শেদ সাহেবের বাপ-মা আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। আজ যদি তাঁরা বেঁচে থাকতেন, তাঁদের মতো আনন্দিত আর কেউ হতেন না। মোর্শেদ সাহেবের জন্য মন খুলে দোয়া করতেন। এসব কথা মনে এলে মোর্শেদ সাহেবের মনটা খারাপ হয়ে যায়। জীবনের অনেক স্বাচ্ছন্দ্য, হালকা সাময়িক আনন্দ ত্যাগ করে লেখাপড়ার দিকে মনোনিবেশ করলেই কেবল ভালো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যায়। বিদ্যা অর্জনের জন্য পরিশ্রম করলেই ডিগ্রি পাওয়া যায়। যা পাওয়ার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা নেই, আরাম-আয়েশের ত্যাগ নেই, তার প্রাপ্তিও যৎসামান্য, অতি নগণ্য। অর্থের অভাবে শহরের অনেক জায়গায়ই তিনি টিউশনি করেছেন। আজ তাঁর কষ্ট লাঘব হয়েছে।

তিনি একটা বিদেশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহকারী ইঞ্জিনিয়ার। আর যা-ই হোক জনউন্নয়নে মানুষের ইঞ্জিনিয়ারিং সেবা দেওয়া যাবে। মোর্শেদ সাহেব সন্তুষ্ট। তবে বেতন স্কেল খুব একটা আকর্ষণীয় নয়। সরকারি বেতন স্কেলের তুলনায় অল্প কিছু বেশি, যা দিয়ে ছোট একটা সংসার মোটামুটি নির্বাহ করা সম্ভব। দুই বছর পর সংস্থার বিভিন্ন প্রজেক্ট ঘুরে দেখার জন্য একটা গাড়ি পেলেন। এতে তিনি

আশান্বিত হলেন। প্রজেক্টের টাকা অনেক নয়-ছয় করার যথেষ্ট সুযোগ তাঁর আছে; কিন্তু নিজের বিবেকের কাছে হেরে যাওয়ার লোক তিনি নন। তিনি তাঁর কাজের জন্য বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ। নামাজ কিছু কিছু কাজা গেলেও সততায় তিনি অটল। চাকরির তিন বছর পর এক বন্ধুর ঘটকালিতে আত্মীয়-স্বজন নিয়ে বিয়ে করলেন। বউ ঘরে তুলবেন দুই মাস পর। আগে দুই রুমের অন্তত একটা বাসা নিতে হবে। ড্রইং, ডাইনিং রুম থাকবে। বাসা খুঁজতে গিয়ে ভূতের গলিতে একটা বাসা পেয়ে গেলেন। ভূতের গলি নামটা শুনতে একটু কেমন কেমন লাগে, রাস্তার নতুন নামও হয়েছে; তবু মানুষ ভূতের গলি বলে। বাসাটা বেশ ছিমছাম, বাড়ির সামনে ও পিছনে জায়গা ছেড়ে করা। রুমগুলো বড় বড়, ড্রইং ও ডাইনিং স্পেস বেশ বড়। প্রয়োজনে ডাইনিং স্পেসের একপাশে একটা খাট ফেলা যাবে। এতে চলতি মেহমান সামলানো যাবে। বাসার মালিক তাঁর এক পরিচিতজনের বাবা। মোর্শেদ সাহেব তাঁকে আঙ্কেল বলে সম্বোধন করলেন। আঙ্কেল বললেন– তোমাকে নিয়ে কোনো অসুবিধে হবে না, বাবা। তোমার বাসা দেখে পছন্দ হয়েছে কি-না বলো? তুমি এখানে নিজের বাসার মতো থাকবে। অন্যদের তুলনায় তুমি ভাড়া কিছু কম দিও। মোর্শেদ সাহেব আঙ্কেলের মুখের দিকে তাকিয়ে আব্বার স্মৃতি খুঁজে পেলেন।

মোর্শেদ সাহেব এই তিন বছরের বেতনের সঞ্চয় দিয়ে স্বপ্নের ঘর সাজালেন। খাট, আলমারি, সোফা, ডাইনিং টেবিল, টিভি ইত্যাদি বন্ধুকে সাথে নিয়ে কিনলেন। বন্ধু মালামাল সব ঘরে ওঠানোর ব্যবস্থা করে একসময় মোর্শেদকে রসিকতা করে বললেন, এত মালামালের মধ্যে তুই তো হারিয়ে গেলি। মালামাল ও সংসারের স্বপ্ন তো তোকে আবদ্ধ করে ফেললো। আমরা হয়তো তোকে হারালাম। মোর্শেদ সাহেব একটু মৃদু হাসলেন। তাঁর দু-চোখে তখন রিমিকে পাওয়ার স্বপ্ন। বড় নাম একটা আছে, সে নামে কেউ ডাকে না। মোর্শেদ সাহেব বউকে রিমি বলেই ডাকেন।

পরিচিতজন ও বন্ধুদের মেসে ফেলে রেখে মোর্শেদ সাহেব সংসার শুরু করে দিলেন। রিমি সংসারী মহিলা। ভদ্র ও রুচিশীলা। স্বামীর প্রতি অগাধ ভালোবাসা।

সুবিবেচক ও দায়িত্বপরায়ণ। রিমিকে জীবনসাথী হিসেবে পেয়ে মোর্শেদ সাহেব যেন বেহেশত হাতে পেলেন। জীবনের চাওয়া-পাওয়ার অস্তিত্বকে অনুভব করলেন। সৃষ্টিকর্তাকে কৃতজ্ঞতার সাথে ধন্যবাদ দিলেন। কর্মের মধ্য দিয়ে জীবন সামনে চলতে থাকলো।

দেড় বছরের মাথায় রিমি এক ছেলে সন্তানের মা হলো। রিমির সংসারে অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। মেয়ে হয়ে জন্ম নেওয়ার সার্থকতা রিমি নিজের মধ্যে খুঁজে পেলো। মোর্শেদ সাহেব রিমিকে অত্যন্ত ভালোবাসেন– তা রিমি জানে। তবু মোর্শেদ সাহেবের সন্তানের মা হতে পেরে রিমির অধিকার যেন অনেকটাই সংসারে বেড়ে গেল। মোর্শেদ সাহেব অনেক চিন্তা-ভাবনা করে ছেলের নাম রাখলেন 'অনুপ'। নামটা রিমির বেশ পছন্দ। মোর্শেদ সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন নামের অর্থ। মোর্শেদ সাহেব উত্তরে বললেন, 'তুলনাহীন'।

সন্তানের প্রতি বাপের যে কী মমতা, একজন বাপ না হওয়া ছাড়া কোনো উপমা দিয়ে কাউকে বোঝানো যায় না। অনুপের একদিন শরীর খারাপ হলে মোর্শেদ সাহেব অফিস ছুটি নিয়ে বাসায় বসে থাকেন। এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দেন। এক লাগাতার হরতালের মধ্যে কোনো যানবাহন না-পেয়ে হেঁটেই পাঁচ মাইল দূরে গিয়ে ডাক্তারকে ছেলের অসুস্থতার কথা বলে ওষুধ এনেছেন। তিনি বলেন, রিমি তুমি জানো না– অনুপের জন্য যে কোনো ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার করতে আমি প্রস্তুত। ওর জন্য আমি অনেক কিছুই পারি। মনে হয়, নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে বুকের যত স্নেহ-মমতা সবটুকু উজাড় করে দিয়ে ওকে ভালোবাসি, ওর যত্ন নিই, ওকে গড়ে তুলি। ও ছাড়া আমাদের জীবন নিরর্থক। একটা সুসন্তান তার বাবা-মায়ের জন্য বড় রকমের রহমত। সুসন্তান বাপ-মায়ের জীবনে সবচেয়ে বড় সম্পদ। আমরা যখন অসহায় হয়ে যাবো, ও আমাদের দেখাশোনা করবে, যত্ন নেবে। সন্তান কোটি কোটি টাকা ও ভূ-সম্পত্তির থেকেও দামী। শুধু সম্পদ রূপে তাকে গড়ে তোলা দরকার। রিমি প্রায়ই মোর্শেদ সাহেবকে বলে– ছেলে তো দেখতে বাপের মতো হয়েছে। মোর্শেদ সাহেব এ-কথায় অনেক সময়ই কিছু বলেন না। কখনো বলেন, দেখ রিমি, আল্লাহ আমাকে

বাঁচালে আমি অনুপকে অনেক বড় করে তুলবো। ওকে আমি মানুষের মতো মানুষ বানাবো।

মোর্শেদ সাহেব বন্ধুজন থেকে ঘরমুখো হয়ে গেলেন। অফিস ছুটি হলেই ঘরে এসে অনুপের খোঁজ নেওয়া, অনুপকে কোলে নিয়ে আদর করা নিয়ে মহাব্যস্ত। বন্ধুরা কখনো রসিকতা করে বলে, ভাবী ও ছেলেকে পেয়ে মোর্শেদ অতীতের সব ভুলে গেছে, ঘরকুনো হয়ে গেছে।

মোর্শেদ সাহেবের যে বাইরে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না, তা নয়। কেন যেন কী একটা ভাবতে ভাবতে বাসায় এসে হাজির হন। কিসের টানে কেন যেন আসেন, নিজেও অত গভীরভাবে ভাবেন না। অথচ কীভাবে যেন দিন পার হয়ে যায়! বন্ধুরা রসিকতা করেন।

দিনে দিনে বন্ধুরাও ঘরবাঁধা শুরু করে দিলো। জীবনের দাবির কাছে স্বেচ্ছায় একসময় ধরা দিতেই হয়। তখন মোর্শেদ সাহেবের মতো অবস্থা অনেকেরই হয়। এরই নাম সংসারজীবন। জীবনের তাগিদে ঘর বাঁধে। মানুষ সুতোকাটা ঘুড়ির মতো খুব বেশিদিন উন্মুক্ত আকাশে একাকী নিরবচ্ছিন্নভাবে উড়তে পারে না, স্থিতি খুঁজতেই হয়। বর্তমানে মোর্শেদ সাহেবের পৃথিবী বলতে রিমি ও অনুপ। আর রুটিনমাফিক অফিসে যাওয়া। শহরের বাইরে দু-এক দিনের জন্য প্রজেক্টের কাজে গেলেও মন বসে না; ঘরে ফেরার তাড়া চলে আসে। অনুপ ও রিমির মুখ না দেখা পর্যন্ত মন তৃপ্ত হয় না। অনুপ ও রিমি এখন মোর্শেদ সাহেবের প্রতিদিনের সুখ, খুনসুড়ির জায়গা– অব্যক্ত পিছুটান। এদেরকে ছেড়ে কোথাও কয়েক রাত কাটানো তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

অনুপ বড় হতে থাকলো। মোর্শেদ সাহেব অনুপের খেলার সাথী, বয়সী বন্ধু। দেখতে দেখতে সংসারজীবন পাঁচ বছরে পা দিল। আবার সংসারে নতুনের আগমন। রিমি ও মোর্শেদ নাম দুটো মোর্শেদ সাহেবের শ্বশুরবাড়ির খাতা থেকে মুছতে চলেছে। প্রায় নিকটতম সবার কাছে অনুপের মা, অনুপের বাপ নামেই পরিচিত। বাপের বাড়ি ও শ্বশুর বাড়ি ছাড়াও পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছেও রিমি

নামটা ক্রমশই পুরোনো হয়ে যাচ্ছে। অনুপের মা বলাটাই সহজ, এ নামে অনেকেই তাকে চেনে। নতুন অতিথি যখন এ-বাড়িতে স্থায়ী জায়গা করে নিতে এলো, অনুপের নানি নাতনি পেয়ে খুশিতে আটখান। বলে উঠলেন, অনুপের বাপের এবার জামাই হয়েছে। মোর্শেদ সাহেবের মনেও অতি ফুটফুটে সদ্যোজাত শিশুর মুখচ্ছবি থেকে ঘরে জামাই আসা পর্যন্ত পুরো বছরগুলোর অগ্রিম ঘটনা-পরম্পরা হৃদয় কন্দরে ক্ষণিক প্রতিফলিত হয়ে গেলো। তিনি নিজ বাড়িতে জামাই আসার মনোভাব উপলব্ধি করলেন। তিনি বয়স্ক লোকের ভাবধারা মনের গভীরে যেন অনুভব করলেন। জীবনাকাশে বেলা এখনও মধ্যাহ্নে এসে পৌঁছেনি। কিন্তু মনে মনে মনের অতলে বেলা বেশ বেড়ে চলেছে। এ এক অভূতপূর্ব অনুভব।

জীবনসূর্যের উদয় হওয়ার পর দেখতে দেখতে কখন সে সূর্য মধ্যাহ্নে এসে হাজির হয়, আবার দিনে দিনে কখন যে সূর্য পাটে বসে, অনুভূত হয় না। সময় অতিক্রমণের নোটিশ আসে অতি সন্তর্পণে, বার বার। সে নোটিশ ঘণ্টার ধ্বনি বাজিয়ে সাড়ম্বরে আসে-না বলে কর্মপাগল মানুষ গন্তব্যে পৌঁছানোর তাগাদা বোধ করে না। জীবনের এ সংক্ষিপ্ততা প্রথম জীবনে ভাবার অবকাশ থাকে না, শেষ বয়সে এসে বেশি অনুভূত হয়। কেউবা সঞ্জীবনী সালসা খেয়ে, আবার কেউবা চুলে কালো রং করে অপস্রিয়মাণ ছায়াসদৃশ সময়ের সাথে হালকা মশকরা করে– সময় অলক্ষ্যে হেসে দ্রুত বেগে সামনে চলতে থাকে। এখানেই জীবন ও সময়ের ট্রাজেডি, বৈপরীত্য। জীবন-নদী দ্রুতই শুকিয়ে যেতে চায়। মানুষ তা কানায় কানায় পূর্ণ রাখতে চায়। জীবনশৈবালের গন্তব্য যেন মায়াভরা এ পৃথিবীতে নয়– অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে, তা অনেক সময় মনে থাকে না।

মোর্শেদ সাহেবের চাকরির বয়স দশ বছর পেরিয়ে গেছে। রিমি একদিন পত্রিকায় একটা নোটিশ দেখিয়ে বললো, শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ উত্তরাঞ্চলে প্লট বরাদ্দ দেবে বলে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। ওগো, তুমি একটা দরখস্ত করো না! যদি আমরা একটা প্লট পাই! এভাবে ভাড়ার বাসায় ছেলেমেয়েদের নিয়ে আর কতদিন! আমরা একটা মাথাগোঁজার ঠাঁই পেলে তুমি ইঞ্জিনিয়ার মানুষ– সুন্দর করে বাড়ির একটা প্লান করো। আমার না নিজের বাসায় বসবাসের খুব ইচ্ছে! মোর্শেদ সাহেবও একটা প্লট

পাওয়ার আশার আলো দেখলেন। তাছাড়া শহরের উত্তরাঞ্চলের প্রতি তার একটা নাড়ির টান দীর্ঘ দিন থেকে রয়ে গেছে, ঐ পথেই তার গ্রামের বাড়িতে যেতে-আসতে হয়। তিনি কয়েকদিনের মধ্যে ফরম তুলে নিজের টাকা এবং বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে কিছু টাকা হাওলাত নিয়ে শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বরাবর পাঁচ কাঠা প্লটের জন্য একটা আবেদন করলেন। এই আবেদনের সাথে-সাথেই তাঁর আবেগ ও স্বপ্ন জড়িয়ে গেল। মনে হলো তিনি যেন একটা প্লট অতি তাড়াতাড়ি পেতে চলেছেন। এখন বাড়ি তৈরির নকশা তৈরি করতে হবে। তিনি শহরের রাস্তা দিয়ে চলেন, আর বাড়ির ডিজাইন লক্ষ করেন। রাতে শুয়ে কিংবা অবসর সময়ে ঘরের সাইজ, বারান্দা, আসবাবপত্র রাখার স্থানের ছবি মনের ক্যানভ্যাসে আঁকেন। কখনো রিমিকে সাথে নিয়ে অবসর সময়ে দু-জনে খাটে হেলান দিয়ে ভবিষ্যৎ বাড়ির স্বপ্ন আঁকেন।

মোর্শেদ সাহেবের জীবন পঞ্চাশের কোঠায় পা রাখার আগেই অনাহুতভাবে রিমি আবার এক পুত্রসন্তানের মা হলো। সন্তানের আগমন রিমি-মোর্শেদের সুখের সংসারে বাড়তি পাওনা হিসেবে যোগ হলো। ছেলেমেয়েও ছোট ভাইকে পেয়ে আহ্লাদিত হলো। ছোট ভাইকে আদর করে সময় কাটাতে লাগলো। অনেক বছর পর সংসারে আনন্দকন্দ, আশাতীত চোখ-জুড়ানো অতিথি।

জীবন তো কখনো ক্যাসেটের ফিতের মতো আবার পিছনে গুটিয়ে নেওয়া যায় না। যতদিন চলে সামনের দিকেই চলে, নইলে থেমে যায়। রিমির শরীরটা কিছুদিন থেকেই ভালো যাচ্ছে না। সংসারের দিকে তাকিয়ে সময় করে ডাক্তারের কাছে যাওয়াও হচ্ছে না। তিনজন ছেলেমেয়ের ভরণপোষণে মোর্শেদ দম্পতির মধ্যম ও নির্দিষ্ট রোজগারে হিমশিম খেতে হচ্ছে। ছেলেমেয়ের স্কুলের বেতন, কোচিং ফি দিতেই গা ঘেমে যায়। মোর্শেদ দম্পতির শখ-আহ্লাদ অনেকটাই স্তিমিত হয়ে গেছে। ছেলেমেয়েদের শখ পূরণ করা, তাদের মুখের হাসি দেখলেই জীবনটা আনন্দে ভরে যায়। স্বামী-স্ত্রীর বিষয়ে কোনো খরচ-খরচার প্রসঙ্গ এলেই মনে অলসতা ভর করে। ছোট ছেলেটার বয়স ইতোমধ্যেই চার পেরিয়ে গেছে। তাকেও স্কুলে পাঠানো দরকার। রিমির শরীরটা ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছে। কখনো

কখনো বিছানা ছেড়ে উঠতেই ভালো লাগে না। নিজের অজান্তেই রাতে ঘুষঘুষে জ্বর হচ্ছে বলে মনে হয়। রিমি মোর্শেদ সাহেবকে না বলে প্যারাসিটামল খেয়েই জ্বর তাড়ানোর চেষ্টা করে। মোর্শেদ সাহেবকে সব অসুস্থতা না বলে গোপন করে, পাছে মোর্শেদ সাহেব দুশ্চিন্তা করেন।

মোর্শেদ সাহেব অফিসের উচ্চপদে উঠে পড়েছেন। অনেক দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। বাসার খোঁজ নিয়মিত রাখতে পারেন না। রিমিকে ছেলেমেয়েদের স্কুলে আনা-নেওয়া করতে হয়। রিমিও অসুস্থ শরীর নিয়ে সংসার সামলাতে হাঁপিয়ে উঠেছে। মোর্শেদ সাহেব রিমিকে নিয়ে একদিন ডাক্তারের কাছে গেলেন। ডাক্তার অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন। অসুস্থতার অতীত জানলেন। রক্তের অনেকগুলো টেস্ট করিয়ে চার দিন পর আবার আসতে বললেন।

ডাক্তার রিপোর্ট দেখে একটু ভাবলেন। তারপর অনকোলজিস্টের কাছে পাঠালেন। মোর্শেদ সাহেব একটা খারাপ কিছু আঁচ করতে পেরে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন। ডাক্তার বললেন, আরো কিছু পরীক্ষা না করিয়ে এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না, তবে খারাপ কিছু হয়তো হতেও পারে, এর জন্য মানসিক প্রস্তুতি থাকা ভালো।

মোর্শেদ সাহেব অনকোলজিস্টের কাছে গেলেন। আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়েছেন। টিউমার অপারেশন করা হয়েছে। অনেক টাকা ব্যয় করে ক্যামো-থেরাপি দেয়া হয়েছে। এভাবে দু-বছর কেটেছে। কোনো কোনো বন্ধু আত্মীয়-স্বজন রিমিকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছে। কিন্তু পকেটের কথা ভেবে মোর্শেদ সাহেব তা পারেননি। বিগত দু-বছর রিমির চিকিৎসা খরচের টাকা জোগাতে গিয়ে মোর্শেদ সাহেবের কোমর ভেঙে গেছে। রিমির মুখের দিকে তাকাতে গেলে মোর্শেদ সাহেবের শুধু হাউমাউ করে কান্না আসে। তিনি এখন তাঁর ভবিষ্যৎ দিনগুলোর কথা কিছুটা আঁচ করতে পারেন, কিন্তু অনন্যোপায় হয়ে নির্বাক বসে থাকেন। প্রকৃতির আক্রোশের কাছে মানুষ বড্ড অসহায়।

পশ্চিম আকাশে বৈশাখির যে গাঢ়-কালো মেঘ দানা বেঁধেছিল, একদিন ঝড়ো তুফানে মোর্শেদ সাহেবের আধার ঘরের বাতি নিভে গেল। তার সাজানো সংসার

ঝড়ের দাপটে তছনছ ও ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। চারদিকে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ অমানিশা। তিনি এখন যেদিকেই তাকান, সেদিকেই অন্ধকার। এ অন্ধকারে তিনটা ছেলে-মেয়েকে বুকে আগলে ধরে তিনি সামনে এগোচ্ছেন। তিন সন্তানের তিনি বাপ, তিনিই মা।

রিমির প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়ে গেল। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন মোর্শেদ সাহেবকে নতুন করে সংসার পাতার পরামর্শ দিলো। মোর্শেদ সাহেব নারাজ। তাঁর একটাই উত্তর, আমার সন্তানদের আমি সৎ-মায়ের হাতে তুলে দিতে পারবো না। রিমির স্মৃতিকে বুকে নিয়ে আমি জীবন কাটিয়ে দিতে পারবো।

মেয়েটা বড় হয়ে উঠছে। তার একান্ততা দরকার। এজন্য মোর্শেদ সাহেব অনুপকে একটা ঘর দিয়ে মেয়ে ও ছোট-ছেলেটাকে নিজের ঘরে থাকতে দিয়ে নিজে ড্রয়িং রুমে একটা খাট ফেলে নিয়েছেন। ছোট ছেলেটা কখনো বোনের কাছে, কখনো আব্বার কাছে থাকে। ড্রইং রুমের জায়গাটা একটু বড় হওয়ায় তাঁর থাকতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। তিনি ইচ্ছে করলে একটা তিন রুমের বাসা দেখতে পারেন। তাও ভাবছেন না। এদিকে কোনো গুরুত্ব নেই। আবার এতটা বছর এই বাসায় থেকে এখন এই শেষ বয়সে অন্য কোথাও যেতেও ইচ্ছে করে না। তাছাড়া রিমির দীর্ঘ বছরের সংসার জীবন এখানে। এখানে একটা প্রচ্ছন্ন মানসিক দুর্বলতা ও স্মৃতিকাতরতা রয়ে গেছে।

অনুপ মেধাবী, কিন্তু পড়ালেখার প্রতি আগ্রহ কম। তার মা অসুস্থ হবার পর থেকেই পড়াশোনায় অমনোযোগী হয়। মা মারা যাবার পর সে পুরোপুরি অমনোযোগী হয়ে গেছে। মোর্শেদ সাহেব অনেক উপদেশ দিয়েও পড়ার দিকে ফেরাতে পারেননি। আবার মা-হারা ছেলেটার উপর পড়াশোনার জন্য বেশি চাপও দিতে পারেননি। বাসায় শুধু মেয়েটার উপর নির্ভর করে সংসার চালানো অনেক কঠিন। অযাচিত অনেক সমস্যা দেখা দেয়। মেয়েটার উপর পড়াশোনা ছাড়াও বাড়তি চাপ পড়ে যায়। অনুপ আগামী এক বছরের মধ্যে আন্ডারগ্রাজুয়েট পাস করবে শুনে মোর্শেদ সাহেব ছেলেকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। ছেলে এখন বিয়ে করতে রাজি না।

বলে– বিয়ে করা এখনো অনেক দেরি আছে। ছেলেটা বিয়ের কথা পাড়তে দেয় না। মেয়েটা মোর্শেদ সাহেবকে বললো– বাবা, তুমি বর্তমান সমাজকে চেনো না। সময় বদলে গেছে। তরুণ সমাজের চিন্তাভাবনা তুমি বুঝতে অপারগ। এরা অগ্রণী চিন্তার ধারক। ভাইয়ার নিজের পছন্দ আছে। ও সেখানে বিয়ে করতে চায়। তোমার বয়স হয়েছে। তুমি বর্তমান যুগের ছেলেমেয়েদের মনোভাব ও বাস্তবতা বুঝতে পারবে না। এমন কোনো ছেলে বা মেয়ে কদাচিৎ পাবে, যার অন্য কারো-না-কারো সাথে একবার, দু-বার, তিনবার সম্পর্ক তৈরি হয়নি। সম্পর্ক হচ্ছে ভাঙছে, আবার কোথাও হচ্ছে, এমনি অবস্থা। এরা শুধু বর্তমানকে নিয়ে আছে। এখানেও স্বচ্ছতার বড় অভাব। বিশ্বাসের সম্পর্কের বাজারেও দারুণ অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। এদেশের যুবসমাজ এ-বিষয়ে পশ্চিমা ধ্যান-ধারণাকেও পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে চলেছে। এসবের মূলে মোবাইল ফোনের অপব্যবহার এবং ফেসবুকসহ আরো সহজসাধ্য যোগাযোগ মাধ্যম। দেশীয় মূল্যবোধের অবক্ষয়। অপরিপক্ক বয়সে রঙিন মনের হাতছানি। তুমি ভাইয়াকে তার পছন্দমতো মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে কালই বিয়ে করতে রাজি হয়ে যাবে।

মোর্শেদ সাহেব অনুপের মামাকে খবর দিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করতে বললেন। অল্প আয়োজনে বিয়েপর্ব সমাধা হলো। নিজের ঘরটাকে ছেলেকে দিয়ে মেয়ে ও ছোট ছেলেকে অনুপের ঘরে থাকতে বললেন। অনুপ অল্প বেতনে কোনো একটা কোম্পানিতে চাকরি পেলো।

মোর্শেদ সাহেব চাকরি থেকে অবসরে গেছেন। ঘর সংসার দেখা এবং ছোট ছেলেটাকে স্কুলে নেওয়া তাঁর প্রতিদিনের কাজ। সংসারে মন বসে না। চার-পাঁচ মাসের মধ্যেই মোর্শেদ সাহেব বুঝেছেন, বউমা তার নতুন সংসারের উপর বিরক্ত। দুই বছর যেতে না-যেতেই মোর্শেদ সাহেব মেয়েকে বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি দিয়ে তিনি একাকীত্বে ভুগতে লাগলেন। মনটা ছুটলেই ছোট ছেলেকে সাথে নিয়ে মেয়ের বাসায় ঘুরে আসেন। আত্মসচেতন হওয়ায় মেয়ে-জামাইয়ের বাসায় সহজে রাত কাটাতে চান না। তিনি লক্ষ করেন যে, বউমা ছোট ছেলেটাকে আপন করে ভাবতে চায় না। সাধারণ সৌজন্যমূলক

কথা বলে। মোর্শেদ সাহেব এতে খুব কষ্ট পান। তিনি ভাবেন, তাঁর তো শেষ সময় চলে এলো, কিন্তু ছোট ছেলেটাকে কোথায় রেখে তিনি মরবেন। কে তাকে দেখে রাখবে! এমন জায়গা তো কোথাও তাঁর নেই। তিনি নিজেকে এবং ছেলেকে নিয়ে অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন। প্রতিটা কাজে, ভাবনায় মোর্শেদ সাহেবের খুব বেশি বেশি রিমির কথা মনে ভেসে ওঠে।

বর্তমান সমাজে বাড়ির বউরা নিজেদের সাথে অন্য কেউ বা মুরব্বি কেউ বাসায় থাকলে, এটাকে বাড়তি ঝামেলা মনে করে। তাদের একক সংসারের মাঝখানে অন্য কারো অস্তিত্ব প্রতিদিনের চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া, বেড়ানোর স্বাধীনতায় অযাচিত বাধা হিসেবে গণ্য করে। মোর্শেদ সাহেবের বাপ-মা অল্প বয়সে মারা যাওয়াতে তাঁর ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তিনি বাপ-মাকে সেবা-যত্ন করার সুযোগ পাননি, তাঁর মনে এটা নিয়ে অনেক কষ্ট। কিন্তু তাঁর মাথার মধ্যে একটা বিষয় ইদানীং বেশ ঘুরপাক খাচ্ছে যে, তাঁদের ধর্মীয় জীবনব্যবস্থায় বাপ-মাকে শেষ জীবনে এসে 'ওল্ড হোম'-এ বসবাস করতে হবে, এমন কোনো কথা তো তিনি কোথাও পড়েছেন বলে মনে পড়ে না। এত কষ্ট, ত্যাগ ও স্নেহ-মমতা দিয়ে ছেলে-মেয়েকে বড় করে শেষ জীবনে যদি ওল্ড হোমে গিয়ে জীবন কাটাতে হয়, তাহলে ঘর বেঁধে ছেলে-মেয়েদের জন্য কাঁকড়ার মতো জীবন নিঃশেষ করার কী দরকার! ভোগবাদী মন নিয়ে সংসার করাই তো ভালো।

একদিন বিকেলে ডাকপিয়ন এসে শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের একটা খাম হাতে দিয়ে গেলো। মোর্শেদ সাহেব তৎক্ষণাৎ খামটা খুললেন। তার নামে উত্তরাঞ্চল প্রকল্পে পাঁচ কাঠার একটা প্লট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। প্লট পাওয়ার সংবাদটা ভালো লাগলো বটে, কিন্তু রিমির কথা মনে হয়ে তার মনটা ব্যথাতুর হয়ে উঠলো। কে এখন ঘর বাঁধবে এবং কেই-বা সেখানে বাস করবে! তিনি ভাবছেন, এ প্লট দিয়ে তিনি এখন কী করবেন! এ প্লটের আবেদন তাঁর কাছে শেষ হয়ে গেছে। রিমি ঘর বাঁধতে চেয়েছিল। বনের নিঝুম-নিরালায় অনেক আগেই রিমি ঘর বেঁধেছে। এ প্লট তার মনের কষ্ট আরো বাড়িয়ে দিলো। তিনি চিঠিটা আরেকবার পড়লেন। চিঠির কিয়দংশ এরকম:

জনাব/জনাবা,

এতদ্বারা আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, আপনার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আপনার নামে 'উত্তরা আবাসন' প্রকল্পে পাঁচ কাঠার একটি প্লট বরাদ্দ করিয়াছে। প্লটের তফসিল নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিকতা পালনের পর আপনাকে যথাসময়ে জানানো হইবে। আপনাকে দুইটি কিস্তিতে অবশিষ্ট মোট টাকা পরিশোধ করিতে হইবে। প্রথম কিস্তির টাকা আগামী ... তারিখের মধ্যে পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে বরাদ্দ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। ...।

চিঠির ভাষাটা পড়ে তিনি মর্মাহত হলেন। মনটা ক্রমশই বিষিয়ে উঠলো। প্রথম কিস্তির জন্য মাত্র এক মাস সময় দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ের লোক ওখানে প্লট পেয়েছেন। শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধীনে কেউ চাকরি করেন না। ওদের বড়-কর্তার চেয়েও পদস্থ-সম্মানিত লোক এখানে থাকতে পারেন। যা-ই হোক না কেন, চিঠির ভাষাটা আরো মার্জিত এবং ভদ্রোচিত হওয়ার দরকার ছিল। আজ আঠরো বছর টাকাটা আটকে রেখে এখন কিস্তির টাকা আদায় করার আর তর সইছে না। সিদ্ধান্ত নিলেন, শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সাথে কথা বলবেন।

একদিন তিনি চিঠিটা হাতে নিয়ে শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের কাছে গেলেন। সালাম দিয়ে রুমে ঢুকলেন। নিজের পরিচয় দিলেন। ইঞ্জিনিয়ারিং কে কোথায় পড়েছেন এবং কোন সালে পাস করেছেন বলতে গিয়ে দেখা গেল দু-জনে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন। একই হলে থেকেছেন। ডিসিপ্লিন আলাদা। চেয়ারম্যান সাহেব তার চার বছরের জুনিয়র। যত্ন-আপ্যায়ন হলো। কথা প্রসঙ্গে মোর্শেদ সাহেব বললেন, কর্তৃপক্ষের চিঠির ভাষাটা রূঢ় এবং কর্তৃত্ববাদী। এ ভাষা একটা স্বাধীন দেশে চলা উচিত নয়। চেয়ারম্যান সাহেব পড়ে দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং হেড ক্লার্কের উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজেকে রক্ষা করলেন।

মোর্শেদ সাহেব বললেন– আজ আঠারোটা বছর প্লট আবেদনকারীদের প্রতিজনের কাছ থেকে কমপক্ষে তিন লাখ টাকা করে নিয়ে শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিপুলভাবে

লাভবান হয়েছে এবং বরাদ্দ দেওয়ার সাথে সাথে এক মাসের মধ্যে এতগুলো টাকা প্রদান করতে 'ব্যর্থ হইলে বরাদ্দ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে' কথাতে বেশ আপত্তি। আরো বললেন, এটা অমানবিক এবং নীতিবিরুদ্ধ। আবার এই আঠারো বছর আগে নেয়া তিন লাখ টাকা, যাদের নামে প্লট বরাদ্দ করা যায়নি, তাঁদেরকে বর্তমানে তিন লাখ টাকা ফেরত দেওয়া আইনবিরুদ্ধ নয় কী? এছাড়া যাঁরা প্লট পেয়েছেন, তাঁরা তো শুধু জমির লে-অডিট প্লানের ভিত্তিতে পেয়েছেন। জমি এখনও প্রস্তুত হতে, বাউন্ডারি ওয়াল করতে, ইউটিলিটি সার্ভিস পৌঁছতে, রাস্তাঘাট করতে আরো এক যুগ হয়তো পার হয়ে যাবে। অর্থাৎ একটা লোকের কর্মক্ষম জীবন শেষ, এটা একটা এক-জীবনের অপেক্ষা। এটা কীভাবে সম্ভব? আমরা এতটা অমানবিক হই কী করে? শহর উন্নয়নের নামে আমরা গ্রাহকদের সাথে ছিনিমিনি খেলা শুরু করেছি। উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে দিয়ে লাভজনক ব্যবসা ফেঁদেছি। মানুষের সুখদ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ভেঙ্গে দুমড়ে-মুচড়ে চুরমার করে দিচ্ছি। এ অধিকার এ কর্তৃপক্ষকে কে দিয়েছে? মানুষ তো স্বামী-স্ত্রীর কবর করার জন্য শহরের জমি কেনে না। কেনে একটা স্বপ্নের ঘর বাঁধার জন্য। আপনার ভাবীর স্বপ্ন ছিল নিজেদের জন্য একটা সাজানো-গোছানো ঘর বাঁধার। তখন আমরা দু-জনে একটা ভাড়ার বাড়িতে থাকতাম। আমদের দু-জনের একটা শোয়ার ঘর নির্ধারিত ছিল। তার মৃত্যু তাকে ছিনিয়ে নিয়েছে। আমিও বয়সের ভারে ন্যুব্জ প্রায়। ঘর ছেড়েছি। আমার ঘর বলতে আর কিছু নেই। ঘরের দরকারও নেই। কোনো গোপনীয়তা নেই। জায়গা করে নিয়েছি ড্রইংরুমে। এভাবেও কতদিন থাকতে পারবো, জানিনে। জীবনের চাওয়া-পাওয়া সব বয়সে এক-রকম থাকে না। সময়ের ও বয়সের সাথে সাথে জীবনের উদ্দেশ্যও পরিবর্তিত হয়। যখন আমার জমির দরকার ছিল, তখন আমাকে জমি দেওয়া হয়নি। এখন আমার জমি ভোগ করার কোনো ইচ্ছে নেই, আমি পাচ্ছি জমি। জীবনের সাথে কর্তৃপক্ষের এ কেমন মশকরা, আমার বুঝে আসে না। আমি এখন আপনাদের এ প্লট নিয়ে কী করবো? বিল্ডিং করার সময় ও মন আমার নেই। আমার এখন দরকার রাত কাটানোর জন্য মমতাভরা একটু নিরাপদ আশ্রয়, সেবা, নিকটজনের হাতের রান্না

করা একমুঠো ভাতের নিশ্চয়তা। এ প্লট আমার কষ্টকে বাড়িয়ে দিয়েছে। আপনিই বলুন, আমার কি করা উচিত? জমির প্লট বারদ্দের জন্য যে টাকাগুলো জমা দিয়েছিলাম, হাতে থাকলে আপনার ভাবীকে আরেকটু ভালো চিকিৎসা দিতে পারতাম। তাতে আমার তৃপ্তি বেশি হতো।

আমার একটা পরামর্শ ছিল, ভেবে দেখবেন মানা যায় কী না। শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কোন এলাকায় আবাসন গড়ে তুলতে চায়, তার একটা পরিকল্পনা করবে। সেখানে জমি অধিগ্রহণ করবে। রাস্তাঘাট তৈরি করবে, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করবে। তারপর প্লট বরাদ্দের জন্য আবেদন আহ্বান করবে। আবেদন পাওয়ার দুই বছরের মধ্যে প্লট হস্তান্তর করবে। মাছের তেলে মাছ ভাজবো, আবার অতিরিক্ত তেল ভাতে মেখেও খাবো– এ মনোভাব ত্যাগ করাই ভালো। এর নাম জনসেবা নয়। অনেক কথা বলতে পেরে মোর্শেদ সাহেব একটু শান্ত হলেন। ব্যক্তিগত আরো কিছু কথা বলে বিদায় নিলেন।

মোর্শেদ সাহেব বাসায় বড় অসুবিধার মধ্য দিয়ে দিন পার করছেন। বউমা কোনোভাবেই শ্বশুর এবং দেবরকে এক সংসারে মন থেকে মেনে নিতে পারছে না।

রাতে অনুপের সাথে বউমার কথা কাটাকাটি হচ্ছে। মোর্শেদ সাহেবের কানে বউমার কথা পৌঁছলো। 'তোমার আব্বা কি এক-দুই মাসের জন্যও ছেলেটাকে সাথে নিয়ে মেয়ের বাসায় গিয়ে থাকতে পারেন না? এতে কী অসুবিধে?'

মোর্শেদ সাহেব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁর কোনো জবাব নেই। তাঁর চিন্তা, ছেলেকে নিজ হাতে বিয়ে দিতে পারলে হয়তো এমনটি হতো না। ছেলেটাও আর আগের মতো নেই। বউয়ের কথার বাইরে যায় না। রিমি বেঁচে থাকতে কী আশা নিয়ে ছেলেকে গড়ে তোলা হচ্ছিল, আর আজ এ কী তার প্রতিদান! বউমা অনুপের বড় হবার পিছনে বাপ-মার যে নিঃস্বার্থ মায়াভরা ত্যাগ, ভাবতেই পারে না। ছেলেও বড় হয়ে গেলে তা একবারও ভেবে দেখে না। অন্য ঘরের মেয়ে বলে হয়তো সেটা ভাবতে পারে না। জীবনের এ আবার কোন বাস্তবতা! উভয়েই

ছেলে-বউমার পরিবারের বয়স্কদের প্রতি সেবাধর্মী মন নিয়ে এগিয়ে আসবে, তাঁদের জন্য করবে, দোয়া নেবে– এটাই তো স্বাভাবিক। এর জন্যই তো পরিবার। পরিবার মানে তো শুধু স্বামী-স্ত্রীর বসবাসের একটা নির্বাসিত ঘর নয়। 'তোরে লইয়া চান্দের দ্যাশে গর বানামু রে'– নয়। সময় ও বয়সভেদে মানুষের চিন্তাভাবনার কত পরিবর্তন! ঐ ছেলে আব্বার কাছে ছাড়া রাতে ঘুমাতে চাইতো না। সারারাত আব্বার গলা জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকতো। মোর্শেদ সাহেবকে রাতে পাশ ফেরাতেও দিত না– কেঁদে উঠতো। তিনি ছিলেন ছেলের বাল্যখেলার সাথী। ছেলের জন্য তিনি জীবনের অনেক সুখ-শান্তি ত্যাগ করেছেন। এই ছেলের প্রয়োজনে দশ কিলোমিটার হাঁটতে বললেও তিনি তা পারতেন। কিন্তু আজ এ কী মানসিক যন্ত্রণা! তিনি এখন কোথায় যাবেন? ছোট ছেলেটাকে নিয়েই-না যত সমস্যা। ওর উপর চাপ পড়ে এমন কিছু করতে তাঁর মন চায় না। এতে তার লেখাপড়ার ক্ষতি হবে।

মোর্শেদ সাহেবের মনটা প্রায়ই খারাপ থাকে। কী করবেন ভেবে পান না। রিমির অবর্তমানে তাঁর এই যে অসহায়ত্ব, কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারেন না। রিমির মৃত্যুর পর থেকে ছেলেমেয়েদের চোখে চোখে রেখে মায়ের মমতায় বড় করছেন। তাদেরকে ছেড়ে থাকতে একদণ্ডও মন চায় না। মুখের ভালো-লাগা খাবারটা এখনো তাদেরকে দিয়ে খাওয়াতে পারলে পরম তৃপ্তি পান। সব সময় চোখের সামনে থাকলে ভালো লাগে। ছেলেকে আলাদা সংসারে বিদায় দিতেও মনটা একেবারে চায় না; বুকের মধ্যে অনেক কষ্ট অনুভব করেন। ছেলেটা তো তা বোঝে না। ভাবেন, রিমি থাকলে এ কষ্টটাকে কীভাবে সে সামলাতো! এসব ভেবে তিনি অতিমাত্রায় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। ছোটবেলায় নিমাই সন্ন্যাসীর গান শুনেছিলেন। জীবনের বাস্তবভিত্তিক ভাবাবেগতাড়িত গান। বর্তমান সমাজে ভোগবাদী গান ছাড়া এসব শিক্ষামূলক জীবনঘনিষ্ঠ গান প্রায় বিস্মৃত। নিমাইয়ের বিদায় নিয়ে চলে যাবার সময়ে মা-জননী পিছন থেকে দাঁড়িয়ে গানটা টানা দরদভরা সুরে গেয়েছিল:

‘নিমাই দাঁড়া রে–
দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া রে নিমাই, দেখিব তোমারে রে, নিমাই দাঁড়া রে।
কোথা হইতে আসলেন গুরু বসতে দিলাম ঠাঁই
সেই অবধি নিমাইর মুখে রে, নিমাই মা বলা ডাক নাইও রে, নিমাই দাঁড়া রে।
আগে যদি জানতাম নিমাই যাইবি রে ছাড়িয়ে–
না-দিতাম স্তনের দুগ্ধ রে নিমাই, না-তুলিতাম কোলে রে, নিমাই দাঁড়া রে ...।’

এভাবে আরো দু-মাস কেটে গেল। অনেক ভেবে একদিন রাতে খাওয়ার পর মোর্শেদ সাহেব অনুপ ও বউমাকে ডাকলেন। সাধারণ বিভিন্ন কথা বলতে লাগলেন। এক পর্যায়ে বললেন, আমি তো বুঝতে পারছি– তোমাদের এ বাসাতে থাকতে অনেক অসুবিধে হচ্ছে। আর অসুবিধে হওয়ারই কথা। তোমাদেরও তো একটা ব্যক্তিগত জীবন আছে– এটাকে তো আর অস্বীকার করা যায় না। এটা নিজের বাসা হলে অসুবিধে বেশি ছিল। আমি ভাবছি, তোমরা তোমাদের সুবিধামতো একটা বাসা আগামী মাস থেকে দেখে নাও। বউমা, তোমার আব্বা-আম্মা যে এলাকায় থাকেন, তোমরা ঐ এলাকায় বাসা নিলে ভালো করবে। তোমাদের তো একটা গার্ডিয়ান দরকার, সাহায্য দরকার। তাছাড়া বিপদ-আপদ তো আর বলে-কয়ে আসে না। ছোট ছেলেটা বড় না হওয়া পর্যন্ত আমাকেই ওকে দেখতে হবে। ওকে নিয়ে আমারও সময় কাটানো সুবিধে হবে।

না আব্বা, আপনাদেরকে এখানে রেখে এত দূরে বাসা নিলে কি হয়! আপনাদের কে দেখাশোনা করবে? বউমা ইতস্তত হয়ে কথাগুলো বললো।

আমি তো এখনও সুস্থ আছি। আমাদের খুব একটা অসুবিধে হবে না। বাকিটা পরে দেখা যাবে। তোমরা যাও, এখন বিশ্রাম করোগে। মোর্শেদ সাহেবের সোজা-সাপটা কথা। ওরা চলে যাবার পর তিনি চোখের কোণে জমে থাকা পানি হাত দিয়ে মুছলেন।

মোর্শেদ সাহেব ছোট ছেলেটাকে সাথে নিয়ে আপতত এ বাসাতেই টিকে থাকতে চান। ছোট ছেলেটাকে বিয়ে দেওয়ার পর কী হয়, তা পরে দেখা যাবে। তাঁর

ভবিষ্যৎ তখন ছোট-বউমার মন-মানোসিকতার উপর নির্ভর করবে। তাছাড়া যতদিন বাঁচবেন মেয়েটাকে দেখাশোনা করতে হবে। প্রয়োজনে একাকী কোথাও থাকবেন। তাঁর 'ওল্ড হোম'-এ যেতে বড্ড আপত্তি। তিনি নিজের স্বাধীনতা হারাতে চান না। কোনো না কোনো ভাড়ার বাসাতেই হয়তো তাঁর জীবন কেটে যাবে।

(পল্লবী, ঢাকা: ২৬.১০.২০২০)

শমনালয়

এক পরিচিতজন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন– আচ্ছা, বাবুই ভাই, আপনি তো পণ্ডিত মানুষ; এতদিন ইংরেজি গ্রামারে 'এপিডেমিক' শব্দটা ভালোভাবেই মুখস্ত করে পড়ে আসছিলাম। এর অর্থ 'মহামারি' বা মহামারি সংক্রান্ত। এবার পত্রিকা ঘাটতে গেলেই 'প্যানডেমিক' শব্দটা করোনা ভাইরাসের সাথে জুড়ে দিচ্ছে। আমি তো পার্থক্যটা ধরতে পারছিনে।

আমি শিক্ষক, তাই অনেকে পণ্ডিত বলে রসিকতা করেন। পণ্ডিত হলেও ক্ষুদ্র পণ্ডিত। জ্ঞান-গরিমায় অতো পাণ্ডিত্য আমার নেই। ঠিক একই খটকা আমার মনে কয়েকদিন আগেই লেগেছিল। আমি চট করে মোবাইল ফোনের বাটনটায় চাপ দিয়ে জেনে নিয়েছিলাম। 'প্যানডেমিক' বলতে যখন কোনো রোগ দেশে বা মহাদেশে বা বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে তাকে বোঝায়। আমার অবস্থা এবং উত্তরটা তাঁকে বললাম। উনি একটু হাসলেন।

বিভিন্ন দেশের করোনা ভাইরাসের এই মহামারীর অবস্থা শুনলে যে কারোরই পিলে চমকে যায়। বেশি মৃত্যুঝুঁকির তালিকায় বুড়োবুড়ির সংখ্যাই নাকি বেশি। আমিও আওতার মধ্যে পড়ি ভেবে জীবনাতঙ্ক ও হা-হুতাশ আরো বেড়ে গেল। কলমবাজি করতে হয় এবং মালিকপক্ষের কৃপায় কর্ম করে খেতে হয় বলে সপ্তাহে তিন দিন অফিস করা লাগে। বুকের স্পন্দন বেড়ে যায়, মনটা দমিয়ে রাখলেও দুর্ দুর্ করে বুক। 'পাখি কখন জানি উড়ে যায়, ঐ বদ হাওয়া লেগে খাঁচায়।' নিজেই যদি মরে যাই, কার দোষে এ দেশে রোগের প্রকোপ বাড়লো, কী করা যেত, কেন হয়নি ইত্যাদি প্রশ্ন তোলা অবান্তর। তাই সাত-পাঁচ না ভেবে 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' তরিকায় ছবক নেয়াটাই সমীচীন। দিন ভালোই কেটে যাচ্ছিল। যতটা সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার, সব করলাম। সাত মাস পেরিয়ে গেল। তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম– এভাবে সাবধানে থেকে বাকি দিনগুলোও কাটিয়ে দেবো।

একদিন রাতে কিছুটা জ্বর বোধ করতে লাগলাম। সকালে উঠে দেখি, কোমরের বাম পাশে সামান্য ব্যথা। পরের রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। গা গরম আর নেই,

ব্যথাটা ডান পাশে সরে এসেছে। সে-সাথে গলার একপাশে টনসিলের কাছে একটু একটু ব্যথা। পরিচিত ডাক্তারকে ফোন দিলাম। বললো, আঙ্কেল ভয়ের কোনো কারণ নেই, অপেক্ষা করুন। খাবারে স্বাদ ও গন্ধ ঠিকমতো পাচ্ছেন তো? হ্যাঁ, পাচ্ছি। অনেকক্ষণ পরীক্ষা করে দেখলাম। লেবু শুঁকে দেখলাম, কাগজি লেবুর গন্ধ পাচ্ছি। তাহলে কোনো সমস্যা নেই। পরের রাতে আবার জ্বর, সাথে কাশি। ডাক্তার বললো, আঙ্কেল আজই করোনা ভাইরাসের পরীক্ষাটা করিয়ে ফেলেন। সাথে অনেক টেস্ট লিখে পাঠিয়ে দিলো। সারা দেশে করোনা ভাইরাসের বালতি টেস্টের (নমুনা বালতির মধ্যে ফেলে দিয়ে মনগড়া একটা রিপোর্ট তৈরি করে দেয়) শোরগোল চলছে। প্রতিদিন এ-সম্পর্কিত নিত্যনতুন খবর পত্রিকাতেও আসছে। অন্ধকারময় সব ঘরেই সাপ বলে মনে হচ্ছে। সাহস করে পুরোনো এক পদস্থ ছাত্রীকে ফোন দিলাম। সে বললো, স্যার, সব ব্যবস্থা আমি করে রাখছি। আপনি আইসিডিডিআরবিতে চলে আসুন। বিভিন্ন পরীক্ষার স্যাম্পল দিয়ে এলাম। ডাক্তার বললো, আপনার তো বুকে সমস্যা আছে, বাসায় যাবার পথে একটা পাল্‌স অক্সিমিটার কিনে নিয়ে যান। রাতে কোনো অসুবিধা হলে জানাবেন। আর শ্বাসকষ্ট শুরু হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে চলে যাবেন। আমি 'আচ্ছা' বলে ফোনটা রেখে দিলাম। পরদিন সকাল দশটার মধ্যে ছাত্রী আমার ই-মেইলে সব রিপোর্ট স্ক্যান করে পাঠিয়ে দিলো। রিপোর্টগুলো অনেকবার মিলিয়ে দেখলাম। ছেলে-মেয়েরা তো প্রতিটা আইটেমের শানে-নজুলসহ ব্যাখ্যা ইন্টারনেট ঘেটে বের করে ফেললো। করোনা ভাইরাস 'পজিটিভ' দেখে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। 'পড়বি পড় মালীর ঘাড়েই, সে ছিল গাছের আড়েই'। এছাড়া রক্তের অনেক পরীক্ষার মাত্রা অত্যধিক। ছেলে-মেয়েরা ভয় পেয়ে গেল, কারণ বুকের অসুখ আগেই বেশি ছিল, লিভারের সমস্যা, সে-সাথে ডায়াবেটিস। সবাই আতঙ্কিত। রিপোর্টগুলো ডাক্তারের কাছে পাঠালাম। ডাক্তার বললো, আঙ্কেল, রিপোর্ট তো নিশ্চয়ই আপনি দেখেছেন। মাত্রা অনেক বেশি। ভয় না পেয়ে দ্রুত হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি হয়ে পড়ুন। যে কোনো সময় শ্বাসকষ্ট শুরু হতে পারে।

একটা হাসপাতালে বেশ কয়েকজন লোক আমার পরিচিত। তাঁদের শরণাপন্ন হলাম। আমি এখনি আসছি। আমার জন্য করোনা ইউনিটের ওয়ার্ডে একটা সিট বরাদ্দ করার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলাম।

আমাকে প্রথমে হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগে রিপোর্ট করার জন্য বললেন।

আমি যে অবস্থায় ছিলাম, হাসপাতালের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। ছেলে-মেয়ে স্ত্রীর দিকে এক পলক তাকালাম। আসি বলে বিদায় নিলাম। তাদের চোখ অশ্রুসিক্ত। আমি মন দিয়ে অনুভব করতে পারছি, তারা কী ভাবছে। আমি এ মহল্লায় পঁচিশ বছর ধরে বসবাস করছি। অনেকেই আমার ঘনিষ্ঠ সমবয়সী। অনেকেই আক্রান্ত হয়েছেন। আমার বয়সী যারা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন কেউ আর ফেরেননি। মরা মুখটা দেখার সৌভাগ্যও আমাদের হয়নি। তিন-চারজন মিলে সম্পূর্ণ নিরাপত্তাবেষ্টিত হয়ে সরাসরি গোরস্থানে নিঃসঙ্গ বহির্গমন। ফলে আপনজনদের অশ্রুসিক্ত চোখের ভাষা আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু এই বিদায়বেলায় কিছু বলার নেই। এই তো জীবনের পরিণতি! আমিও সেভাবেই তাঁদের মতো করে হাসপাতালে যাচ্ছি। মনে হচ্ছে, পথের দু-পাশের সারি সারি বড় বড় বিল্ডিং, পথ আমাকে বিদায় জানাচ্ছে। আমিও ভাবছি, এ পথে বাবুই মাস্টার হয়তো আর জীবন্ত ফিরে আসবে না। কিন্তু করার এবং বলার তো কিছু নেই। প্রকৃতির কাছে আমরা বড় অসহায়। ভেঙে পড়াও ঠিক না। সুতরাং প্রকৃতির কর্মকে সানন্দে বিনাবাক্যে মেনে নেয়াই সমীচীন। এরই নাম জীবন! সারা পথ মেয়ে দুটোর মুখ, বিদায়বেলার করুণ চাহনি ভুলতে পারছিনে। ছেলেটা গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। সিগনালে গাড়ি দাঁড়াচ্ছে। দু-পাশে ভিক্ষুক এসে হাত পাতছে। টাকাও বের করে দিতে পারছিনে। আমার ছোঁয়া দান হতে পারে তার জন্য অভিশাপ। এ-এক দ্বৈত বিড়ম্বনা।

ইমার্জেন্সিতে গেলাম। ছেলেটা বাইরে অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ইমার্জেন্সির ডাক্তার, স্টাফ সবাই নিরাপদ দূরত্ব রেখে নীরবে চলছেন। রুমের মধ্যে আমার ছায়া নেই, তবু তারা যেন আমার ছায়া মাড়াচ্ছেন না। এ-এক অস্পৃশ্য নৈঃশব্দ্য। একটা বেড দেখিয়ে শুতে বললেন। একজন এসে স্টেথিসকোপ বুকে লাগিয়ে দেখলেন। বুক এক্স-রে করার জন্য অন্য রুমে যেতে বললেন। আগের পরীক্ষার

রিপোর্টগুলো দেখলেন। কেবিনে যাব কি-না জিজ্ঞেস করলেন। কেবিনের মধ্যে নিঃসঙ্গ-একাকী, দম বন্ধ হয়ে আসবে। প্রয়োজনে কথা বলারও কেউ থাকবে না। কেবিন 'না' করলাম। করোনা ইউনিটের ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দিলেন।

ওয়ার্ডে গিয়ে অনেক সাথীকে একসঙ্গে পেলাম, সংখ্যায় নয় জন। প্রায় সবার নাকেই অক্সিজেন দেওয়া, হাতে সুচ ফোটানো, স্যালাইনের ব্যাগ স্ট্যান্ডে ঝুলছে। আমি বেডে গিয়ে শুতেই ডাক্তার এলেন। বুক, লিভার ও ডায়াবেটিসের জন্য কী কী ওষুধ কতদিন ধরে খাই, জিজ্ঞেস করলেন। ব্যবস্থাপত্র দিলেন। শুরু হয়ে গেল হাতে ফেস্টুলা করা, এজন্য বিভিন্ন জায়গায় সুচ ফুটিয়ে চেষ্টা করা। স্যালাইন দিলো। নাভির পাশে ইনজেকশন দিলো, নাকে নিশ্বাস সহজিকরণ অক্সিজেনের মাস্ক। আমি পুরোপুরি রোগী হয়ে গেলাম। আমার অবস্থাও ওয়ার্ডের অন্যান্য রোগীর মতো হলো।

চারদিকে কোনো শব্দ নেই, পুরো একটা বড় ফ্লোর নিয়ে করোনা ইউনিট, আট তলার উপরে। রোগীর কাছে কোনো সহযোগী নেই, ভিজিটরও নেই। থেমে গেছে কোলাহল; শুধু সাথীহারা নিঃসীম নৈঃশব্দ্যের মেলা। ডাক্তার ও নার্সদের নীরব আনাগোনা। যমে মানুষে টানাটানি। মৃত্যুপুরী। জীবনের এ-এক ভিন্ন রূপ। জীবন এখানে অবসন্ন, বিষাদক্লিষ্ট, পরিশ্রান্ত, নেতিয়ে পড়া ফুলঝুরি। অনন্ত বহুরূপী জীবনের ঘাটে ঘাটে কোথাও আবছা আলো, কোথাও আঁধারে ছেয়ে গেছে– এ যেন জীবনের পূরবীরাগে গোধূলিবেলা পেরোনো ঘন-গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে যাবার পূর্বক্ষণ। জীবন এখানে নিশ্চল, অনিশ্চিত, শঙ্কাময়। কাচের জানালা ভেদ করে চারদিক বাইরের অন্ধকারে অনেক দূরে তাকিয়ে দেখলাম, আত্মীয়-স্বজন, আপনজন কোথাও কেউ নেই। সুবিস্তীর্ণ বিশাল মরু প্রান্তরে শয্যাশায়ী আমি একা– অবিরাম কাতরাচ্ছি, কখনো অনড় হয়ে পড়ে আছি। রাতটাই যম। রাতে রোগের প্রকোপ বেশি হয়। শ্বাসকষ্ট বাড়ে। শুনলাম, এ ওয়ার্ডে যে ক-জন মারা গেছেন, অধিকাংশই রাতে। রাতটা পার হওয়া মানে আরেকটা দিন বেঁচে থাকা। সিডেটিভ খেয়ে রাত এগারোটার আগেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

হাসপাতালের পদস্থ কেউ কেউ আমার ওয়ার্ডের মেডিকেল হেল্প-ডেস্কে ফোন করে হয়তো আমার দিকে একটু নজর দেওয়ার কথা বলে রেখেছিলেন, কনসালটেন্ট

ডাক্তার, ডিউটি ডাক্তার ও নার্সদের তোড়জোড় এবং বারবার বাবুই স্যার, বাবুই স্যার বলার ধরন দেখে তা বুঝে ফেললাম। কিন্তু শরীর থেকে রক্ত নেওয়া, ইনজেকশন দেওয়ার কোনো কমতি হলো না। শেষে রক্ত নিতে ভেইন খুঁজে পেতে বেগ পেতে হলো। দু-দিনেই নাভি ও দু-হাতের অধিকাংশ জায়গায় ছিদ্র হতে হতে ঝাঁজরা হয়ে গেল।

তৃতীয় দিন পাশের বেডের ভদ্রলোকের সাথে অনেকক্ষণ কথা বললাম। সুশিক্ষিত ব্যক্তি, ইঞ্জিনিয়ার। দীর্ঘদিন ধরে কনসাল্টেন্সি করেন। সজ্জন বলে মনে হলো। সন্ধ্যার পরপরই রাতের খাবার খেয়ে নিলেন। আজ তিনি ভালো বোধ করছেন। তার অবস্থার উন্নতির মধ্যে আমিও আশার আলো দেখতে পেলাম। তিনি বাসায় স্ত্রী, মেয়ে ও নাতির সাথে অনেক কথা বললেন। বেশ ভালো লাগলো। তিনি ঘুমালেন। আমিও সিডেটিভ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে দেখি ভদ্রলোক সিটে নেই। ফাঁকা। ভাবছিলাম, ওয়াশ রুমে গেছেন। অনেকক্ষণেও ফিরে না আসাতে নার্সকে জিজ্ঞেস করলাম। নার্স বললেন, রাতে উনার অবস্থার অবনতি হলে সাড়ে বরোটার দিকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে নেওয়া হয়েছিল। রাত আড়াইটার সময় উনি মারা যান। কথাটা শুনে জানটা ধড়াস করে উঠলো। মনটা খুব ভেঙে গেল। ভাবতে লাগলাম, 'সেই শোয়া যে তার শেষ শোয়া হবে তাহা কি জানিত কেউ?'

একটু ভালো লাগলেই স্যালাইনটা খুলে কোনো একটা রোগীর পাশে গিয়ে তাঁর সাথে আলাপ করি। যাওয়া দেখলেই নার্স কোথাও থেকে একটা চেয়ার এনে দেন। এক ভদ্রলোকের পাশে বসে গল্প করছি। কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এলো, উনি আমার সহকর্মীর আব্বা। অনেক বছর বিদেশে কাটিয়েছেন। কীভাবে যে তাঁকে এ রোগে ধরেছে, তিনি জানেন না। স্বামী-স্ত্রী দু-জনেই ভুগছেন। আঠারো দিন হতে চললো, এ হাসপাতালেই ভর্তি। তিনি এখন ভালো বোধ করছেন। খবরটা শুনে খুশি হলাম। তাঁর সুখবরটাই নিজের মনে নিয়ে আবার আশায় বুক বাঁধলাম। আমাদের জন্য দোয়া করতে বললাম।

আমার শারীরিক অবস্থাও বেশ খারাপ হতে লাগলো। রক্ত পরীক্ষার রিপোর্টগুলোও খুব খারাপ আসতে লাগলো। ডাক্তাররা চিন্তায় পড়লেন। আমাকে

অনেক কথাই বলেন না। তবু একটু ভালো বোধ করলে ফাইলটা আনিয়ে নিজে দেখি। যেহেতু এ থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই, নির্দিষ্ট কোনো ওষুধ নেই– কবরমুখো পা দিয়ে পড়ে থাকি। সৃষ্টি-বিধাতাকে কায়মনোবাক্যে স্মরণ করি। নিজের পাপস্খালনের কোনো চেষ্টা মনে আসতো না। এটা ভেবে খারাপ লাগতো। বরং পেশাগত জীবনে এবং ব্যক্তিগত জীবনে যারা আমার প্রতি অন্যায়, অবিচার ও মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়েছে, আমাকে কষ্ট দিয়েছে, তাদের প্রতি শেষ ঘৃণা প্রকাশ এবং মনের অজান্তেই কেন যেন অনিচ্ছাকৃত অভিশাপ চলে আসতো। এ নিয়ে নিজের মনের সাথেই সংঘাতে জড়িয়ে পড়তাম। বেহেশত নসিব করার কোনো দোয়া মন থেকে আদৌ আসতো না। এটা হয়তো আমার সৃষ্ট-প্রকৃতির কারণেই হতো। এ দেশের ক্রমবর্ধনশীল চুগলখোর ও মোনাফেকদের মুখচ্ছবি প্রতিনিয়ত মনের পর্দায় ভেসে উঠতো। কিছু করার থাকতো না, মুখচ্ছবিগুলো দেখে মনটা ঘিন ঘিন করতো। মানুষ যখন শুয়ে থাকে, কোনো কাজ থাকে না– তখন সম্ভবত বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় বিষয় মাথায় আসে। অনেক চেষ্টা করেও মন থেকে এসব বের করতে পারিনে।

হাসপাতালে যাবার দু-দিন পর থেকেই ফোন আসা শুরু হলো। জীবন যায়-যায় অবস্থা, তার মধ্যে ফোন– বিরক্তিও লাগে। কিন্তু অপর প্রান্তের শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়-স্বজন, পুরোনো ছাত্রছাত্রী, বন্ধুবান্ধব, সহকর্মীদের উদ্বিগ্নতা, সহমর্মিতা ও আন্তরিকতার কথা ভাবলে বিরক্তিবোধ কোথা দিয়ে যেন পালাতো। দেশ-বিদেশ থেকে শত শত ফোন– সবাই উদ্বিগ্ন বোঝা যায়। ডাক্তার পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ফোন সাইলেন্স করে দূরের এক টেবিলে নিয়ে রেখে দিলেন। আমি ভাবলাম, কলগুলো থাকলেই হয়, একটু সুস্থ হলে সবাইকেই রিং-ব্যাক করে অন্তত ধন্যবাদটুকু জানাতে হবে। এ বিপদের সময় বাবুই মাস্টারকে ফোন মানে কর্তাতুষ্টির সৌজন্যে ফোন না; শুভানুধ্যায়ীদের মমতা, শ্রদ্ধা ও বেদনাবিধুর আন্তরিকতার ফোন। এ ফোন টাকা ও ক্ষমতা দেখিয়ে আদায় করা যায় না। পারস্পরিক স্নেহ-মমতা-শ্রদ্ধার বিনিময়ে অর্জন করতে হয়। মনটা খারাপ লাগতে থাকলো। হয়তো সবাই ভাবছে, এ যাত্রাই বাবুই মাস্টারের অগস্ত্যযাত্রা। তাই এত ফোন!

ওয়ার্ডের বেড হলেও প্রতিটা বেডের জানালার দিক ছাড়া তিন দিকেই স্ক্রিন দিয়ে ঘেরা। সুবিধামতো সরানো যায়।

বেলা প্রায় এগারোটা। পাঁচটা বেড পরেই একটা ঘেরা বেড থেকে গলার স্বর উঁচু করে কথা ভেসে আসছে, 'আমার হাতটা একটু খুলে দে, মা! খুলে দে। আমার স্ত্রী বাসায় আমার জন্য নাস্তা নিয়ে অপেক্ষা করতেছে, আমি যাইলে আমার সাথে হে নাস্তা খবিয়ানে, তোরা আমারে দেরি করাসনে মা। আমার কথাটা শোন। আমি নাস্তা খাইয়া আবার চলিয়া আসবোয়ানে। আমারে ছেড়ে দে।'

আমি ঐদিকে কান খাড়া করলাম। করুণার সুরে কথা ভেসে আসতে লাগলো– আমি বাথরুমে যাব তো। তোরা বুঝতি পারতিছিসনে ক্যান। আমারে ছেড়ে দে। আমার হাতে ব্যথা লাগতিছে। আমি এক দৌড়ি নাস্তাটা খায়ে আইসে আবার এহানে আসবোয়ানে। আমারে তোরা আর ধরে রাকিসনে।

নার্সের কণ্ঠস্বর শুনলাম, আপনি শুয়ে পড়েন তো। বাথরুম হয় হোক। ক্যাথেটারও তো পরানো আছে। আপনি অসুস্থ, আপনাকে ছাড়া যাবে না। আপনি বিশ্রাম করেন।
–আমি তোদের দুটো পায় পড়ি। আমার হাতের বান্ধনটা একটু খুলে দে। আমি খুব কষ্ট পাতিছি।

আমি স্যালাইনটা খুলে পায়ে পায়ে ওদিকে গেলাম। এক ভদ্রলোক। বেডে শুইয়ে দুই হাত দু-দিকে বেডের স্ট্যান্ডের সাথে ফিতে দিয়ে বাঁধা। দুই হাত এদিক-ওদিক টানাটানি করছে। হাত বাঁধা অবস্থাতেই স্যালাইন দেওয়া। সম্ভবত গত রাতেই কোনো এক সময়ে শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাওয়াতে ভর্তি হয়েছেন। আমাকে বেডের পাশে যাওয়া দেখে আশ্বস্ত হলেন। আমি তাকে সালাম দিলাম। চুল-দাড়ি উসখুস। নির্ঘুম চেহারা। নার্স বললেন– বাঁধন খুলে দিলে ক্যাথেটার ও স্যালাইনও খুলে ফেলছেন, আমি একটু বাইরে থেকে আসছি বলে বাইরে চলে যাচ্ছেন। হাসপাতালের নীচের তলায় স্ত্রী ও ছেলে বসে আছেন। তাদের এখানে আসা রেসট্রিকটেড। ওনার নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে, তবু অক্সিজেন নিতে চাচ্ছেন না।

ভদ্রলোককে মানসিকভাবে অসুস্থ বলে মনে হলো। বললাম– একটু শুয়ে থাকুন, আপনাকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে। আমার কথায় তিনি কিছুটা স্বাভাবিক হলেন। বিছানায় মাথা রাখলেন, আমি তাঁর বাসা কোথায়, ক-দিন থেকে অসুস্থ– জিজ্ঞেস করলাম। তিনি কোনো কথারই উত্তর না দিয়ে বিছানায় শুয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাঁপাতে লাগলেন। একটু পরে বললেন– আমি সরকারি একজন বড় অফিসার ছিলাম। দু-বছর আগে অবসরে গেছি। অথচ ওরা আমার কথা শুনতেছে না। ওদেরকে বইলা আমারে এ বান্ধন দুইটা খুইলা দেওনের ব্যবস্থা করেন না! আমি একটু বাঁচি! আমার জীবনডা বাহির হইবার মতো লাগতেছে।

নার্স বললেন– আগে উনি স্থির হোক, ভালোভাবে শুয়ে থাক, পরে খুলে দেবো। তাঁকে আশ্বস্ত করলেন। তবু উনি নাছোড়বান্দা।

তাঁর দিকে তাকিয়ে আমার শরীরটা ক্রমশই ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে আসছে, মাথার মধ্যে চক্কর দিচ্ছে, আর বসতে পারছিনে, ঘুরে পড়ছি। নার্সকে বললাম, আমাকে ধরে বেডে দিয়ে আসতে। স্যালাইনটা চালিয়ে দিতে।

সারাদিন ঐ ভদ্রলোকের অক্লান্ত এলোমেলো কথাবার্তায় ওয়ার্ডে শোরগোল থাকলো। কোনো কোনো রোগী খুবই বিরক্ত বোধ করতে লাগলেন। ঘুমের ট্যাবলেট খাইয়েও কাজ না হওয়াতে সন্ধ্যায় ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়ানো হলো। রাতে আমরা সবাই শান্তিতে ঘুমাতে পারলাম। সকালবেলা শুনলাম, রাতে অবস্থা খারাপ হওয়াতে সিসিইউতে নেওয়ার পর পৃথিবীর বাঁধন খুলে আমাদের অজান্তে উনি জীবনের অন্ধকারে পথ খুঁজে পালিয়েছেন।

আবার সেই হতাশা। জীবনের অনিশ্চয়তায় উদ্বিগ্ন। প্রায় প্রত্যেক রোগীরই অক্সিজেন চলছে। বেশি খারাপ দেখলে সিসিইউতে নিয়ে যাচ্ছে। সেখান থেকে হয়তো কেবিনে, নয়তো না-ফেরার দেশে। কেই-বা অত-শত খোঁজ রাখছে! নিজের জীবনই ওষ্ঠাগত।

দুপুরের পর কনসালটেন্ট ডাক্তার এলে অনেক কথার মধ্যে আমার অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আপনার ঝুঁকি এখনো কাটেনি। আরো ছয় দিন

অপেক্ষা করতে হবে। বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করতে বললেন। একদিন পর পর রক্তের বিভিন্ন পরীক্ষা এবং বুকের ও ফুসফুসের সিটিস্ক্যান করাতে বললেন।

কত শত ইনজেকশন যে শরীরে ঢুকলো, কত ইনজেকশন যে নাভিতে দিলো, আর কতবার যে রক্ত নিলো– তার কোনো ইয়ত্তা থাকলো না। ইনজেকশন দিয়ে রক্ত টানলেও আর আসতে চায় না। হাতে ছিদ্র করার আর জায়গা থাকলো না। আপনজন কাছে থাকলে হয়তো তারা আমার শরীরে এতো কাটাছেঁড়া করতে দেখে কষ্ট পেত; অনন্যোপায় হয়ে অন্তত একটু আহা করতো। শরীরটা খুব ক্লান্ত, শ্রান্ত, হাসা-পানসে।

এর মধ্যে একটা জিনিস খুব ভালো লাগলো। সিটিস্ক্যন করাতে এক দিন পর পর নীচতলায় যেতে হয়। হুইল চেয়ারে বসিয়ে যখন নীচে নিয়ে যায়, নিজেকে খুব সম্রাট সম্রাট লাগে। সম্রাটের ভাব ধরে বসে থাকি। দু-পাশে যত লোকজন থাকে, পোশাকের রং দেখে বোঝে, আমি কে– করোনার আশীর্বাদে দেখামাত্র দূরে সরে যায়। একদিন আমাকে দরজার সামনে অপেক্ষমাণ রেখে ওয়ার্ডবয় ভিতরে গেলো। এক ভদ্রমহিলা আমার থেকে চার-পাঁচ ফুট দূরে বসে ছিলেন। তাড়াতাড়ি উঠে কমপক্ষে বিশ ফুট দূরে গিয়ে বসলেন। ঠিক পশ্চিমা দেশে কালোদের কোথাও বসতে দেখলে সাদারা যা করে তাই। আমি লর্ডের মতো হুইল চেয়ারে বসে থাকি, ওয়ার্ডবয় আমাকে ঠেলে নিয়ে যায়। কোমর নুয়ে স্যান্ডেল পরতে পারিনে; তাই স্যান্ডেলটাও পায়ে ঢুকিয়ে দেয়। জীবনের এ-এক নতুন অভিজ্ঞতা– বেশ ভালোই লাগে। আমরা যারা ফ্ল্যাগ উড়িয়ে হুইসল বাজিয়ে ফাঁকা রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে জীবনে চলতে পারিনি, তাদের জন্য কর্তৃত্বের আস্বাদ, মৃদু অনুভব। মন্দ কী!

বুক ও ফুসফুস স্ক্যান করতে গেলেই একটা গল্প মনে পড়তো। আমি এক লোককে চিনতাম। ঠেটামিতে ওস্তাদ। নিজের স্বার্থের জন্য কোথায় কী করতে হবে, তা তার মুখস্ত। চট্টগ্রাম যাবার ট্রেনে উঠলাম ঢাকা থেকে। দারুণ ভিড়, কোথাও পা রাখার জায়গা নেই। সন্ধ্যা লেগে গেছে। অনেকেরই রাতে একটু শোয়ার ব্যবস্থার দিকে ঝোঁক! সিটে বসলে মাথার উপর জিনিসপত্র রাখা বা শোয়ার জায়গা। একজন সেখানে শুয়ে আছেন। আমার পরিচিত লোকটা প্রথমে শুয়ে-থাকা ভদ্রলোককে

বললেন, ভাই পা-টা রাখা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। আপনার মাথার কাছে একটু বসার জায়গা করে দিন না! দিলে খুব ভালো হয়। কোথায় যাবেন? চট্টগ্রাম। আচ্ছা ঠিক আছে, বসার ব্যবস্থা একটু করে দিন। সেখানে উঠে বসলেন। কিছুক্ষণ পর একবার কাশি দিলেন। দশ মিনিট পর আবার একবার কাশলেন। একটু পর দু-বার কাশি দিয়ে বললেন– ভাই, কিছু মনে করবেন না। আমার আবার একটু থাইসিসের অসুখ আছে, আপনার কোনো অসুবিধে হবে না। ওষুধ খাচ্ছি। অন্যদিকে ঘুরে শুয়ে থাকুন – বলে আরেকবার কাশি দিলেন। শোয়া লোকটা পাঁচ মিনিট শুয়ে থাকলেন, তারপর উঠে ওখান থেকে চলে গেলেন। ঠেটা লোকটা এবার আরামে জায়গাটা দখল করে শুয়ে পড়লেন। কাশিও বন্ধ হয়ে গেল।

হাসপাতালে দেখলাম, আমাদেরকে দেখে যমদূতও দূরে সরে পালায়। সুযোগমতো এসে একবারেই জান নিয়ে চলে যায়, দেরি করে না। ডাক্তার, নার্সরাও ভয়ে ভয়ে দূরে দূরে সরে থাকেন। আমরা অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত। নিজের কাছেই খারাপ লাগে। আমি যদি কারো ক্ষতির কারণ হই!

কয়েকদিনের মধ্যে ডাক্তার ও নার্সগুলো খুব আপন হয়ে গেলেন। তিনজন নার্স পর্যায়ক্রমে ডিউটি করতো। কখনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার সাথে গল্প করতো, সান্ত্বনা দিতো, পারিবারিক আলাপ করতো। আমার ছেলে-মেয়েদের অবস্থান জিজ্ঞেস করতো। ডাক্তার ও নার্সদের সাথে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলাম। নার্সদের দু-জন উপজাতি। ময়মনসিংয়ের উত্তর প্রান্ত থেকে এসেছে। ব্যবহার ও সেবায় অতুলনীয়। পারিবারিকভাবেই সুশিক্ষিত। ভালো পরিবারের সন্তান। একজনের নাম থরসী রাংসা, অন্য জনের নাম চন্দ্রিকা। একজন নার্সিংয়ে ডিপ্লোমা করেছে হলিফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট কলেজ হাসপাতাল থেকে, অন্যজন কুমুদিনী হাসপাতাল থেকে। আরেকজনকে পেলাম নাটোরে বাড়ি। ইসলামী ব্যাংক নার্সিং ইনস্টিটিউট থেকে ডিপ্লোমা করেছে। মেয়েটা খুব ধার্মিক। তিন জনকেই ভালো লাগলো। ওদের দিকে তাকালেই নিজের মেয়ে দুটোর মুখচ্ছবি খুঁজে পেতাম। তখন খুবই খারাপ লাগতো। ভাবতাম, জীবন থাকতে আবার কি তাদের দেখা পাবো! তারা হয়তো আমার লাশ দেখে কান্নায় আমার উপর আছড়ে পড়তে

চাইবে, কিন্তু কাছে আসতে পারবে না। 'তারে অনেক কথা বলবো যদি পাই দেখা একদিন।' নার্স তিনজন এই পেশাতে এসে তিন-চার বছর চাকরি করছে। মনে অনেক স্বপ্ন, বড় হবে। বেতনও মোটামুটি ভালোই পায়। বাপ-মা-স্বামীর সংসারে বোঝা না হয়ে স্বাধীনভাবে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে।

এই যে বিভিন্ন জায়গায় সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান, নার্সিং ইনস্টিটিউট থেকে ডিপ্লোমা করে হাসপাতালে এসে মানুষের সেবা করছে, আবার আয়-রোজগারও করছে– অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে। বিষয়টা অন্য আরো সংশ্লিষ্ট নতুন ধারণা মনে জাগিয়ে তোলে। আমি বাবুই মাস্টার গভীর রাতে আবছায়া অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে ভাবছি:

এ দেশে ইসলাম কায়েম করার জন্য যত পির (মুসলিম দীক্ষাগুরু)– মাথা-ঝাকানো পির, নাচনেওয়ালা পির, উলঙ্গ পির, কবরপূজারী পির আছেন– প্রত্যেকের অগণিত ভক্ত-অনুসারী আছেন। অনুসারীরা কবর ও পিরের জন্য প্রয়োজনে জীবনও সঁপে দেয়, বিসর্জনও দেয়। ভক্ত, অনুসারীদের গরু, ছাগল, দুম্বা দিয়ে বাৎসরিক ওরশ, জিকির-আজকারের ব্যবস্থা, বয়ান ও ভোজের আয়োজন হয়। এটা পির ও মাজার-মোতাওয়াল্লিদের ফসল ঘরে তোলার মৌসুম। এ ব্যবসা এ-দেশে জমজমাট। পিরের জন্য অনুসারীরা অঢেল অর্থ ঢালে। এভাবে অর্থ ব্যয় করে ভক্ত-অনুসারীরা বেহেশত পাবার আশা ছাড়া আর কিছুই ভাবে না। বিখ্যাত মৌলানা (ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ), পির, ইসলামি সমাজ-সংগঠকেরা চিন্তাধারাটা একটু অন্যভাবে পরিশুদ্ধ করে ভক্ত-অনুসারীদের দানে দেশ ও সমাজের উন্নতি হয়– এমন বিভিন্ন কাজে এগিয়ে আসতে পারেন। বিভিন্ন সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তিজ্ঞান শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। ইসলামি নিয়ম মানে না– এমন এনজিওরা ফান্ড সংগ্রহ করে সমাজ উন্নয়নের চিন্তা করতে পারলে; সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ইসলামি ফান্ড সংগ্রহ করাটাও কঠিন কিছু নয়। 'দশের লাঠি, একের বোঝা' কথাটা মৌলানা-পির সাহেবরাও বোঝেন। বিভিন্ন অঞ্চলে প্রকৃত পির ও মৌলানারা স্ব-উদ্যোগে এগুলো করতে পারলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এ-দেশ উন্নত হতে বেশি দেরি লাগার কথা নয়। তাদের

প্রচেষ্টায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মেডিকেল টেকনোলজি শিক্ষা কেন্দ্র, কারিগরি শিক্ষা, স্কুল-কলেজ, নার্সিং শিক্ষা কলেজ, হাসপাতাল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য গবেষণা কেন্দ্র, জীবন ও পেশামুখী এমন আরো অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব। মৌলানারা এ দেশে ধর্ম-মানা জনগোষ্ঠীর নেতা। তাঁরা সততা ও চিন্তাধারার উৎকর্ষ দিয়ে সাধারণ মানুষকে সাথে নিয়ে সামাজিক উন্নয়নের অনেক কাজই করতে পারেন। সাধারণ মানুষের অনেকেই তাঁদের অন্ধের মতো অনুসরণ করে। মৌলানারা বেহেশতকে বড় করে না দেখে সৃষ্টির খেদমত করতে পারেন। সেক্ষেত্রে বেহেশত আপনা-আপনি আসবে। তাঁদেরকে দেশের মানুষের জন্য উদার দৃষ্টি নিয়ে ভাবতে হবে। এক্ষেত্রে রাজনীতির পঙ্কিল পথ প্রথমেই পরিহার করতে হবে। এছাড়া ফান্ডের সদ্ব্যবহার করতে পারলে ইসলামি ভ্রাতৃপ্রতিম দেশও ফান্ড দিতে অনেক সময় এগিয়ে আসতে পারে। প্রয়োজনে সরকারি সহযোগিতাও নেওয়া যায়। সুদমুক্ত ইসলামি ঋণের ব্যবস্থা করে সাহায্য আকারে বেকার যুবকদেরকে ছোট মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানও গড়তে উৎসাহিত করা যায়। এতে শিক্ষার্থীদেরকে নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে এবং প্রযুক্তিগতভাবে রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করে স্বনির্ভর হিসেবে গড়ে তোলা যায়, আবার পরকালের জন্য প্রস্তুতিও নেওয়া যায়। 'হে আমার প্রভু! আমাকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করো, আখেরাতেও কল্যান দান করো এবং আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও।' (সূরা বাকারা: ২০১)– কাজটা সহজ হয়ে যায়। এতে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতা, উলঙ্গতা, মোনাফেকি, যেমন দেশ থেকে কমে, তেমনিভাবে মাদ্রাসায় শুধু কোরআন-হাদিস পড়িয়ে অর্ধশিক্ষিত-অশিক্ষিত বাহাছপ্রিয়, কলহপ্রিয় বেকার জনগোষ্ঠীর অভিশাপ থেকে জাতি মুক্তি পায়। কথা সত্য যে, দুনিয়ায় চলাফেরায় শান্তি, কর্মে শান্তি, লেনদেনে শান্তি ও চিন্তায় শান্তি উঠে গেলে পরজীবনের পথও সংকীর্ণ হয়ে যায়। এজন্য প্রয়োজন হলো মৌলানা-পির সাহেবদের ব্যক্তিগত লাভকে বিসর্জন দিয়ে, ভেদাভেদ ভুলে সামাজিক উন্নয়ন– তথা মুসলিম উম্মাহর জন্য কাজ করে যাওয়া। এতে একটা মানসিক শান্তিও আছে। এ দেশে যাঁরা এ কাজে ব্যস্ত, তাঁদের সাহচর্যে এলেই মনকে জাগিয়ে

তোলা যায়। সবকিছুই চিন্তাধারা পরিবর্তনের বিষয়। ক্ষুদ্র গণ্ডি ছেড়ে বৃহৎ গণ্ডিতে শামিল হবার বিষয়। 'যে ব্যক্তি নিজেকে চিনেছে, সে ব্যক্তি আল্লাহকে চিনেছে'-র বিষয়।

শুধু কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীর সংখ্যা চৌদ্দ-লাখ। অন্যান্য মাদ্রাসা আছে, স্কুল-কলেজের সাধারণ শিক্ষার্থীও আছে। বিভিন্ন অঞ্চলে স্ব-উদ্যোগে ইসলামি ফান্ড মুসলমান দানশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকে স্বচ্ছভাবে সংগ্রহ করে সততার সাথে কাজে লাগাতে পারলেই মুসলিম উম্মাহর উন্নয়ন করতে বেশি বেগ পাবার কথা নয়। আর প্রকৃত মুসলমানদের কাছ থেকেই আমরা সৎ চিন্তা, সৎ কাজ এবং আদর্শ সমাজ গঠন আশা করি। বিষয়টাকে রাজনৈতিক লাভ-অলাভের নিরিখে না করলেই ভালো। এসব করতে গেলে উঁচু মানের লেখাপড়া জানা দরকার, দরকার এ দেশীয় 'মহান' রাজনীতিবিদ না-হয়ে মানুষের মতো মানুষ হওয়া, দরকার প্রাগ্রসর পথধারার অনুসরণ ও সময়োচিত চিন্তাধারা, ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তা ও সততা, মানুষকে আকর্ষণ করার মতো যোগ্যতা, খোদার প্রতি অবিচল আস্থা, আর উদ্ভাবনে-সক্ষম মন। যমদূত আমাকে এ বিনিদ্র রাতে পরোপুরি পাকড়াও করতে না পেরে এসব কথা কানে কানে বলে চলে গেলো।

যমদূতের শমনালয় কর্মবহির্ভূত এসব নিশুতি-কথার আভাস পেয়ে কনসালটেন্ট ডাক্তার পরদিন পাশে এলেন, চিন্তিত হলেন। আগের দিন নেওয়া রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট দেখে শোনালেন– ডি-ডাইমার, আরবিসি, ফেরিটিনের মাত্রা অনেক বেশি। তাছাড়া স্ক্যান রিপোর্টে বোঝা যায়, ফুসফুস বেশি পরিমাণে আক্রান্ত। তিনি ওষুধের মাত্রা এবং ইনজেকশন বাড়িয়ে দিলেন। ভয় না পাওয়ার জন্য বললেন।

আমি বাড়তি কোনো কথা জিজ্ঞেস না করে চুপ করে থাকলাম। শেষে বললাম, আপনি যেটা ভালো মনে করেন, সেটাই করুন– আমার বলার কিছু নেই। ডাক্তার চলে যাবার পর রিপোর্টগুলো নিজে দেখলাম এবং মন্তব্যগুলো পড়লাম। সন্ধ্যার পর বাসায় ফোন করলাম। ছেলে-মেয়েকে প্রথমত সান্ত্বনা দিলাম। তারপর দেনা-পাওনার হিসাবটা লিখে নিতে বললাম। আমার অবর্তমানে কমপক্ষে চার-পাঁচ

বছর কীভাবে সংসার চালাতে হবে, কার উপর বেশি নির্ভর করা যাবে, কাদের উপর ভরসা করা ঠিক হবে না– নাম উল্লেখ করে সব বুঝিয়ে বললাম। দেখলাম জীবন-মৃত্যুর এ সন্ধিক্ষণে কারো উপর মায়া-মমতা তেমন একটা থাকে না। থাকে-না বলার কিছু। সব কিছুর মধ্যে অসহায়ত্ব প্রকাশ পায়। জানালা দিয়ে বাইরে দূরের কোনো একদিকে অজানায় তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগে। কিন্তু রোগের প্রকোপ তা করতে দেয় না, কষ্ট দেয়। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, তবু মনে হয় যে, আমি বেঁচে যাবো। বাঁচার এ অকৃত্রিম আশাই জ্ঞান না-হারানো পর্যন্ত মানুষের শেষ সম্বল। ডিউটি ডাক্তার সারাক্ষণ আসছেন, কেমন লাগছে জিজ্ঞেস করছেন। তিনজন নার্স পালাক্রমে ডিউটি করছেন। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিবিধি লক্ষ করছেন। খাবার আগে ডায়বেটিস মাপছেন; ইনসুলিন দিচ্ছেন। একটা স্যালাইন শেষ হলেই অন্যটা ঢুকাচ্ছেন।

এভাবেই দিনের পর রাত, রাতের পর দিন চলছে। ওয়ার্ডে আমাদের সামনে কেউ মরছেন না। বেশি খারাপ হলেই সাথে সাথে সিসিইউতে স্থানান্তর করছে। পরে নার্সদের মুখে শুনছি, খবর ভালো না; কিংবা কেবিনে রাখা হয়েছে। অন্যান্য ওয়ার্ডের খবর অজানা, কেবিনের খবরও তথৈবচ। মৃত্যুর সাথে এ-ও এক প্রকার ধস্তাধস্তি। যমের মুখ থেকে কাউকে কেড়ে নেওয়া যাচ্ছে না, যম কাউকে না কাউকে নিয়ে পালাচ্ছে। আমাদের সাথে যারা আছেন, প্রত্যেকের বয়সই কমপক্ষে পঞ্চাশ, ষাটোর্ধ্বই বেশি। জীবনের ঋণ অনেকটাই শোধ হয়ে গেছে। এখন ঘাটের মরা– মরবি তো মর, বাঁচালে বাঁচ। কোনো কিছুতেই প্রকৃতির তাড়া নেই। বাঁচলে ভালো, মরে গেলে আরো ভালো– এ দেশে জনসংখ্যার বোঝা কিছুটা হলেও কমে।

বারো দিন পর কনসালটেন্ট ডাক্তার এসে হাসিমুখে বললেন, স্যার, আপনাকে নিয়ে আমরা এখন আশাবাদী। আপনার বিপদ মোটামুটি কেটে গেছে। তবে আরো বেশ কয়েকদিন আমাদের সাথে এখানে থাকতে হবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরো করবো, তারপর বাড়ি পাঠাবো।

আমার মনটাও আরেকটু ভালো। মাঝে-মধ্যেই বাসায় ফোন করি, আত্মীয়-স্বজনকে ফোন করি। কিন্তু শরীর খুব দুর্বল। উঠতে গেলেই মাথার মধ্যে পাক খায়। কিছু খেতে গেলে, নিতে গেলে হাতটা থরথর করে কাঁপে। একবারের বেশি দু-বার ফোনে কথা বলতে গেলেই, চোখে আঁধার দেখি। ওয়াশরুমে যেতে হলে ঘুরে পড়ি। দেয়াল ধরে ধরে যেতে হয়। তবু কারো সহযোগিতা ছাড়াই যেতে চেষ্টা করি। মনে হয়, আমি সুস্থ হয়ে যাচ্ছি। এক দিন পর পর আরো তিন বার করোনা ভাইরাস পরীক্ষা করানো হলো। তিনবারই 'পজিটিভ'। ডাক্তার চান, নেগেটিভ হলে তবে হাসপাতাল ছেড়ে যেতে। এভাবে কয়েকদিন চললো। অবশেষে ডাক্তার বিরক্ত হয়ে বললেন, কাল রক্ত দেবেন, আগামী পরশু 'নেগেটিভ' 'পজিটিভ' যা-ই হোক আপনাকে ছেড়ে দেবো। অনেকেরই 'নেগেটিভ' হতে সময় লাগে। আপনি বাসায় গিয়ে বিশ দিন কোয়ারেন্টিনে থাকবেন। কিছু পরীক্ষা দেবো, ঐগুলো করিয়ে দশ দিন পর দেখিয়ে যাবেন। শরীরের প্রতি যত্ন নেবেন। পারলে দিনে একবার ঘরের মধ্যে একটু হাঁটাহাঁটি করবেন। কিছু খাবারের নাম লিখে দেবো, ঐগুলো আপাতত এড়িয়ে চলবেন।

হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেওয়ার কাঙ্ক্ষিত দিন এলো, সময়ও এলো। দুপুর পর পরীক্ষার রিপোর্টগুলো আসার কথা। যথাসময়ে রিপোর্ট এলো। তখনও করোনা ভাইরাস 'পজিটিভ', ডি-ডাইমার বেশি হলেও অল্প বেশি। ফেরিটিনের মাত্রাও বেশি। ডাক্তার বললেন– ভয়ের কোনো কারণ নেই, আস্তে আস্তে কমবে। এর মধ্যে বিভিন্ন জায়গার ছাড়পত্র নিতে নিতে বিকেল চারটে বেজে গেছে। অর্থবিভাগ থেকে ছাড়পত্র এলো, আমি বাঁচলাম, কিন্তু আমার পকেটের পূর্ণমাত্রা শ্রাদ্ধ হয়ে গেল। আমি বেরোনোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি।

অন্যান্য বিভাগের বেশ ক-জন– একটু দূরে আমার পিছনে এসে হাজির। সবাই আমার শুভাকাঙ্ক্ষী। এতদিন আমার জীবন নিয়ে ভয়ে ভয়ে ছিল। আজ এসে মনের কথা প্রকাশ করছে। নীচে এসে গাড়িতে উঠলাম। অনেকেই এসে গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেলো। ড্রাইভারেরও হাসি হাসি মুখ– অনেক দিন পর তাকে আবার দেখলাম। সন্ধ্যার আগ দিয়ে বাসার গেটে পৌঁছলাম। এখনই যেতে হবে ছাদের

ওপরে একাকী একটা ঘরে– আইসোলেশনে। আলাদা ঘরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হাঁপিয়ে যাচ্ছি। আমার আগে আগে একটা মা-বিড়াল গুটিসুটি পায়ে সিঁড়িঘরের দিকে ঢুকলো। সিঁড়িঘরের নীচ থেকে সদ্য জন্ম নেওয়া কয়েকটা বিড়ালের বাচ্চার মিঁউ মিঁউ আগমনী শব্দ কানে ভেসে আসছে। নতুনের জাগরণ সঙ্গীত।

(পল্লবী, ঢাকা: ০৪.১১.২০২০ইং)

নিঃসঙ্গ স্মৃতি-ভাস্কর

এক

আমার আপন কোনো ভাই নেই। তাই বলে ভাই নেই বললে চলে না। কয়েকজনকে পেয়েছি– আপনের চেয়ে বড়-আপন ভাই। সবাই বয়সে আমার বড়, একজন বাদে। কেউ-বা বিশ বছরের বড়, কেউ পাঁচ বছরের। এর মধ্যেই বয়সের উঠানামা। কাউকে জন্মাবধি পেয়েছি, কাউকে পেয়েছি অনেক পরে। আবার পরে এসে কেউ চলেও গেছেন সবার আগে। বলতে গেলে, 'সব চেয়ে যে শেষে এসেছিল, সেই গিয়েছে সবার আগে চলে।' পেশাতেও আমার সাথে মিল ছিল। দু-জনেই মাস্টার। উনি আমাকে বলতেন বড় মাস্টার– আমি সম্পর্কে বড় তাই। আমি মুচকি হাসতাম। বয়সকালে শীতের মৌসুম এলেই দু-জনে চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে যাত্রা প্যান্ডেলে ঢুকতাম। বসতাম সবার পিছনে। খোলা মুখে যাত্রা প্যান্ডেলে ঢোকা অন্য কারণে সম্ভব হতো না। সামনে বসাও সে কারণে সম্ভব হতো না। কারণটা এক্ষণে বলছিনে। নতুন কোনো সিনেমা এলেই দু-জনে বাঁধা খরিদ্দার। সাধারণত ছয়টা-নয়টার শো দেখতাম। বাড়ি থেকে একুশ কিলোমিটার দূরে। বাড়িতে পৌঁছতে রাত এগারোটা-বারোটা বেজে যেতো। রাতে এভাবে অন্ধকারের মধ্যে আসতে অনেক দিন অনেক বিপদে পড়েছি দু-জনে। সিনেমা দেখার বাতিক বাধা মানেনি। কখনো দু-জনে সন্ধ্যার পর খোলা মাঠের হাওয়া খেতে বেরোতাম। উন্মুক্ত মাঠের কোথাও বসে মনভরে গল্প করতাম। তিনি এক সময় গানের দলে, নাটকের দলে অভিনয় করতেন। সে-গল্প বলতেন। কখনো কোনো নাটকে মানুষ হাসানোর জন্য কমেডিয়ান হয়ে অভিনয় করতেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় গ্রামে মানুষকে সংগঠিত করতেন। পাকসেনা ও রাজাকাররা একদিন গ্রাম ঘেরাও করলে বাড়ির সবাই পালিয়ে মাঠে ধানের ক্ষেতে লুকিয়েছিলেন। উনি কোলে রেখেছিলেন এক ভাগ্নিকে। ভাগ্নি 'মার কাছে যাব, 'মার কাছে যাব' বলে জোরে কান্না ধরলো। কান্না আর থামে না। পাকসেনারা তাকে ধরে নিয়ে গেলো। অনেক অত্যাচার করেছিল। পায়ের পাতায় পেরেক পুঁতে গাছের ডালে ঝুলিয়ে প্রতিদিন মারতো। উপুড় করে শুইয়ে পিঠের উপর দাঁড়িয়ে লাফাতো। দু-পায়ের গোড়ালির রগ ছিদ্র করে গাছে উল্টো করে

টাঙিয়ে চাবুক মারতো। এক দলে যখন অনেককে গুলি করতে নিয়ে যায়, সে সময় ঐ ক্যাম্পে থাকা এক বিহারি তাকে দল থেকে গোপনে বের করে দিয়েছিল। এ বিহারির কাছ থেকে উনি প্রতি সপ্তায় মাংস কিনতেন। সে-সূত্রে তার সাথে পূর্ব পরিচয়। কখন যে কীভাবে কে বেঁচে যায়, হিসাব মেলানো কষ্টসাধ্য! ঐ সময় পাকসেনাদের হাতে মারা গেলে আমরা এই মায়াডোরে আর বাঁধা পড়তাম না। তার প্রতি অন্যায়-অত্যাচার আমার কাছে অজানাই রয়ে যেত। সে-দফা তিনি ওভাবেই প্রাণে রক্ষা পান। অনেক বছর চিকিৎসাধীন ছিলেন।

যুদ্ধের আগে তাঁর আব্বা খুনের কেসের আসামি হয়ে জীবনের সর্বস্ব খুইয়েছিলেন। এজন্য তাঁকে অল্প বয়সেই জীবনের নির্মম বাস্তবতা ও কষ্টকর সংগ্রামের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। নিজে লেখাপড়া শিখেছিলেন এবং ছোট ভাইবোনদের মানুষ করতে হয়েছিল। তাই তিনি অমানবিক পরিশ্রম ও কঠিন বাস্তবতার স্বরূপ চিনেছিলেন। যুদ্ধের দু-বছর পর আমার সাথে পরিচয়, তারপর বন্ধুত্ব। তাঁর জীবনের খুঁটিনাটি অনেক কিছুই আমি জানতাম। আমি ছিলাম বিমুগ্ধ– নীরব শ্রোতা। বরাবরই আমি শ্রোতা হিসেবে ভালো; চুলচেরা বিশ্লেষক, গভীর অনুভূতিসম্পন্ন একজন সমঝদার। তিনি আমাকে মিয়া (মহাশয়, প্রধান, সাহেব) ভাই বলে সম্বোধন করতেন। প্রতিদানে আমি কোনো সাহেব-টাহেব না বলে, শুধু 'মাস্টার' বলে ডাকতাম। এতেও একটা চমৎকার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সম্পর্কের গভীরতা এতো ছিল যে, এতটা বছর পরেও তিনি আমার হৃদয়াকাশে নক্ষত্রের মতো এখনো প্রোজ্জ্বল। তার অভাব আমার জীবনে পূরণ হবার নয়।

আমি বাড়িতে গিয়েছি শুনলেই তিনি আসতেন। কখনো আমি তার বাড়িতে যেতাম। একদিন উনি আমাদের বাড়িতে এসেছেন। তখন রক্ষীবাহিনীর ভীতিকর নির্বিচার হত্যাযজ্ঞের মৌসুম চলছে, হিসাব করে চলার কেউ নেই। বেপরোয়া ধরপাকড়। ধরে নিয়ে গেলেই পিটুনি মাফ নেই, প্রথমেই অর্ধমৃত অবস্থা করে ফেলতো। তারপর ছেড়ে দেওয়া বা নিরুদ্দেশ যাত্রা অথবা মৃতাবস্থায় নদীতে ভাসা, কিংবা রাস্তার ধারে পড়ে থাকা। পাকসেনাদের অত্যাচারের পর মাস্টার হয়ে পড়েছিলেন ভয়তরাসে, ভয়চকিত। এলাকার ছেলে-বুড়োর একই দশা। কেউ

একজন হুজুগ তুলে দিলেই হয়। 'ঐ আসছে' বললেই দে দৌড়। মাঠে, পাট ক্ষেতে, ধানের মধ্যে কিংবা বিলের পানিতে। হুজুগ অধিকাংশই ভুয়া, ভিত্তিহীন হতো; কখনো সত্যও হতো। একদিন বিকেল সাড়ে চারটা-পাঁচটা হবে। পাঁড়ার সবাই দৌড়াচ্ছে মাঠের দিকে। 'ঐ আসছে'-র কথা মনে হলো। দু-জনে মাঠের দিকে দৌড়ানো শুরু করলাম। প্রাণপণ দৌড়। লুঙি পরনে থাকলো কি খুলে পড়ে গেল– দেখার অবকাশ নেই। বিলের ধানক্ষেত না পাওয়া পর্যন্ত দৌড়। মাঝ মাঠে গিয়ে মাস্টার একটা ঢেলার উপর পা দিলে ঢেলাটা গড়িয়ে যায়। মাস্টারও উল্টিয়ে সামনে গিয়ে পড়লেন। পড়ে গিয়ে বেশি ব্যথা পেলেন। উঠে দাঁড়াতে পারছেন না। আমি গিয়ে হাত ধরে উঠালাম। হাঁটু কেটে গেছে। সেই অবস্থায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে বিলের ধানের ক্ষেতে না গিয়ে পাশে পাটের ক্ষেতে লুকালাম। সন্ধ্যার পর মাঠের অনেকেই বাড়ি ফেরা শুরু করলো। আমরাও বুঝলাম, সেদিনের বার্তা ছিলো গুজুগে। রাতে বাড়িতে গিয়ে চিকিৎসা শুরু করা হলো। এ-সাথে সবাইকে সাথে নিয়ে হাসি আর হাসি। বয়সটা ছিল হাসির। বিপদের মধ্যেও হাসির খোরাক মনে আসতো, নিষ্ঠুর হাসি। সে হাসি কোথায় যে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল!

'আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবী মনে?
জীবন প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়,
ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ুহীন হীনবল দিন দিন–
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? এ কি দায়!'

তিনি তাঁর ভাইদের 'মানুষ' করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। নিজের সুখ-শান্তি, চাওয়া-পাওয়া বিসর্জন দিয়েছেন। সীমার বাইরে পরিশ্রম করেছেন। উদ্দেশ্য, বাপের হাতে ধ্বংস হয়ে যাওয়া অর্থকড়ি-সম্মান ফিরিয়ে নিয়ে আসা। নিজের জীবনের বিনিময়ে অনেকটাই সার্থক হলেন। বয়স যত বাড়তে থাকলো, অসুস্থতা ততো ঘিরে ধরলো। প্রতিটা ভাইয়ের ঘরে একজন-একজন করে ভ্রাতৃবধূ এলো। তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পেলো। ভাইগুলো অন্যের ঘর থেকে আসা অর্ধাঙ্গিনীদের কথা ও কাজের প্রতি বেশি আস্থবান হলো। কেউ কেউ তার

অস্তিত্বকে কুলবধূর চরণে বিকিয়ে দিলো। আপন ভাইকে ফেলে অন্যের পরিবারকে পরম-আত্মীয় বলে গণ্য করলো। শেষে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয়ে গেল। তিনি হাতাশার চাদরে ততো নিজেকে জড়াতে লাগলেন। মনের কথা বলতে পারতেন না। শেষের দিকে এসে শুধু আমার সান্নিধ্য চাইতেন। কথা বলে একটু তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়তেন। জীবনের প্রতি যেন বিতৃষ্ণা ধরে গিয়েছিল। আপনজনদের প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন অভিমান তাঁর মধ্যে কাজ করতে শুরু করলো। মনের মধ্যে কিছু কথা জমলেই ছুটে আসতেন, পরামর্শ নিতেন। তাঁর একটা বড় গুণ ছিল– কারো বিপদের কথা শুনলে দৌড়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতেন, সহযোগিতার কাজে জীবন দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেন।

হঠাৎ ঢাকাতে বাসায় এলেন। বললেন, অনেক কথা আছে। শরীরের অবস্থা দেখলাম ভালো না। অনেক দিন থেকেই অ্যাজমায় প্রকটভাবে ভুগছেন। কোনো ওষুধেই কাজ হচ্ছিল না। চিকিৎসাও তেমন একটা ছিল না। নিরাময়ের আশায় ডাক্তার, কবিরাজ, হোমিও কাউকেই বাদ রাখেননি। শেষে যে যা বলতো তাই খেতেন। কী যেন একটা ওষুধ খেয়ে শরীরটা ফোলা ফোলা ভাব। বুকে বেশ অসুবিধা। বাড়িতে ছেলেকে নিয়ে সমস্যা। লেখাপড়া করে না। জেদ খুব বেশি। বাস্তবতার বিপরীতে চলে। ভর্তিপরীক্ষায় কোনো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পায়নি। শুধু শর্টকাট পদ্ধতিতে কিছু মুখস্ত করে কোচিং ব্যবসায়ীদের খপ্পরে পড়ে হ্যান্ডনোট হাতে নিয়ে সবকিছুতে উতরাতে চায়। পরিশ্রম করে পড়া এড়িয়ে যেতে চায়। শিক্ষকের ছেলের শিক্ষার উন্নয়ন ও উচ্চশিক্ষা হবে না, এটা ভেবে উনি খুবই শঙ্কিত। এক্ষেত্রে আমার বলার তেমন কিছু ছিলো না। ছেলেমেয়েরা যদি শত বুঝ দেওয়া সত্ত্বেও লেখাপড়ায় মনোযোগী না হয়, বাপ-মাকে দেখানো পড়া পড়ে, সময়ের কাজটা সময়ে সঠিকভাবে না করে, করার কীই-বা থাকে! যদি রাত দিন টিভির সামনে খেলা দেখা নিয়ে পড়ে থাকে, অল্প বয়সেই জীবনের ভোগ নিয়ে উঠে পড়ে লাগে, ফ্যাশনদুরস্ত হয়, চুল খাড়া করার গাম কেনার দিকে ঝোঁক বেশি থাকে, ভবিষ্যৎ উন্নয়নমুখী না হয়, আয়েশি জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়– অভিভাবক মহলের দুশ্চিন্তা করা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিয়ে হতাশার অতলে হাবুডুবু খাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কাউকে বলেও দুঃখ লাঘব হয় না। এভাবেই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জীবনের

পূর্ণতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আমৃত্যু ভোগে। অনুশোচনা করেও আর পার পায় না। ওকে স্থানীয় কোনো কলেজে ডিগ্রি পাস কোর্সে ভর্তি করে দিতে বললাম। পরে মন-মানসিকতা গঠনমূলক হলে অন্য ভালো কিছু ভেবে দেখা যাবে। ঠেলাগাড়িকে ঠেলে মাহাসাগর পাড়ি দেওয়া যায় না। বড় জোর দু-তিন কিলোমিটার পথ যাওয়া যায়।

তাঁর শরীরের অবস্থা দেখে খুব শঙ্কিত হলাম। বার বার ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করাতে চাইলাম, রাজি হলেন না। অল্প দিনের মধ্যে আবার আসবো বলে কথা দিয়ে এড়িয়ে গেলেন। তাঁর দুশ্চিন্তাও দূর করতে পারলাম না, বরং নিজেও দুশ্চিন্তায় জড়ালাম। বাড়িতে গেলেন। আমার শঙ্কা দূর হলো না। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেলো। যাদের জন্য জীবনবাজি রেখে পরিশ্রম করে অসুস্থ হলেন, তারাও বুঝলো না– দূরে সরে গেলো। অজানা দুঃসংবাদের অপেক্ষায় থাকলাম।

আমি তখন ঢাকায় কর্মব্যস্ত। হঠাৎ মাঝরাতে ফোন পেলাম, মাস্টার হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেছেন। সীমার বাইরে পরিশ্রম করে জীবনের আয়ু নিঃশেষ করে শেষে অকালেই ঝরে গেলেন। রাতে আর ঘুম হলো না। দেশে লাগাতার অবরোধ চলছে। বিপদ ছাড়া কেউ বাইরে বেরোচ্ছে না। ভোরে উঠে রিক্সাযোগে গাবতলীর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। ওখানে গিয়ে অনেক ঘোরাঘুরির পর চারগুণ টাকা ব্যয়ে একটা বেবিট্যাক্সি ভাড়া করলাম। প্রধান সড়কে যাওয়া সম্ভব না হওয়ায় ড্রাইভার বিভিন্ন গ্রামের পথে মানিকগঞ্জ পৌঁছালো। তারপর পাটুরিয়া ফেরিঘাট। বেলা গড়িয়ে গেছে। ঘাটে গিয়ে দেখলাম ফেরি বন্ধ। নদী পার হয়ে দৌলতদিয়া ঘাটে যেতে হবে। চারজনে মিলে একটা নৌকা ভাড়া করলাম। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পদ্মানদী আড়াআড়ি পার হলাম। রাত হয়ে গেছে। রেল-স্টেশনে গেলাম। একটা ট্রেন আসবে রাত সাড়ে আটটায়, খবর পেলাম। ট্রেনে গাদাগাদি করে রাত এগারোটায় তাঁর বাড়ির কাছের স্টেশনে পৌঁছলাম। এবার চার মাইল হাঁটার পালা। সৌভাগ্যক্রমে একটা রিক্সাভ্যান পেলাম ঐ গ্রামে যাবার জন্য। তাঁর বাড়িতে গেলে বাড়ির সবাই আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লো। বাড়িতে সবাইকে পেলাম, শুধু তাকে ছাড়া। চিরদিনের মতো কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

যাদের কারণে তাঁর এই অমানবিক পরিশ্রম, দুশ্চিন্তা– তারা বহাল তবিয়তে থাকলো। 'আমায় নহে গো, ভালোবাসো শুধু, ভালোবাসো মোর গান' কথাটা ভাবলাম। বুঝলাম, সঙ্গহারা হলাম। তাঁর দাফন হয়ে গেছে দুপুরের পর। মৃত মুখখানা শেষবারের মতো আর দেখা হলো না। পরদিন শূন্য মন নিয়ে সাথীহারা অবস্থায় ফিরে এলাম।

কোনো বিশেষ কিছু খেতে গেলেই তাঁর কথা মনে হয়। শত কাজের ভিড়ে কখনো তাঁর কথা ভুলে যাই, তবু বছর ঘুরে নির্দিষ্ট দিনটা এলেই তাঁকে স্মরণ করি। প্রতিনিয়ত তাঁর জন্য দোয়া করি। তাঁর হাস্যোজ্জ্বল স্পষ্ট মুখ চোখে ভাসে। তাঁর 'মিয়া ভাই' ডাক তাঁর কথা মনে এলেই কানে বাজে। তাঁকে চলার পথে মনে মনে খুঁজে ফিরি। জানি পাবো না, তবু এ খোঁজা আমার জীবনসাথী।

দুই

আমি তখন ছোট। আমার বড় দুলাভাই একজন যুবক-বয়সী লোককে সাথে করে সন্ধ্যায় বাড়িতে এলেন। অত-শত বোঝার বয়স তখনো আমার হয়নি। আমাকে বললেন, আজ থেকে তাঁকে ভাই বলে ডাকতে। তাঁর দুনিয়াতে তেমন কেউ নেই– এতিম। আমারও কোনো ভাই নেই। ভাইয়ের বড্ড অভাব। সমাজে ভাইয়ের মতো ভাই পাওয়া অনেক কঠিন। আমি তাঁকে ভাই বলে মেনে নিলাম। তিনি আমাদের বাড়িতেই থাকতেন। আমি ছোট থেকে ক্রমশ বড় হচ্ছি। তিনিই আমার ভাই। বাড়ির সব কাজ, দেখাশোনা তিনিই করেন। আব্বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ও জনকল্যাণমূলক কাজ নিয়ে মহাব্যস্ত থাকেন। বাড়ির কাজ দেখাশোনা করার সময় নেই। থাকেন বাজারে। মাঝে মাঝে বাড়ি আসেন। বড় একটা বাড়ি। চারদিকে প্রাচীর দেয়া। প্রতিবার খাবারের সময় আঠারোটা পাত পড়ে। বিশাল আয়োজন। মাঝখানে তিনি। মাঠ-ঘাট দেখার দায়িত্ব তাঁর– সবকিছুতে হাতের লাঠি।

বড় হয়ে গ্রাম ছেড়েছি। শহুরে হয়েছি। বাড়িতে যাব। ঐ ভাই সাথে আছেন। তাঁকে নিয়ে আমার কল্পনা। তাঁর সন্তান-সন্ততি হয়ে তারা বড় হতে লাগলো। অনেক বছর পর আব্বা তাঁকে পৃথক করে দিলেন। মাঝখানে তিনি একবার কঠিন অসুখে

পড়লেন। চিকিৎসা খরচসহ সব খরচ আব্বা চালাতে লাগলেন। দু-বছর এভাবে চলার পর আর চলে না। আবার সংসারে একত্র করে নিলেন। বেশ ক-বছর এভাবেই কাটলো। তাঁর ছেলে-মেয়ে বড় হচ্ছে। কটুকথা হবার আগেই কিছু জমি-জমা দিয়ে আবার পৃথক করে দিলেন। তিনি তাঁর সংসার নিয়ে স্বাধীনভাবে বসবাস শুরু করলেন। তিনি শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতেন না। ছেলে-মেয়ের কারোরই লেখাপড়া হলো না। বলতে গেলে সবগুলোই উড়নচড়ে। কোনো নির্দিষ্ট কাজে মন বসাতে পারে না। নগদ পাওনা বেশি বোঝে। জীবনের বুঝগুলো সুস্থ জীবনোপযোগী নয়, তাই জীবনের প্রতি পদে পদে যন্ত্রণা ও বঞ্চনা। ভাইও ছেলে-মেয়ে নিয়ে সুখের মুখ দেখলেন না। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত আমিই তাঁর শেষ ভরসার স্থল হয়ে রয়ে গেলাম।

তিনি ঢাকাতে এলেন। ছেলের বাসাতে উঠলেন। আমার এখানে এলেন তিন দিন পর। শরীরটা অসুস্থ। ডাক্তার দেখালাম। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হলো। অর্থোপেডিক্স ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হলো। ডাক্তার বললেন, আরথ্রাইটিস রোগে ভুগছেন। হাঁটুর জয়েন্টে ব্যথা, ফুলে গেছে, আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে। গায়ে পানি জমেছে। প্রেসার উঠা-নামা করে। ওষুধ দিলেন। শরীরের যত্ন দরকার। নিয়ম মেনে চলা দরকার। মারাত্মক কোনো অসুখ না, মেনে-বেছে চললে ভালো থাকবে। নিয়মিত পরীক্ষা করাতে হবে। প্রেসারের ওষুধ একটানা খেয়ে গেলে হবে না। দু-দিন পর পর প্রেসার মেপে প্রেসারের ওষুধ খেতে হবে। অন্যান্য ওষুধ নিয়মিত খেতে হবে। খাবারের যত্ন নিতে হবে। এক মাস পর আবার আসতে হবে।

বাড়িতে গেলেন। গাবতলী পর্যন্ত গিয়ে বাসে উঠিয়ে দিয়ে এলাম। এক মাস হতে চললো। বড় বর্ষা শুরু হয়েছে। তিন দিন থেকে অবিরাম বর্ষণ। ঝড়ো হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। বড় ছেলেটা পনেরো কিলোমিটার দূরে নিজের তৈরি শ্বশুরের বাসায়, মেজ ছেলেটা ঢাকায়, ছোট ছেলেটা প্রবাসে। প্রাকৃতিক এ দুর্যোগের মধ্যে তিনি গ্রামে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বিকেল থেকে এক-নাগাড়ে প্রবল বর্ষণ চলছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তাঁর বেশ খারাপ লাগছে। সন্ধ্যার পর আমার কাছে ফোন এলো। শরীরটা খুব খারাপ। পাশের বাড়ির একজনকে ডেকে এক কিলোমিটার দূরের এক গ্রাম্য ডাক্তারকে ডেকে প্রেসারটা মেপে দেখার কথা বললাম। ডাক্তার আসেনি।

সকালে আসবে বলে দিয়েছে। ঘাড়ে ব্যথা করছে। আমাকে না জানিয়ে প্রেসারের ওষুধ একটা খেয়েছেন। অস্বস্তি লাগছে। ভাবছেন, প্রেসার বেড়ে গেছে। তাই ঘাড় ব্যথা করছে। প্রেসারের বড়ি আরেকটা খেয়েছেন। এই রাতে কোনো পথ নেই, অথচ খুব খারাপ লাগছে। রাত দশটার দিকে আরেকটা প্রেসারের বড়ি খেয়েছেন। সাড়ে দশটার দিকে খোঁজ নেয়ার জন্য ফোন করলাম। অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছে। আমি ভাবলাম, প্রেসার হয়তো কমে গিয়েছিল। সেজন্য অস্বস্তিতে ভুগছিলেন। এরপর প্রেসারের আরো দুটো ট্যাবলেট এক ঘণ্টা পর পর খেয়েছেন। তাই পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে।

না ঘুমিয়ে বসে আছি। মহাচিন্তায় পড়েছি। বিরূপ আবহাওয়া– ঢাকায় বসে এ রাতে কিছু করারও নেই। রাত সাড়ে বারোটার দিকে উনি মারা গেলেন। সারা রাত ভারী বর্ষণের পর সকালের আবহাওয়াটা সহনীয়। ভোরে উঠে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আশা-আকাঙ্ক্ষা সব শেষ। চারদিকে নিঃসাড় শূন্যতা। বাড়িতে গিয়ে দাফনের ব্যবস্থা করলাম। তাঁর গোসলে শরিক হলাম না, মুখখানাও একবার দেখতে চাইলাম না, জানাজায় শরিক হলাম। ঢাকায় ফিরে চলে এলাম।

তিনি তাঁর ঘরের সামনের বারান্দায় একটা ছোট্ট জলচৌকির উপর অবসর সময়ে বসে থাকতেন। আমার চোখে এখনো সে দৃশ্য ভাসে। আমি গ্রামে গেলেই ছুটে আমার পাশে এসে দাঁড়াতেন। সুবিধা-অসুবিধার অনেক কথা বলতেন। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে সাংসারিক বিভিন্ন শান্তি-অশান্তির কথা বলতেন। আমাকে ছেলে-মেয়েদের তুলনায় আপন ও বিপদের একমাত্র আশ্রয় ভাবতেন। গ্রামে তেমন কারো সাথে মেশামিশি করতেন না। আমি তাঁকে আল্লাহর উপর ভরসা করে চলতে বলতাম। বয়সে আমি তার ছোট হলেও তিনি ছিলেন গ্রামে আমার হাতের লাঠি। লাঠিটা ভেঙ্গে যাবার কারণে আমি খুব মর্মাহত। আমি গেলে এখন তিনি আর কাজ ফেলে এসে পাশে দাঁড়ান না। আমার মনটা অব্যক্ত ব্যথায় ভরে যায়। সঙ্গী হারিয়ে ফেলেছি। কোনো একটু অসুবিধে হলেই তিনি ফোন করতেন। তাঁর ফোনে আনন্দিত হতাম। সে ফোন অনেক বছর থেকে আর আসে না। আমি ক্রমশই নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছি। আমার মনের ভাষা যাঁরা বুঝতেন, আমি ভালো আছি শুনে

যাঁরা তৃপ্তি পেতেন, যাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে নিজেকে স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপদ বোধ করতাম তাঁদের সংখ্যা ক্রমাগত কমছে।

তিন

জন্মেই যাঁকে দেখেছি, নিজের করে ভাবতে শিখেছি, তিনি পরিবারের অনেকের মতো আরেকজন– নাম মজনু। মজনুন বা মাজনুন শব্দটা আরবি শব্দ, অর্থ– প্রেমিক, বিবাগী, পাগল। নানি নামটা শখ করে রেখেছিলেন। পরিবারের সবাই এ নামেই তাঁকে ডাকে। নানির কাছে উনি খুব প্রিয়। নানিকেও জন্ম থেকে এ বাড়িতে পেয়েছি। নামে মজনু, আমার কাছে ভাই, শুধু ভাই নয়– সম্মান দেখিয়ে ভাইয়ের সাথে 'সাহেব' যোগ করে দেওয়া আমাদের সমাজের নিয়ম। আমিও সেটা মেনে চলি। ডাকি ভাইসাহেব বলে। কালো রংয়ের মানুষটা, লম্বা ছড়িয়ে পড়া শরীর। ফুটবল খেলোয়াড়। আমার থেকে বয়সের পার্থক্য মোটামুটি বিশ-পঁচিশ বছর। বনেদি ঘরের ছেলে। ব্যবসা করেন। আমাদের বাড়িতে বেশি থাকেন। আমি বড় ভাইয়ের মতো জানি। আব্বা সব কাজে, পরামর্শে তাকে সাথে নেন। একটু বড় হয়ে দেখলাম আব্বা তাকে সাথে নিয়ে ব্যবসা করেন। বাড়ির সবাই তাকে পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে জানেন। আমার ছাত্রাবস্থায় আব্বা মারা গেলেন। তিনি তখন আমার অভিভাবকের ভূমিকায় চলে এলেন। আমার ছাত্রজীবন শেষ হবার পর আর বাড়িতে থাকা হয়নি। আমার বাড়িতে যাবার কথা শুনলে যেখানে যে অবস্থায় থাকেন, দেখা করতে এক বা একাধিকবার আসবেনই। তাকে কাছে পেয়েছি– কখনো পরামর্শদাতা, কখনো নির্দেশক, কখনো বিপদের বন্ধু হিসেবে।

আমার বাল্যজীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে তাঁর গ্রামের বাড়িতে। সেখানে আমার খেলার সামগ্রী, সাথী গড়ে উঠেছিল। ঐ গ্রাম আমার বাল্যজীবনের অসংখ্য স্মৃতিতে ভরা। বাড়ির পাশ দিয়ে নদী বয়ে গেছে। নদীর পাশে তমাল-হিজল গাছ। সারি সারি। কোনোটা-বা বয়ে পানির মধ্য দিয়ে দূরে গিয়ে উঠেছে। বর্ষার সময় এলে প্রায় গাছের গোড়াতে পানি চলে আসে। গাছ বেয়ে উপরে উঠে, নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গোসল করা। সাঁতার দিয়ে নদীর এপার থেকে ওপারে

যাওয়া, আবার ফিরে আসা। অবারিত, মুক্ত কৈশোর কর্মকাণ্ড। সময়ে অসময়ে ডোঙায় চড়ে নদীতে ঘুরে বেড়ানো, জাল দিয়ে মাছ ধরা। ঘরে ফিরে এলেই রকমারি মাছের খাবার। বিকেলে খেলার মাঠে ফুটবল, দৌড়ঝাঁপ ইত্যাদি কত রকমের খেলা। ঐ গ্রামে গেলেই লেখাপড়ার সাথে সংযোগ হারিয়ে ফেলতাম। ছোটবেলায় এবং কৈশোরে লেখাপড়া আমি কোনোদিনই করিনি। লেখাপড়া শিখতে হবে– এ বোধই কখনো মাথার মধ্যে আসতো না। খেলা ও আমোদ-প্রমোদ পেলে তা নিয়েই মেতে সময় পার করে দিতাম। খুব আবেগপ্রবণ ছিলাম। কল্পনার ফানুস উড়িয়ে অলীক স্বপ্নে বিভোর হয়ে জীবন পার করে দেওয়ার কথা ভাবতাম। এ-নিয়ে ভাইসাহেব কখনো কখনো বকা দিতেন। সে বকা কতটুকু জীবনে উন্নয়নের কাজে ব্যয় করেছি, তা মনে পড়ে না। তবে তিনি যা করেছেন, তা আমার মঙ্গলের জন্য করেছেন, এটা সত্য। লেখাপড়া শেষ করে বেরোনোর পর বিপদে পারস্পরিক বন্ধু হয়ে গেছি। তাঁর সংসারের যে কোনো বিপদে তাঁর পাশে থাকি। আমার বিপদে পাশে তিনি। প্রতিটা কাজে, প্রতিটা প্রয়োজনে তার সাহচর্য। তিনি খুব ভোজনরসিক ছিলেন। কী কী খাবার ভালোবাসেন তা আমার মোটামুটি জানা। তার পছন্দের খাবার খেতে বসলেই আমি তাঁর নাম এখনো একবার মুখে আনবোই। যখনই বাড়িতে যাই না কেন, তাঁর অথবা আমার সংসারের বিষয়াদি নিয়ে বৈঠকের পর বৈঠক চলেছেই। আমার যে কোনো পরামর্শের জন্য তিনি। তিনি কোনো বিষয়ের সুবিধা-অসুবিধা মিলিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করতে পারতেন। কাজের আগে আগে থাকতেন। পাশাপাশি দুটো জেলার বনিয়াদি যে কোনো ফ্যামিলি কোনো-না-কোনোভাবে তাঁর অথবা আমাদের আত্মীয়। ওগুলো আমার মাথায় ধরে রাখা সম্ভব না। কোন সূত্রে কীভাবে আত্মীয়– সব তাঁর মাথায়। অনেক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় দিনে দিনে পর হয়ে যাচ্ছে, দূরে চলে যাচ্ছে। তিনি বেঁচে থাকতে সবার সাথে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করতেন। তিনি অজানায় হারিয়ে গেছেন, তবু তার নাম প্রতিনিয়ত একবার মুখে আসবেই।

একবার এক বিপদে পড়লাম, দেশীয় বিপদে– মহাবিপদে। মাঝরাতে আমি পড়ার টেবিলে বসে এটা-ওটা লিখছি। গ্রামের চারপাশে নীরবতা ভেঙে ঝিঁঝিপোকার ডাক ছাড়া অন্ধকারের ঘোর নিস্পন্দতা, নিস্তব্ধতা। ঝিঁঝিপোকার ডাক হঠাৎ থেমে গেল।

আমি সচকিত হলাম। ঘরের দরজায় কে যেন হঠাৎ জোরে জোরে কড়া নাড়ছে। জোর কণ্ঠস্বর 'এই দরজা খোল' 'দরজা খোল'। প্রশ্ন করলাম, এত রাতে কে? উত্তরে বললো, তোর যম, দরজা খোল। জানালার ওপাশ থেকে একজন বলে উঠলো, 'এই দেখ, তোর দিকে অস্ত্র তাক করে রেখেছি, দরজা খোল, নইলে গুলি করলাম।' আমি দরজার কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম, বাধ্য হয়ে দরজা খুললাম। একজন এসে আমার বুকে অস্ত্র ধরলো। অন্যজন বলতে থাকলো, 'অমুক অমুক জমির কাগজপত্র, দলিল কোথায় আছে এখনই বের করে আমার হাতে দে।' কিছুক্ষণ তর্ক করলাম। দেখলাম, কোনো লাভ হচ্ছে না। ছোট্ট একটা বাক্সে কাগজ রাখা। আলমারির উপর থেকে পাড়তেই পুরোটা হাত থেকে কেড়ে নিল। এবার বললো, 'তোকে এখনি এক লাখ টাকা দিতে হবে। টাকা বের কর। নইলে গুলি করলাম। আমরা প্রয়োজনে তোকে মাঠে নিয়ে যাব।' আমার গায়ে গেঞ্জি, ঘেমে ভিজে চপচপে হয়ে গেছে। এতক্ষণে মা অন্য ঘর থেকে আমার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো। মা বারবার বলছে, 'বাবা, তোমরা তো জানো– আমার ছেলে কারো সাতে-পাঁচে থাকে না, ও নির্দোষ। ওর কোনো ক্ষতি তোমরা করো না। কী দোষে তোমরা তাকে মারবা?' আমার কাছে কোনো টাকা নেই। কোথা থেকে দেবো! ওরা আমাকে ধরে বাইরে বের করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। ধস্তাধস্তি চলছে। মা তাদের মধ্যে নেতা-মার্কা একজনের পা ধরে পড়ে আছে। আমার মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি এলো। বললাম, আগামীকাল সকাল দশ-এগারোটা নাগাদ আপনাদের টাকা আমি জোগাড় করে দেবো। ভাবলাম, রাতটা অন্তত রক্ষা পাই কীনা দেখি। যে লোকটা বেশি কথা বলছিলো, মা তার পা ধরে পড়েই আছে। একজন বললো, আমরা গণবাহিনীর লোক। আমাদের হাত থেকে তুই কোনোভাবেই নিস্তার পাবিনে। তোর বাপদের জানালে তোকে মরতে হবে। আমরা কাল সকালে আবার আসবো। মার কাছ থেকে পা ছাড়িয়ে নিয়ে জমির সব কাগজগুলো নিয়ে ওরা চলে গেল।

ভোর না হতেই আমি ভাইসাহেবের বাড়িতে লোক পাঠালাম, হাতে যা টাকা-পয়সা আছে সাথে করে নিয়ে আসতে বললাম। তাঁর কাছে বিশ হাজার টাকা ছিল। উনি হাতে নিয়ে সাথে সাথে চলে এলেন। ভোরে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে অনেক কান্নাকাটি করলাম। তারপর বাড়ি ফিরে অসহায়ের মতো ঘরে বসে

আছি। ভাইসাহেবকে পুরো ঘটনা খুলে বলছি। বাড়ির পাশে একজনের কাছ থেকে আরো দশ হাজার টাকা পাওয়া গেল। কেউ ঘরে, কেউ ঘরের সামনের বারান্দায় বসে আলোচনা চলছে। 'মহারথীরা' এলেন। সংখ্যায় ছয়-সাত জন। সবার হাতে অস্ত্র। আমি ভাইসাহেবের পাশে বসে আছি। তারা বাড়ির চারপাশে অস্ত্র উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। একজন আমাকে জোর করে ঘর থেকে মাঠের দিকে নেওয়ার চেষ্টা করছে। আমাকে বাড়ির বাইরে বের করে ফেলেছে। তারা আমাকে নিয়ে দ্রুত সরে পড়তে চাচ্ছে। মা কেবল পিছ পিছ কান্নাকাটি করতে করতে আসছে। ভাইসাহেব হতভম্ব হয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। নানি চিৎকার করে বলে উঠলো, 'ও মজনু, ছেলেকে যে নিয়ে চলে গেল, তুমি সাথে যাও।' বাড়ির অল্প কিছু দূরেই খালপাড়। তাদের একজন বললো, 'টাকা দিলে খাল পাড়ে আয়।' কিছুদূর গিয়ে ভাইসাহেব বললেন, 'ও এখানে দাঁড়িয়ে থাক, টাকা নিয়ে আমি খালপাড়ে আসছি।' তারা তা মানছে না। সামনে থেকে একজন ভদ্রলোক সাইকেল চড়ে বাঁক ঘুরে আসছেন। ভাইসাহেবকে দেখে সাইকেল থেকে নামলেন। বললেন, 'কী রে কেমন আছিস, এখানে কেন?' 'কেমন আর থাকবো, এই দেখ, আমার এই ছোট ভাইকে ঐ লোকগুলো খালপাড়ে মারতে নিয়ে যাচ্ছে, এক লাখ টাকাও দাবি করেছে।'

মহারথীগুলো হয়তো সাইকেলওয়ালাকে দেখেই আমাকে ছেড়ে খালপাড়ের দিকে দ্রুত চলে যাচ্ছিল। ভদ্রলোক বললেন, 'কোনো ভয় নেই। ওদের মধ্যে ঐ-ই নেতা, আমার ছোট ভাই। ওকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। ওকে ধরার জন্য রক্ষীবাহিনী আমাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিচ্ছে। আমরা ওকে নিয়ে খুব অসুবিধার মধ্যে আছি। আমি ওকে খুঁজতে এসেছি। ওকে আমি রক্ষীবাহিনীর হাতে তুলে দিয়ে অত্যাচার থেকে বাঁচতে চাই। ও আমাদের বংশের কুলাঙ্গার।' উনি ভাইসাহেবকে বাড়ি ফিরে যেতে বলে খালপাড়ের দিকে সাইকেল নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। পরে শুনলাম, উনি এক বনেদি ঘরের সুশিক্ষিত লোক। বাড়ি অনেক দূর। ভাইসাহেবের সাথে বিভিন্ন দলে ফুটবল খেলে বেড়াতেন। ফুটবল খেলার বন্ধু। সেদিন ভাইসাহেবের অছিলায় রক্ষা পেয়েছিলাম। তাঁর ভাইকে ঐদিন ধরে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন কিনা জানিনে। পরদিন রাতে আমাদের বাড়ি আবার ঘেরাও করে আমার প্রতিশোধ নিতে 'মহারাজা'রা চেয়েছিল। আমি রান্নাঘরে খাচ্ছিলাম।

পিছন দিক দিয়ে অন্যভাবে পালিয়ে পাশের নাটাবনে সে রাতের মতো আশ্রয় নিয়ে নাটাবনের কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে বেঁচেছিলাম। সে ভিন্ন বৃত্তান্ত। কয়েক দিনের মধ্যে আখ-সেন্টার থেকে লুট করা টাকা ভাগাভাগি নিয়ে মহারথীদের মধ্যে বিভেদের জেরে প্রধান মহারথীকে গুলি খেয়ে রেললাইনের উপর পড়ে থাকতে হলো। পুলিশ লাশ কুড়িয়ে এনে মরাকাটা ঘরে ময়নাতদন্তের জন্য রেখে দিলো। খরব পেলাম। কলেজ থেকে মরাকাটা ঘরে মহারথীকে ইচ্ছে করেই দেখতে গেলাম। মহারথী চিৎ হয়ে নিঃসাড়, নিঃসম্বল অবস্থায় শুয়ে আছে। আমাকে আর অস্ত্র দিয়ে গুলি করতে চাইলো না। আমি নীরবে বেরিয়ে নিজের পথে চলে গেলাম। কৈশোর জীবনে রক্ষীবাহিনী, গণবাহিনী ও পরবাহিনীর মতো কতো যে ভুঁইফোড় বাহিনীর নির্বিশেষ অত্যাচার, ব্যথাজাগানিয়া ঐ-সব অনেক ঘটনা এবং জীবনের মায়া আমাকে আজীবন ঘরছাড়া ও ছন্নছাড়া করেছে, যা স্মৃতির মিনারে চিরজাগরূক। তবে আমার জীবদ্দশায় যতদিন স্মৃতিভ্রষ্ট না হই, ভাইসাহেবকে ভোলার নয়। ভাইসাহেব নামটাও ব্যথা ও বিপদের স্মৃতিজাগানিয়া জীবনসাথী।

চার

আটষট্টি সালের শেষের দিকে তাঁর সাথে আমার সখ্য। মা শিখিয়ে দিয়েছিলেন, শুধু ভাই নয়, সম্মান করে ভাইসাহেব বলতে। আজীবন এই চলছে। যুদ্ধের পর আমি তাঁর বাড়িতে থেকে কলেজে পড়েছি। তিনিও ছিলেন একজন ভালো ফুটবলার। শারীরিক গঠনে পুরো ফিট, পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা। একদিনের ঘটনা বলি। আমি তাঁর বাড়িতে গেছি। রাতে দু-জনে ঘরের দরজা খোলা রেখে খাটে আড়াআড়ি শুয়ে কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়েছি। উনি স্বপ্নে ফুটবল খেলছেন। উনি বরাবরই ডিফেন্সে খেলতেন। বল চলে আসছে। জোরে কিক্ না করতে পারলেই গোল হয়ে যাবে। উপায় নেই, শুয়েই মেরে দিলেন জোরে এক কিক্। দরজার পাল্লায় খুব জোরে শব্দ হলো। পায়ের পাতার উপরের ভাগ কেটে রক্ত ঝরছে। তখন ঐ রাতে চিকিৎসার আয়োজন।

তাঁর ছিল বই কেনার অভ্যাস। তিনি প্রচুর বই কিনতেন এবং পড়তেন। তাঁর কাছে থেকে আমারও বই পড়ার হাতে খড়ি। তাঁর একটা পারিবারিক লাইব্রেরি ছিল।

গ্রামের অনেকেই ঐ লাইব্রেরির সদস্য ছিলেন। তিনি সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ করতেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর একটা হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেছিলেন। আট-দশ বছর শিক্ষকতা করেছেন। পরে কী কারণে জানিনে, ঐ স্কুলের শিক্ষকতা বাদ দিয়েছিলেন। তিনি নীতিতে ছিলেন অনড়। নীতির ক্ষেত্রে কোনো আপস করতেন না। এ নৈতিকতা তাঁর চলার পথে অনেক কষ্টের কারণ হয়েছে বলে আমি জানি।

যুদ্ধের পর থেকে আমি কিছু-না-কিছু লেখালেখির চেষ্টা করতাম। উনি সেগুলো কারেকশন করে দিতেন। বেশ কিছু লেখকের বই হাতে দিয়ে এগুলো পড়তে বলতেন। তাঁর সহযোগিতায় আমি সে বয়সে শেক্সপিয়রের বেশ কিছু বই পড়েছিলাম। তিনি ভারতীয় কিছু লেখকের বইও আমাকে দিয়ে পড়িয়েছিলেন। পরবর্তীকলে আমি তার লাইব্রেরির প্রায় সব বই-ই পড়েছিলাম। ইংরেজি গ্রামার এবং ট্র্যান্সলেইশন শেখাও তার হাত ধরে। বিভিন্ন গ্রামার বইয়ের শেষে দেওয়া অসংখ্য ট্র্যান্সলেইশন অধ্যায় উনি আমাকে দিয়ে করিয়েছিলেন। সেগুলো নিজ হাতে আমাকে সামনে নিয়ে বসিয়ে কারেকশন করে দিতেন। আমার কলেজের অধ্যাপক আব্দুল কাদের স্যারের সাথে তাঁর বেশ সখ্য ছিল। বাসায় নিয়মিত যাতায়াত ছিল। এ পরিচয়ের জোরেই আব্দুল কাদের স্যার আমার লেখালেখিতে অনেক সাহায্য করেছেন। কলেজ জীবনে আব্দুল কাদের স্যার আমার লেখা নিয়ে আলোচনার আসর বসাতেন। তার জন্য আমি আব্দুল কাদের স্যারের কাছে যেমন ঋণী, তেমনি ঋণী ভাইসাহেবের কাছে।

তিনি ছিলেন রক্ষীবাহিনীর অত্যাচার থেকে আমার বাঁচার রক্ষাকবচ। তাঁর সাথে, সে-সময়ে মহকুমা পর্যায়ে বাকশালের যত নেতা ছিলেন, তাঁদের সখ্য ছিল। তিনিও ছিলেন গণবাহিনীর টার্গেট। আমিও তাই। আমি কোনো রাজনীতির সাথে জড়িত না থাকলেও। গণবাহিনী ও রক্ষীবাহিনী গঠিত হবার কিছু দিনের মধ্যেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কারণ পলিসি তৈরি হয় ঢাকায় চার দেয়ালের মধ্যে বসে এবং বাস্তবায়ন হয় গ্রামে, গঞ্জে– বিকৃত ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের পথে। ফলে কার সাথে কার জমি নিয়ে গোলযোগ, মাতব্বরি নিয়ে বিভেদ, নারীঘটিত সমস্যা, বিবি

তালাকজনিত শত্রুতা– এগুলোই সেখানে প্রাধান্য পায়। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব পরোক্ষ রূপ নেয়। আমার ছিল জমিজমা নিয়ে বিভেদ। বিপক্ষ দল বিভিন্ন তরিকা ধরে আমাকে যে কোনো প্রকারে গায়েব করার ফন্দি-ফিকির ও কুমতলব আঁটতো। আমি ছিলাম ষড়যন্ত্রের শিকার। আমার জমিজমা-বিরোধী পক্ষের কারণে রক্ষীবাহিনীর অত্যাচার প্রথম দিকে অনেক ভোগ করলেও ভাইসাহেব এবং আমাদের ইউনিয়নের তৎকালীন চেয়ারম্যান হাল ধরাতে আর অত্যাচারিত কিংবা গায়েব হতে হয়নি। কিন্তু নানা কিসিমের গণবাহিনীর অত্যাচার আমাকে ছন্নছাড়া করে ছেড়েছে। বিরুদ্ধ পক্ষ মুজিববাদে ঢুকে রক্ষীবাহিনীকে দিয়ে আমাকে ক্ষতি করতে চেষ্টা করাতে শেষমেষ ভাইসাহেবের বাড়িতে বেশ কয়েক মাস থাকতে হয়েছিল। প্রকৃতির প্রতিশোধ এটাই যে, রক্ষীবাহিনীর হোতাই হোক, আর গণবাহিনীর হোতাই হোক, কেউই বেশিদিন টিকতে পারেনি। সব ওঝাকেই পোষা সাপের ছোবলে ভবলীলা সাঙ্গ করতে হয়েছে। আমি আজো টিকে আছি। এটাই প্রকৃতির প্রতিশোধ।

ভাইসাহেবের ঘরের সামনে রোয়াক। রোয়াকে দরজার পাশেই একটা হাতলওয়ালা চেয়ার পাতা থাকতো। তিনি অবসর সময়ে ঐ চেয়ারেই বসতেন। তাঁর শেষ বয়সে এসে দেখেছি, আমি তাঁর সাথে দেখা করতে যাব, শুনেছেন। আমি গিয়ে দেখেছি, তিনি ঐ চেয়ারটাতেই বসে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। বর্তমানে আমি যে দেশে, যে বেশেই থাকি, ঐ গ্রামের ঐ বাড়ির দিকে দৃষ্টি দিলেই দেখি, ভাইসাহেব চেয়ারে উপবিষ্ট, আমার জন্য অপেক্ষমাণ। আমাকে আজীবন তিনি বুড়ো বলে ডাকাতেন। শব্দটা তিনি আমার আরেক ভাইয়ের কাছ থেকে হাওলাত নিয়েছিলেন। আমি বড় হবার পর থেকে তাঁর সাংসারিক যত পরামর্শ, আমার সাথে। তাঁর মনের গভীরের যত কথা, আমার কাছে। আমিও তার কাছে মনের কথাটা বলে শান্তি পেতাম। বিপদে পাশে পেতাম। খবর পাঠালেই চলে আসতেন। তাঁর জীবনে সফলতা কম। তিনি আজীবন প্রতিকূল পরিবেশ ও বৈরী পরিস্থিতির মোকাবিলা করে গেছেন। তিনি সুখের সন্ধান করেছেন। কিন্তু সুখপাখি তার হাতে কোনো দিনই ধরা দেয়নি। ছেলেমেয়েগুলোকে ঠিকমতো লেখাপড়া শেখাতে পারেননি। পরিণামে ফল তাঁকেই ভোগ করতে হচ্ছিলো। হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন। আমি তাঁর মৃত মুখখানা দেখতে যেতে পারিনি। আমার বিশ্বাস, তিনি পরপারে শান্তিতে আছেন।

পাঁচ

আমি জন্মেই যার কোলে প্রথম চড়েছি তিনি আমার আরেক ভাই। ইনি ভাইসাহেব নন, শুধু ভাই। অনেকের কাছেই তিনি 'বাদল' নামে পরিচিত। কিন্তু আমার ভাই। তিনি আজীবন তাঁর ছেলেমেয়ের তুলনায় আমাকে বেশি ভালোবেসে গেছেন। এটাই আমার বিশ্বাস। তিনি জমিদার বাড়ির ছেলে। তাঁর বাপ-দাদা হাতিতে চড়ে চলেছেন। তিনি চলেছেন সাধারণ মানুষের মতো। তবে তার চিন্তাধারাটা ছিল জমিদারের মতো। তাঁর চক্ষুলজ্জা ছিল বেশি। কারো কোনো অনুরোধে না বলতে পারতেন না। নিজের কষ্ট হলেও না। তিনি উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। আজীবন অবৈষয়িক; সংসার উদাসী। সংসারের বেড়াজাল কোনোদিন তাঁকে আকৃষ্ট করতো না। তিনি স্বাধীনভাবে চলতে চাইতেন। খোলা হাত– টাকা পকেটে যা থাকে সবটুকুই খরচ করতে চাইতেন। হাসি-ঠাট্টা, খেলাধুলা, গান-বাজনা, আমোদ-প্রমোদ বেশি পছন্দ করতেন। কেতাদুরস্ত পোশাক তার প্রিয়।

আমি তার কোলেপিঠে চড়ে বড় হয়েছি। ছোটবেলা থেকেই তাঁর পিছলাগা ছিলাম। তিনি আমার যত প্রকার খেলনা দরকার সব কিনে দিয়েছিলেন। আমার শখ-আহ্লাদ, বায়না সব তার কাছে। একটু বড় হলে মার্বেল খেলতাম, বাজার থেকে বিভিন্ন রং ও ডিজাইনের মার্বেল এনে দিতেন। অনেক ছেলেকেই মাঠে ঘুড়ি উড়াতে দেখতাম। আমারও শখ ঘুড়ি উড়ানোর। তিনি অনেকবার ঘুড়ি তৈরি করে দিয়েছেন। আমাকে সাথে নিয়ে মাঠে গিয়ে ঘুড়ি উড়িয়েছেন। ঘুড়ি তৈরি করা শিখিয়েছেন। পর্যাপ্ত সুতো বাজার থেকে কিনে এনে দিয়েছেন। ছোটবেলায় জামা-জুতো যা পরেছি– প্রায় সবই তাঁর কেনা। তিনি আমাকে সাইকেলের সামনে বসিয়ে বাইশ কিলোমিটার দূরে গিয়ে আমার মাপমতো জামা তৈরি করিয়ে দিয়েছেন। আমি রাতেও মাকে ছেড়ে তার কাছে শোয়ার জন্য কান্নাকাটি করতাম। তিনি যেখানেই যেতেন, ছোটবেলায় আমি তাঁর সাথে থাকতাম। আমি আব্বার একমাত্র ছেলে। তাই পৃথিবীতে যাকেই পাই, ভাইয়ের মতো পাই। ছোটবেলা থেকেই আমার নাম তার কাছে 'বুড়ো'। আব্বা একটা বড় বাজারের কাছে বড় একটা জমি কিনবেন। তিনি আগেই বললেন, এটা কিন্তু বুড়োর নামে কিনতে হবে।

তিনি আমার ছোট চাচার সাথে হ্যাট-বুট পরা বন্দুক হাতে বিলে পাখি মারার সঙ্গী। ছোট চাচা বিদেশ থেকে বাড়ি এলেই তিনি তাঁর সার্বক্ষণিক সহকারী। হুইল, ছিপ এবং খেপলা জাল দিয়ে মাছ ধরা তার শখ। তিনি মাছ ধরতে যেতেন। আমি তার সঙ্গী। তাঁর বাড়ির পাশ দিয়ে নদী বয়ে গেছে। তিনি শৌখিন মাছ-শিকারি ছিলেন। আমি তাঁর ওখানে গেলে তাঁর মাছ ধরার সঙ্গী হতাম। দিনের পর দিন তাঁর বাড়িতে কাটিয়েছি। মা-বাপ নিশ্চিন্ত, বাদলের কাছে আছে। তাঁর সব কিছুতেই 'বুড়ো'র অধিকার বেশি। তাঁর অনেক গুণের মধ্যে একটা হলো- যে কোনো পরিবেশে, যে কোনো লোককে অল্প সময়ে সহজে আপন করে নিতে পারতেন। বাচ্চাদের কাছে খুব প্রিয় ছিলেন। তাঁর সাথে আমার আন্তরিকতা কোনো মাপকাঠি দিয়েই পরিমাপ করা সম্ভব নয়। আমি বড় হলেও আমাকে নিয়ে কোনো ভালো চিন্তা করলে তিনিই প্রথম করতেন। আমাকে নিয়ে গর্ববোধ করতেন। তিনি ছাড়া আমার জীবন অসম্পূর্ণ, অচল বলে মনে হতো। যখন সময় করে উঠতেন, আমার কাছে ঢাকায় চলে আসতেন। আমার কাছে থেকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। আমিও তাকে কাছে রাখতে পেরে তৃপ্তি পেতাম। মাঝে মধ্যে বলতেন, 'যে ক'টা দিন বাঁচি, তোর কাছেই থাকবো, তোকে ছেড়ে আর কোথাও যাবো না'। আমার ছেলে-মেয়ে-বউ সবাই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট, আমার সংসারেরই একজন তিনি। আমি গ্রামে না থাকলেও বাড়ির অসমাপ্ত কাজ গুছিয়ে দিয়ে আসতেন। কোনো কিছু হলে সংসার, ছেলে-মেয়ে ছেড়ে আমার কাছে হাজির হতেন। আমি ছিলাম তাঁর শেষ আশ্রয়। তাঁর বিশ্বাস ছিলো, শরীর যত খারাপই হোক বুড়োর কাছে যেতে পারলেই সব ভালো হয়ে যাবে।

বয়স ষাট পেরোলে হঠাৎ ব্রেইন স্ট্রোক করলো। দু-তিন বছর ভালো ডাক্তারের সান্নিধ্যে একনাগাড়ে ওষুধ খাওয়ার পর অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠলেন। আমার কাছে মাসের পর মাস থেকেছেন, শান্তিতে থেকেছেন। আমার স্ত্রী তাঁকে নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়েছেন ও ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছেন। তাঁর দিকে তাকালেই আমার ছোটবেলার স্মৃতি, তার পিঠে চড়ার স্মৃতি মনে পড়তো। বাড়িতে থাকলেও শারীরিকভাবে যখন যা বোধ করবেন, আমাকে নিয়মিত খোঁজ দেবেন।

অসুস্থ বোধ করলে বার বার ফোন করবেন। আমার এবং আমার স্ত্রীর উপর এতটাই নির্ভর হয়ে গিয়েছিলেন যে, ভাবতেন আমাদেরকে জানাতে পারলেই তাঁর রোগ ভালো হয়ে যাবে। আমার বাড়ি যাবার কথা শুনলেই লাঠি ভর দিতে দিতে সিঁড়ি বেয়ে কষ্ট করে তিনতলায় উঠতেন। আমাকে না বলেই উঠতেন। দরজা পর্যন্ত এসেই নক করতেন। আমি কিংবা আমার স্ত্রী হাতটা ধরে ভিতরে নিয়ে আসতাম। সোফায় বসে তিনি কেমন যেন একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ছাড়তেন। তার সমস্ত তৃপ্তি যেন আমাদের মুখ দেখে পেয়ে গেছেন। আমি যে কদিন থাকতাম তাকে কাছে রাখার চেষ্টা করতাম। শরীরটা একটু ভালো লাগলে বাড়ি থেকে এটা-ওটা নিয়ে আমার বাড়িতে হাজির হতেন। আমার পাশে বসে আমার গায়ে-মাথায় হাত বুলাতেন। বলতেন, 'তোর শরীরটা এত খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেন? কী এমন এতো চিন্তা করিস, আমাকে একটু বলতো? আমি তাঁর শরীরের কথা জিজ্ঞাস করলে বলতেন, শরীরটা এত ভালো নেই-রে, আর কত?' আমার সাথে ঢাকায় আসতে বললে বলতেন, 'তুই যা, আমি কয়েক দিনের মধ্যে চলে আসছি।' আমি বুঝতাম, সত্যি সত্যি তাঁর দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে। শেষের দিকে এসে তাঁর গ্রামের বাড়ি থেকে রিক্সাভ্যানে চড়ে আমার বাড়ি আসতেন। তিনতলায় উঠতে তাঁর বেশ কষ্ট হতো। ঘরের প্রধান দরজা থেকে ড্রইং রুমে বসার চেয়ার পর্যন্ত যেতে বিশ-পঁচিশ ফুট জায়গা। পা-টা ঠিকমতো ফেলে গিয়ে সোফায় বসতে পারতেন না। হাঁপিয়ে উঠতেন। লাঠিতে ভর দিয়ে ফাঁকা ফাঁকা পা ফেলতেন। হাতটা কাঁপতো। আমি প্রায়ই হাত ধরে নিয়ে বসাতাম। আমি তাঁর চেহারা, চুল, হাঁটার গতি গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখতাম। যুবক বয়সের সেই মাথাভরা কোকড়ানো চুল, সুডৌল চেহারা, পেটা শরীর, ফুটবল মাঠে বল নিয়ে আগে আগে ছোটা– সে দিনগুলোর ছবির সাথে মেলাতাম, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনের কথা মনেই রাখতাম। সাইকেল চালিয়ে আমাকে সামনে চড়িয়ে নিয়ে মহকুমা শহরে বাইশ কিলোমিটার পথ যেতেন, আবার আসতেন। আমার কাজ বললে তাঁর কোনো ওজর বা ক্লান্তি থাকত না– সেটা ভাবতাম। আমার ওখানে দিন শেষে কিংবা একদিন পর আমার বাড়ি থেকে কাঁপতে কাঁপতে নেমে আবার নিজের ঠিকানায় চলে যেতেন। জীবনে যেখানেই যাই, তাঁর সেই লাঠি ভর দেওয়া কাঁপা হাত, হাসি মুখ আমার দু-চোখে ভাসে। মাঝে-মধ্যে ভাবি, আমারও তো যাবার

সময় এসেছে, চোখ জোড়া অপারেশন করে নতুন চোখ লাগালে হয়তো ঐ-সব ছবি হারিয়ে যাবে, স্মৃতির দহন থেকে রক্ষা পাবো।

আমার আর একটা ভাই আছে। বয়সে আমার কিছু ছোট। নাম ধরে ডাকি। আশা আছে, তাকে দুনিয়াতে রেখেই আমি বিদায় নিতে পারবো। সে-ও শিক্ষক, তাকে নিয়েও আমার অনেক স্মৃতি– সে আমার মনের অনুষঙ্গী। সুখ-দুঃখে তাকে নিয়ে আমার পৃথিবী। তার কষ্টে আমি দুঃখ অনুভব করি।

এতগুলো ভাই যার, সে কি নিঃস্ব হতে পারে? আমি ছিলাম বেশ সমৃদ্ধ। আমার মনের মধ্যে প্রতিনিয়ত মনের মানুষের রমরমা বাজার বসতো। ক্রমশই আমি নিঃসঙ্গ হতে চলেছি। যেদিকে তাকায় শূন্যতা, আর শূন্যতা, হাহাকার ধ্বনি, কোথাও কেউ নেই– শুধু আমি একা। কোটি কোটি লোকের সমাবেশের মধ্যে আমি সাথীহারা একা। শেষ দিনটার জন্য অপেক্ষা করছি। যাঁদের মনের ভাষা হৃদয় দিয়ে বুঝতাম, তাঁরা কোথায় যেন একে একে একা-একা হারিয়ে গেলো। চলে গেলো আমাকে ফেলে। আমার মনের ভাষা বোঝার মতো লোক এখন আর নেই। আমি দলছুট নিরম্বু মরুময় জনমানবহীন পথের পথিক। যেদিকে চেয়ে দেখি, ধু-ধু বালির নিষ্ফলা বিরাণ প্রান্তর। দূর থেকে আমার দিকে অন্ধকার ক্রমশই ধেয়ে আসছে, পাশে কেউ নেই।

চাকরি পাবার পর থেকে ঈদের খুশি ভাগ করে নেওয়ার আনন্দে প্রত্যেক ভাইয়ের জন্য– কারো পাজামা-পাঞ্জাবি, কারো-বা শার্ট-প্যান্ট প্রতিবার কিনতাম। তাঁদেরকে সেগুলো সময়মতো পৌঁছে দিয়ে কী যে নির্মল আনন্দ পেতাম– অনভিব্যক্ত, অভাবনীয়। তাঁদের কেউ কেউ বলতেন– বুড়ো, এত পাগলামি করিস কেন, বলতো? আমি নীরব থাকতাম। একবার এক সেট কম কিনতে হলো। মাস্টারকে দিয়েই সে-কেনায় প্রথম কমতি হলো। সেবার কিনতে গিয়ে খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। দেখতে দেখতে কেনা কমা শুরু হলো। এখন নেই বললেই চলে। এখন ঈদ এলেই মনটা খুব খারাপ হয়ে থাকে। কী ভাবি, নিজেই জানিনে! এখন বিপদ এলে কাউকে জানিয়ে তৃপ্তি পাবো– এমন লোক নেই। আমার সাজানো বাগান, কীভাবে যে কয়েকটা বছরের মধ্যে উৎসন্ন হয়ে গেল, কল্পনাতীত! পুঁতির

মালা বাঁধা ডোর খুলে এক-নিমিষে যার যার পথে কীভাবে যে পালিয়ে চলে গেল! অভাবিত! ডানে-বামে আনমনে না-দেখে তাকিয়ে ভাবি, পাশে কেউ আছে। ফিরে তাকিয়ে দেখি আসলেই কেউ নেই। চোখ মুদে এলে দেখি আমার ভাইদের সাথে নিয়ে আমি বিভিন্ন কাজে মহাব্যস্ত। তাঁদের সাথে চলছি-ফিরছি, কখনো হাসছি, কখনো খেলছি। ডাক্তারকে বলে হোমিও ওষুধ খেয়েছি– কাজ হয়নি। চোখ খুললেই যত অন্ধকার। আমার জগতে আমি, স্মৃতির হাহাকার। সুতোর বাঁধন মিছে, কেবলই নিঃসঙ্গ আমি একা।

একটা কাজ আমি ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় করেছি। কারো মৃত-নিষ্পলক-প্রাণহীন মুখের দিকে আমি তাকাইনি। তাকাইনি তাদের কবরের দিকে। ঐ দুঃসহ স্মৃতিটা আমার দৃষ্টির অন্তরালে রেখেছি। এতে আমার সুবিধে অনেক। যখনই মনে হয় তাঁদের হাসিমাখা, স্নিগ্ধ- সতেজ জীবন্ত মুখ হৃদয়পটে ভাসে। আমার ভালো লাগে।

তাঁরা কবরে শান্তিতে ঘুমাচ্ছে। আমি জেগে আছি তাঁদের কর্মময় জীবনে আমার সাহচর্যের প্রতিটা মুহূর্তকে যতদিন পারি স্মৃতির মুকুরে ধরে রাখার জন্য। বেঁচে আছি, শোকগাথার মাধ্যমে হাহুতাশ, আহাজারি, আর শোকোচ্ছ্বাস করে জীবন অতিবাহিত করার জন্য। জানিনে, আর কতদিন আমার বিদেহী ভাইদের হারানো অতীত আমাকে এভাবে নীরবে নিভৃতে কুরে কুরে খাবে! শুধু বলি, 'আমি অপার হয়ে বসি আছি, ওহে দয়াময়– পারে লয়ে যাও আমায়–।'

(পল্লবী, ঢাকা: ৬.১১.২০২০)

শাপশাপান্ত

আপনি তো পাঁচ বছর যাবৎ অবসর জীবনযাপন করছেন, শেষ জীবনের চাওয়া-পাওয়া ও বিপত্তি নিয়ে আপনার অভিব্যক্তি ও অনুভূতি কী? সুজন ভাই, আপনার মনের কথাটা খোলাখুলি বলুন। মিনহাজ সাহেব চটপট একটা প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন সুজন সাহেবের দিকে। মিনহাজ সাহেবও অবসরপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তা। দুই বছর আগে সরকারি কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসরে গেছেন। তিনি সুজন সাহেবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যদিও বয়সে তিন বছরের ছোট। অনেক দিন পর আড্ডা দিতে দুই পরিবার একসাথে হয়েছেন। দুপুরের খাবার শেষ। এখন আড্ডা শুরু। –জীবনের কিছু কিছু বিষয় থাকে কোনোদিনও প্রকাশ করা যায় না। আবার কিছু বিষয় বন্ধুর কাছে প্রকাশ করা যায়, স্ত্রীর সামনে বলা যায় না। আপনার ভাবী যেহেতু এখানে আছে এবং আমাদের কথা শুনছে, তাই আপনার এ প্রশ্নের উত্তর, আমার নিজের ক্ষেত্রে যেটা প্রযোজ্য, সেটা উহ্য থাক। অন্য সময় আপনাকে একাকী বলবো। সুজন সাহেব এভাবেই হেসে উত্তর দিলেন।

মিনহাজ সাহেব গল্প শুরু করলেন: আমাদের কলেজের এক ভদ্রলোক, খুব রগুড়ে–রংতামাশা করে কথা বলাতে ওস্তাদ। অবসরে যান যান অবস্থা। বাড়িতে ভাবীর সাথে সম্পর্ক খুব একটা ভালো নয়। ভাবী তাঁর জন্য সময় দিতে চান না। সবসময় ছেলে-মেয়ে, নাতি, সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। ভদ্রলোককে ব্যক্তিত্বহীন, গুরুত্বহীন একজন লোক বলে গণ্য করেন। কলেজ শেষে বাসায় ফিরলে ঘরেও আসেন না। এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে চান। খাবার টেবিলে খাবার থাকলে ভদ্রলোক তা নিজের মতো খেয়ে শিক্ষকতা সম্পর্কিত কাজকর্ম ঘরে বসে করেন। সময়মতো ঘুমাতে চলে যান। খেলেন, কী খেলেন না, ভাবী কোনোদিন তা খোঁজখবর নেন না। এভাবেই দিন কেটে যাচ্ছে। বাসায় সাপ্তাহিক কোনো খাবারের আয়োজনেও ভদ্রলোকের গুরুত্ব কম। সবাই খাবার পর কিছু অবশিষ্ট থাকলে উনি পান, না থাকলে নাই। বাছা বাছা খাবারের স্বাদ থেকে তিনি অনেক বছরই বঞ্চিত। ভদ্রলোক এসব দিক ততোটা লক্ষ করেন না। গোলেমালে জীবনটা কাটিয়ে দিতে

চান। যার হাতে তার বরাত, সে-ই যদি তাকে উপেক্ষার চোখে দেখে, তাহলে এই ভবসংসারে ঐ গৃহকর্তার আর কোথাও যাবার জায়গা থাকে না। কাউকে এ অবহেলা বলাও যায় না। ঘাটের মরা হয়ে জীবন কাটানো ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না। অন্যের গলগ্রহ হয়ে টিকে থাকতে হয়। ভদ্রলোক একদিন তাঁর সংসারে তাঁর প্রতি অবহেলার কথা আমাকে বললেন–

একদিন এক বাটি দুধ হাতে করে এনে গিন্নি তাঁকে বললেন– নাও এটা, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও তো, আমার ওদিকে কাজ আছে, চলে যাব। অনেক দিন পর পাওয়া, আদর করে দেওয়া দুধটা উনি ঢক ঢক করে নিমিষে খেলেন। একটু বেআক্কেল গোছের লোক হলে যা হয় আর কী! পরক্ষণেই মনে হলো, এতো আদর করে গিন্নি তো অনেক বছর আমাকে কিছু দেয় না। হঠাৎ এত আদর কেন? নিশ্চয়ই কোনো দাবি-দাওয়া আছে। গিন্নিকে ডেকে পাশে বসালেন। বললেন, আচ্ছা তুমি তো অনেক বছর হলো, এত আদর করে আমাকে কিছু খেতে দাও না। কী হয়েছে বলো তো? সত্যি করে আমার গা ছুঁয়ে বলো। গিন্নি কথা টেনে টেনে গা না-ছুঁয়ে বললেন– 'না, তেমন কিছু না। বলছিলাম কি– ঐ বিড়ালে দুধটা চাটোলো। ভাবছিলাম, দুধটা ফেলেই দেবোনে, ঐ লোকটা যখন বাসায় থাকে, খেয়ে রাখুক। তাই তোমাকে দিলাম।'

সবাই হো হো করে হাসলেন।

সুজন মাস্টার বললেন, ঐ ভদ্রলোক হয়তো কথাটা হজম না করতে পেরে আপনাকে বলে ফেলেছেন। আসলে সমাজে ঐ ভদ্রলোকের অবস্থার সাথে অনেকেরই মিল আছে। কিল খেয়ে কিল হজম করে চলতে হয়। নারী নির্যাতনের কথা তো আমরা হরহামেশা শুনি, পুরুষকে উপেক্ষা ও নির্যাতনের কথা তো খবরে আসে না। নিশ্চয়ই এরা অনেক কিছু হজম করে, লোকলজ্জার ভয়ে বিষয়গুলো চেপে যায়। নিজে ভোগে, কাউকে বলে না। পরিস্থিতি খারাপ হয়, যদি বয়সটা আরেকটু বেশি হয়। আরো খারাপ হয় যদি বিড়ালে চাটা দুধটা দেওয়ার লোকটাও দুনিয়া ছাড়েন। কেন, ঐ যে আমাদের সাথে এক অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল সাহেব চাকরি করতেন না? উনি ছিলেন খুব সুরসিক। তাঁর বয়সও ছিল অনেক বেশি। তিনি

বলতেন, 'আমার সামনে আসছে শকুনের জীবন। তখন চলচ্ছক্তিও তেমন আর থাকবে না, কেউ আমার পাশে আসতে চাইবে না। অন্যের হাতের দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকতে হবে। কেউ যদি দয়া করে কিছু দেয়, ভালো– নইলে উপোস থেকেই সময় পার করতে হবে। এমন জীবন আসার আগে বিদায় নেওয়া অনেক ভালো।'

শেষ জীবনটা অনেকেরই ভালো যায় না। চাকরিজীবীরা কেউ কেউ শেষ বয়সের জন্য কিছু সঞ্চয় করেন। গ্রামে-গঞ্জের সাধারণ মানুষ তাও পারে না। 'ওল্ড হোম'-এর ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। গ্রামে-গঞ্জেও ধারণাটা নেই। দেশও 'কল্যাণরাষ্ট্র' নয়। কল্যাণরাষ্ট্র ঘোষণা দিয়েও লাভ নেই। সুবিধাগুলো লুটে খাবে বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত, যখন যে দল আসে, তার রাজনৈতিক টাউটরা। গলদটা অন্যখানে। মানুষ যদি সুশিক্ষিত হয় এবং ধর্মীয় শিক্ষামতো মা-বাপের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য মেনে চলে, তাহলে 'ওল্ড হোম' অথবা সরকারের সাহায্য কিছুরই প্রয়োজন হয় না।

আমার দূর-সম্পর্কীয় এক আত্মীয়র গল্প বলি। তিনি ছিলেন খুব সচেতন এবং দূরদর্শী। বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে। অসুস্থ– ঘরে শুয়েই সময় কাটান। তিনি একদিন ছেলেকে বাজার থেকে কিছু জিনিস ও ওষুধ তাঁর জন্য কিনে এনে দিতে বললেন। একটু ঝাঁকি দিয়ে ছেলেটা বললো– আমার অনেক কাজ আছে। আমি বাজারে যেতে পারবো না। ছেলেটা মূলত বন্ধুদের সাথে দূরের কোনো গ্রামে খেলা দেখতে যাবে। ছেলেটার বয়স ষোলো থেকে আঠারো। বাপকে বুঝিয়ে না-বলে 'পারবো না' কথাটা ঝাঁকি মেরে বলেছে। এতেই বাপের আপত্তি। বাপ খুব মনোক্ষুণ্ন হলেন। বকাবকি না করে ছেলেকে তার মাকে ডাকতে বললেন। তার মা এলে তার সামনে ছেলেকে ঘরে তক্তার উপরে রাখা একটা ডায়েরি পাড়তে বললেন। ডায়েরির কয়েকটা পৃষ্ঠা উল্টিয়ে এক জায়গায় এসে থামলেন। ছেলেকে পড়তে বললেন। তিনি তারিখসহ লিখে রেখেছেন: ছেলেটার বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন তার বাবার হাটে যাওয়া দেখলেই ছেলেটা বায়না ধরতো, বাবার কাঁধে চড়ে হাটে যাবার জন্য। প্রতি হাটবারেই তাকে কাঁধে করে বাজারে বয়ে নিয়ে যেতে

হতো এবং বাজার-সওদাসহ অনেক কষ্ট করে কাঁধে করে তাকে আবার বাড়িতে আনতে হতো। ছেলেটা কাঁধ থেকে কিছুতেই নামতে চাইতো না। বাজারে গিয়েই মিষ্টি খেতে চাইতো, বাপ প্রতি হাটে কিনে দিতেন। কোনোদিন কোনো বিরক্তি প্রকাশ করেননি। বাপের বাজারে যাওয়া দেখলেই ছেলে কান্না ধরতো। কাঁধ থেকে নামালেই কান্নাকাটি করতো।

একবার একটা কথা ছেলেটা ছয়বার বাপকে জিজ্ঞেস করেছিলো। বাপ তা হাসিমুখে জবাব দিয়েছিলেন। ছেলের প্রতি কোনোরকম বিরক্ত হচ্ছিলেন না। ছেলেটা মাঝে-মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়তো। বাপ সারা দিনের কাজের আগে ভোরবেলা তিন গ্রাম হেঁটে জালাল ডাক্তারের কাছ থেকে বোতলে দাগকাটা পানিতে গোলানো সিরাপ ও পুরিয়া ওষুধ এনে দিতেন। কোনোদিন বিরক্ত হতেন না। সবকিছুই ডায়েরিতে লেখা।

ভদ্রলোক বললেন– এসব কথার সাক্ষী তোমার মা। আজ এতটা বছর পর শুধু একটা অনুরোধ তোমাকে করেছি। তোমার রক্ত এখন গরম। আর সেজন্য তুমি আমাকে ঝাঁকি মেরে 'পারবো না' বলে দিলে। আমার কতো ত্যাগ ও কষ্টের মধ্য দিয়ে যে তোমাকে এতো বড় করেছি, তা তোমার জানা ও ভাবা দরকার। সময় করে একদিন ডায়েরিটা পড়ে দেখো। কথাটা ওভাবে বলা তোমার কতটা উচিত হয়েছে, তুমি নিজেই ভেবে দেখো। কথাটা বলে ডায়েরিটা ছেলের হাত থেকে নিয়ে ছেলের মাকে আবার তক্তার উপরে তুলে রাখতে বললেন। ছেলেটা সেখানে নীরব হয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকলো।

আমার জানা আরেকটা গল্প বলি: অনেক বছর আগের ঘটনা। পাকিস্তান রাষ্ট্র তখনও প্রতিষ্ঠা হয়নি। মেয়েদেও লেখাপড়া শেখার প্রচলন ছিলো কম। সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলেরা কখনো অনেক দূরে জায়গির থেকে লেখাপড়া করতো। একটু বেশি বয়সে স্কুলে যেত। একজন সম্ভ্রান্ত ঘরের ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত মৌলভি সাহেব, সর্বজন সম্মানিত মানুষ। খুব শখ করে আত্মীয়তা করার জন্য তাঁরই এক ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ বনেদি বন্ধুর মেয়ের সাথে ম্যাট্রিক পাস করা ছেলেকে ঘটা করে বিয়ে

দিলেন। আত্মীয়র বাড়িও কমপক্ষে চল্লিশ মাইল দূর। সে-সময় যোগাযোগ ব্যবস্থা এতোটা সহজ ছিলো না। মেয়ে ভালো কুরআন পড়তে জানে। বাংলাও বাড়িতে পড়ে ভালোই শিখেছে। কয়েকটা বছর চললো। ছেলে করাচিতে চাকরিতে ঢুকেছে। সাথে লেখাপড়াও চালিয়ে যাচ্ছে। মৌলভি সাহেব বেশ অসুস্থ, বিছানাগত। হঠাৎ বেয়াই সাহেব এসে বাড়িতে হাজির। হাতে একটা খামে-ভরা কাগজ। মেয়েটা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত নয়। স্বামীর সাথে উচ্চপর্যায়ে চলাফেরা করার অনুপোযুক্ত। স্বামী উচ্চশিক্ষা নিয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরতে শিখেছে। মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন কাউকে না জানিয়ে ছেলে বউকে তালাকপত্র পাঠিয়ে দিয়েছে। মৌলভি সাহেব কিংকর্তব্যবিমূঢ়, বেয়াইয়ের কাছে অপমানিত, লা-জওয়াবি। পরদিন সকালে বেয়াই সাহেব বিদায় নিলেন। মৌলভি সাহেব মনের কষ্টে, অপমানে কিছুক্ষণ চোখের পানি ফেললেন। দু-হাত তুলে খোদার কাছে ছেলের কৃতকর্মের জন্য অভিশাপ দিলেন। বিছানা ছেড়ে আর উঠলেন না। কয়েক দিনের মধ্যে চিরবিদায় নিলেন। চাকরিজীবী ছেলের সাথে শেষ দেখাটাও হলো না। দেশ-বিদেশ চাকরি করতে গিয়ে ছেলে পরে আরো দুটো বিয়ে করেছিল। কোনোটাই টেকেনি। সুখপাখিও হাতে ধরা দেয়নি। দাম্পত্যজীবনও তাই কোনোদিন গড়ে ওঠেনি। কোনো মহিলা তাকে কোনোদিন আন্তরিকতার সাথে খাবার তৈরি করে সামনে এনে দেয়নি। শেষ বয়সেও কোনো মহিলার সংস্পর্শ ও সেবাযত্ন ছাড়া অনেক কষ্টে কবরের ঠিকানা বেছে নিতে হয়েছে। জানিনে, তালাকপ্রাপ্তা ঐ ভদ্রমহিলাও মনের অজান্তে তাকে কোনো অভিশাপ দিয়েছিলেন কি-না। যাকে একসময় অবহেলায় ছেড়ে আসা হয়, অন্যসময় আর শত চেষ্টা করেও তাকে ফিরে পাওয়া যায় না। উত্তর আসে, 'কী করে পাবে বলো, পুরোনো আমায়'! মহাসময়ের এটাই শিক্ষা।

আমার পাশের গ্রামের আরেকটা লোকের গল্প বলি। নাম জিয়ারত মন্ডল। তিনি ঐ গ্রামের বসতি লোক নন। গ্রামের উত্তর দিকের সত্তর-আশি মাইল দূর থেকে ঐ গ্রামে এসেছিলেন। তাই অনেকে বলতো, উত্তুরে লোক। তার সেখানে একটা সংসার ছিল। ছেলে-মেয়ে ছিল। একটা কেসে পড়ে এখানে দূর-সম্পর্কীয়

আত্মীয়র কাছে পালিয়ে এসেছিলেন বলে আমরা পরে শুনেছিলাম। তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা এত উন্নত ছিল না। তিনি লাপাত্তা হয়ে এখানে চলে এসেছিলেন। বয়স চল্লিশের কোঠায়। দু-বছর এই এলাকায় বাস করার পর বিয়ে করলেন। অতীত মুছে গেলো। উনি খুব পরিশ্রমী ছিলেন। জমির দাম ছিল অল্প। কয়েক বছরের মধ্যে আট-দশ বিঘা জমি কিনে ফেললেন। শ্বশুরবাড়ির লোকজনও সহযোগিতা করলো। আমাদের আঞ্চলিক ভাষার সাথে তার ভাষার মিল হতো না। তিনি ভাষা পরিবর্তনও করতে পারতেন না, মানুষ হাসতো। সংসারে পর পর তিন ছেলে। তিন ছেলেকেই তিনি মাঠ ধরালেন। কালির অক্ষর চেনা লোক বাড়িতে নেই। ছেলে তিনজন ক্রমশই বড় হতে লাগলো। জিয়ারত মন্ডলের শরীর আস্তে আস্তে খারাপ হতে থাকলো। আগে মানুষের গড় আয়ু ছিল কম। মানুষ সহজেই বুড়ো হয়ে যেত। ষাট পেরোতে না পেরোতেই জিয়ারত মন্ডল প্রায় চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে গেলেন। লাঠি ছাড়া চলতে পারেন না। স্ত্রী মারা গেলেন। তাঁর কোমর নুয়ে গেলো। বুকের দু-পাশের হাড় ক-খানা আছে গুনে নেওয়া যায়। পা দুটো চিকন হয়ে গেল। স্ত্রী মারা যাবার পর তার থাকার ঠিকানা হলো বড় ঘরের পেছনের বারান্দায়।

বড় ছেলের বিয়ে হলো। ঘর চলে গেলো তার দখলে। খড় দিয়ে ছাওয়া আরো দুটো ছোট ছোট মাটির ঘর তৈরি হলো, বাকি দুই ছেলের জন্য। তিন বছরের মধ্যে বড় ছেলের ঘরে এক ছেলে জন্ম নিলো। ছেলেটা রংয়ে একটু কালো। তাতে কী! সোনার আংটি বাঁকাও ভালো। মা-বাবা ও দুই চাচার আদরে ছেলের মাটিতে পা পড়ে না। বুড়ো বাপের খোঁজ কেউ রাখে না। বুড়োকে বারান্দা থেকে বাইরে নামাতে গেলে কেউ-না-কেউ ধরে পইঠা দিয়ে নামাতে হয়। দিনে কয়েকবার টয়লেটে যেতে হয়। জিয়ারত মন্ডল বারান্দায় বসে ছেলেদের নাম ধরে অনেকবার ডাকাডাকি করলে একবার কেউ আসে। আবার কখনো তার ডাক কেউ গ্রাহ্য করে না। কখনো কারো আসার তর তার সয় না। এ নিয়েও গঞ্জনা। ছেলেরা ধমক দিয়ে বলে– 'বার বার এত বাইরে যাওয়া লাগে কী জন্যি?' অগত্য বারান্দার এক পাশে পেশাবের জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছে। বেটার-বউ ইনিয়ে-বিনিয়ে স্বামীর কাছে

বুড়োর নিন্দা করে। নাতিটা একটু একটু করে খেতে শিখছে। বাপ-চাচারা হাটে গেলে বাচ্চাটার জন্য ললিপপ এনে দেয়, মিঠাই এনে দেয়। বাচ্চাটা তা চুষে চুষে দাদার সামনে খায়। দাদারও একটু খেতে ইচ্ছে করে। কাউকে লজ্জায় বলতে পারে না। একদিন নাতিকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে এক কামড় খায়, তো নাতি গিয়ে মাকে বলে দেয়। কখনো বুড়ো নাতির হাত থেকে নিয়ে কামড় দেওয়ার আগেই নাতি চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। বেটার-বউ এসে গঞ্জনা করে, গালাগালি করে, 'বাচ্চার জিনিস হাত থিকে নিয়ে বুড়ো মানুষির খাতি লজ্জা করে না! হাক থু'। জিয়ারত মন্ডল লজ্জা পান, মনোকষ্টে ভোগেন।

বাপ-চাচারা আদর করে ছেলের নাম রেখেছে আরজত আলি। বাড়ির যা কিছু মুখে ভালো লাগে, সব কিছুই আরজত খাবে। সবাই ভালোটা এনে আরজতের মুখে দেয়। জিয়ারত মন্ডল বারান্দায় বসে খাবারের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন।

বারান্দার সামনে দিয়ে রাস্তা। জিয়ারত মন্ডলের টয়লেটে যাবার দরকার হলে ছেলেদের নাম ধরে ডাকতে থাকেন। কেউ না এলে কখনো পথের কাউকে ডেকে তার হাত ধরে নীচে নামেন। টয়লেটে যান। কখনো লাঠিতে ভর করে রাস্তার পাশে একটু হাঁটার চেষ্টা করেন। এতে বেটার-বউয়ের গা-জ্বালা করে। সে বাড়ির ভিতর থেকেই খোঁটা দেওয়া শুরু করে, 'বুড়ো এখন আমাগের দুর্নাম রটানোর জন্যি পথের মানুষকে ডাকচে, শুদো বসে বসে খাওয়া, আর বিটার বউগের দুর্নাম করা, রান্দা ভাত খাতি লজ্জা করে না!'

প্রথম ছেলের বউ আবার পোয়াতি। জিয়ারত মন্ডলের দ্বিতীয় ছেলে বিয়ে করেছে। দ্বিতীয় ছেলের বৌ ঘর থেকেই বেরোতে চায় না। বেরোলে সংসারের কাজ, নয়তো আরজতকে নিয়ে আদর করা। শ্বশুরের খোঁজখবর নেয় না। শ্বশুরের ভাতটা পৌঁছে দেওয়ার লোক পাওয়া যায় না। সবার খাওয়ার পর ভাত, সাথে একটু তরকারি, একটা গ্লাসে পানি– বুড়োর সামনে রেখে যেতে পারলেই দায়িত্ব শেষ। অত অল্প তরকারিতে বুড়োর ভাত খাওয়া হয় না। অনেক কষ্টে ভাতটুকু খায়। বুড়োর সামনে বারান্দায় একটা পানির ভাঁড় বসানো আছে। তাতে পানি আছে কি নেই– কেউ

খোঁজও নেয় না। এক গ্লাস পানিতে হাত ধোয়াসহ ভাত খাওয়া হয় না। পানির জন্য বুড়োর ডাকে কেউ সাড়া দেয় না। বাড়িতে প্রতি ওক্তে মাছ-মাংস যা রান্না হবে, সেরাটা বরাদ্দ আরজতের জন্য। দিনে দিনে বুড়োর আর এগুলো সহ্য হয় না। বুড়ো মনে মনে আরজতকে তাঁর অব্যক্ত প্রতিযোগী ভাবেন। জিয়ারত মন্ডল শেষ বয়সে এসে নামাজ পড়া ধরেছেন। বারান্দার এক পাশে বসে বদনায় করে অজু করেন। এতে বারান্দার পোতার দেওয়াল ভিজে যায়। মাটি দিয়ে লেপা পোতায় পানির পর-পর ধারানিতে প্রলেপ নষ্ট হয়ে যায়। এতে বেটার বউয়ের চিৎকারে তাচ্ছিল্য বাড়ে।

জিয়ারত মন্ডল ক্রমশই হীনবল হয়ে পড়ছেন। নাপিত এসে চুল ছাঁটতে গিয়ে তিন পাশের চুল খুর দিয়ে চেঁচে ফেলে দিয়েছেন। উপরে পাতলা পাতলা দু-চারটা ছাঁটা পাকা চুল অবশিষ্ট আছে। বেলের মতো একটা মাথা নিয়ে তাঁকে খুব রোগা দেখাচ্ছে। বারান্দায় হাঁটু দুটো খাড়া করে বসে থাকলে মাথাটা নুইয়ে দুই হাঁটুর মধ্যে চলে আসে। কঙ্কালসার জিয়ারত মন্ডল শকুনসদৃশ হয়ে তীর্থের কাকের মতো বারান্দায় বসে থাকেন। বেটার-বউদের অন্নদান তার জীবনরক্ষার একমাত্র অবলম্বন। তাও কখনো জোটে, কখনো জোটে না। বলতে গেলেই ছেলেদের কাছে বউদের কান ভাঙানি দেয়ার ভয়, লোকলজ্জা, দুনো-জ্বালা।

কোন অভিশাপে জিয়ারত মন্ডলের আজ এই ফল, তা তিনি নিজেও জানেন না। কথা বলতে গেলে জিভটা মুখের বাম পাশ দিয়ে কাত হয়ে অল্প বেরিয়ে যায়। কথা স্পষ্ট হয় না, থুথু চলে আসে। রাস্তা দিয়ে হেঁটে কেউ গেলে, তাকে কাছে ডাকেন। অনন্যোপায় হয়ে বেটার বউদের তার প্রতি অবহেলা, অযত্নের কথা তুলে ধরেন। খাদ্য-খাবার পান না– তা বলেন, ছেলেরা খোঁজ নেয় না– তাও বলতে থাকেন। এতে হিতে-বিপরীত হলো। অবহেলা আরো বেড়ে গেল। জিয়ারত মন্ডল একদিন পাড়ার একজনকে ডেকে রাগত স্বরে শুকনো দুটো হাত নেড়ে নেড়ে তার উত্তুরে ভাষায় অনেক কথাই বললেন। কথার মধ্যে আরো বললেন– 'এ-বাড়ির কুনু মেয়েলোকের মুকির ফুটুক দিয়ে বেরোয় না যে, এই মাছটা বুড়ুকে দে– সব ঐ আরজতকেই দে, আরজতকেই দে, আরজতকেই দে।'

পাড়ার কিশোর রাখালদের মুখে মুখে কথাটা গীত হয়ে মাঠে-ঘাটে ঘুরপাক খেতে লাগলো। কথাটা বাগধারায় পরিণত হলো। এতে আরজতের মা-বাপ-চাচা-চাচি বুড়োর উপর খুব রুষ্ট হলো। বুড়োর দিন আর কাটে না! এক রাতে বুড়োর টয়লেটে যাওয়া খুব জরুরি হয়ে পড়লো। অনেক ডাকাডাকির পরও ছেলেদের কেউ এগিয়ে এলো না। সবাই যার যার ঘরে নাক ডাকিয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। জিয়ারত মন্ডল লাঠিতে ভর করে অনেক কষ্টে একাকী বারান্দা থেকে নামতে গেলেন। অমনি লাঠি পিছলে হুমড়ি খেয়ে নীচে গিয়ে পড়লেন। ওখানেই তার শাপমোচনের অর্গল খুলে গেলো। সকালে লোক জড়ো হলো, কবরের ব্যবস্থা হলো– বেটার বউরা সুর করে কাঁদলো, ছেলেরাও কাঁদলো, কিন্তু সে কান্নায় কোনো আঁট বসলো না।

(পল্লবী, ঢাকা: ৮.১১.২০২০)

বিপণি বেসাতি

অজানা নম্বর থেকে সেলফোনে একবার রিং বেজে উঠলো। সবুজ মাস্টার ধরলেন না। একই নম্বর থেকে আবারও রিং বাজছে। সবুজ মাস্টার অজানা নম্বরের রিংয়ের উপর খুবই বিরক্ত। সারাদিন বিশ-পঁচিশটা কল আসে, পণ্য বিক্রির জন্য। কেউ ফ্ল্যাট বিক্রি, কেউ প্লট বিক্রি, অভিজাত হোটেলে থাকার ব্যবস্থা, রিসোর্টের আয়োজন, বিমানের টিকিট বিক্রি, মাছ-মাংস-তরকারি হোম ডেলিভারি, আরো রকমারি ব্যবস্থা। করোনা মহামারি শুরু হওয়াতে এ-সংখ্যা আকাশ ছুঁয়েছে। ফোন ধরতেই বিরক্ত লাগে। সবুজ মাস্টার এগুলো এড়িয়ে চলেন। আবার অজানা নম্বর থেকে ফোন এলে, না ধরলেও হয় না। অনেকেই জরুরি প্রয়োজনে, কেউবা বিপদে পড়ে ফোন করেন। আত্মীয়-স্বজন, পরিচিতজন থাকলেই ফোন আসে। সব নম্বর তো আর সেইভ করে রাখা যায় না– এজন্য অজানা নম্বরের ফোন না ধরেও পারা যায় না।

পর পর দু-বার রিং হওয়া শুনে সবুজ মাস্টার ফোনটা ধরলেন। ওপাশ থেকে মহিলা কণ্ঠ।

–আসসালামু আলাইকুম স্যার, কেমন আছেন স্যার। শরীরটা ভালো?

–হ্যাঁ ভালো। আমি তো আপনাকে চিনতে পারছিনে। বলুন তো আপনি কে?

সবুজ মাস্টার ভাবছেন পুরোনো কোনো ছাত্রী হতে পারে। নইলে শরীরের অবস্থা জিজ্ঞেস করবে কেন।

–আমি মাছ-সবজি ডট কম থেকে ফোন করেছি স্যার। আমরা টাটকা জিনিস অল্প দামে বাসায় পৌঁছে দিই স্যার। সবাই আমাদের এই সার্ভিটাকে খুব পছন্দ করছে স্যার। আপনার কী কী লাগবে বলুন। আমি অক্ষুনি অর্ডার প্লেস করে দিচ্ছি, স্যার।

–না, আমার কিছু লাগবে না। ভবিষ্যতে লাগলে আমিই আপনাকে ফোন দেবো। আমাকে আর ফোন দেওয়ার দরকার নেই।

–না স্যার, আমি যেহেতু আজ ফোন করেছি, কয়েকটা আইটেম আমাদের কাছ থেকে নিয়েই দেখেন না স্যার। খুব ফ্রেশ জিনিস পাবেন। বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসবে স্যার।

খুব অনুরোধের সুরে মেয়েটা সবুজ মাস্টারকে বললো। কথার মধ্যে একটা অধিকারের সুর বেজে উঠলো। কখনো কখনো কোনো কোনো অনুরোধ না রেখে পারা যায় না, যাকে বলে অনুরোধে ঢেঁকি গেলা। এমনই অসংখ্য জায়গা থেকে কোনো কিছু কেনার জন্য ফোন আসে। এভাবে বিরক্ত করার কারণে সবুজ মাস্টার তাও কিনতে রাজি হলেন না।

–আমাকে স্যার না বললেও চলবে। বরং আপনাদের মাছের দামটা কত বলবেন কী? রূপচাঁদা, গলদা চিংড়ি আপনারা কত দাম নিচ্ছেন?

–আমরা একদম টাটকা মাছটা আপনাকে দেবো। সেজন্য দামটা তো একটু বেশি হবেই। রূপচাঁদা প্রতি কেজি সাড়ে আটশ টাকা; আর গলদা চিংড়ি আটশ টাকা।

–আমার বাসার পাশেই বাজার। সেখানে মাছ দুটোর দাম কেজিতে কমপক্ষে দেড়শ টাকা করে কমে পাবো। আমি কেন বেশি দামে কিনতে যাব?

–একদিন নিয়ে দেখুন, খেয়ে তৃপ্তি পাবেন। একদম টাটকা মাছ। আপনার পাশে কোন বাজার? আপনি খুব সুন্দর করে কথা বলতে পারেন, স্যার। আজ মাত্র তিনটা আইটেম আপনাকে দেবই।

–না, দরকার হবে না। আপনিও খুব ভালো কথা বলেন। আপনি খুব কনভিনসিং। কোথায় লেখাপড়া করেছেন?

–মিরপুর এলাকায়ই একটা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে পাস করেছি। চাকরি নেই তো, তাই অল্প বেতনে এখানে কাজে ঢুকেছি। আপনারা মালামাল না নিলে আমার যে টার্গেট অর্জন হবে না। আপনি কী করেন, স্যার?

–আমি বর্তমানে বেকার। হাতে সময় আছে, তাই বাজার-ঘাটে ঘুরি। কোনটার দাম কত জানি। আপনাকে কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি। আপনি যে চাকরি করেন, আপনার বাবা-মা জানেন? আপনারা ক-ভাই বোন?

–আমার বাপ-মাকে বলেছি চাকরি করছি, কী করছি তা জানে না। আমরা দুই বোন, এক ভাই।

–আপনার নাম কী?

–নীলা।

–নামটা তো বেশ ভালো। কেমন লেখাপড়া শিখলেন যে, এই চাকরিতে আসতে হলো।

–লেখাপড়া আমি কোনোদিন ভালোভাবে করিনি। জানতাম কলেজে যেহেতু ভর্তি হয়েছি, পাস একভাবে হবেই। আপনার নামটা কি শুনতে পারি, স্যার?

–যে লেখাপড়ার পিছনে পরিশ্রম থাকে না, তা দিয়ে তেমন একটা কিছু করাও যায় না। আমি সবুজ। আমি এমএ পাস করেছিলাম, এখন বেকার।

–বেকারত্বের যে কী জ্বালা ভাই, ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বোঝে না। আপনাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। তাহলে আজ আর মাল নেবেন না, না? দুটো আইটেম দিই?

–না, আজ থাক, পরে দেখা যাবে। সবুজ মাস্টার ফোন রেখে দিলেন।

সবুজ মাস্টার কথোপকথনকে স্বাভাবিকভাবে নিয়েছেন। তার মনে ভাবনার কোনো উদ্রেক নেই। একদিন বাদে নীলার ফোন এলো। সবুজ মাস্টারের মাথায় ফোন নম্বরের শেষের দুই সংখ্যা আছে। তিনি ফোন ধরলেন। কী, নীলা বলছেন?

–হ্যাঁ, নীলা। আসসালামু আলাইকুম। সকাল থেকে কাস্টমারদের ফোন দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে গেছি। তাই গল্প করার জন্য আপনাকে ফোন দিলাম। আপনি কেমন আছেন? আজ আমি আপনার কাছে কোনো মাল বেচার প্রস্তাব দেবো না, ভেবেছি। আপনি ভয় পাবেন না।

–আমি ভালো আছি। না, ভয় পাবার কী আছে! আপনি কেমন আছেন বলুন।

–ভালো। আমি তো আপনার ছোট। আমাকে তুমি বলা যায় না? আমাকে তুমি বললে আমার ভালো লাগবে।

–আচ্ছা ঠিক আছে। এ চাকরি ছাড়া আর কোনো চাকরি করা কি তোমার পক্ষে সম্ভব?

– কেন, এটাতে অসুবিধে কী?

– পণ্য বিক্রি করতে গিয়ে নিজেকে পণ্যের মতো বাজারে বেচে দেওয়া আমার ব্যক্তিত্বে বাধে। তোমরা বুঝতে না-পারলেও ব্যবসার মালিকপক্ষ বিষয়টা ঠিকই বোঝে। সে জানে, তোমার কথায় পণ্য বিক্রি বেশি হবে। সে ইচ্ছে করেই তোমাকে

বেছে নিয়েছে। তোমার বোঝা দরকার ছিল, এ কাজ করবে কি-না। এছাড়া তুমি চেষ্টা করলে ছোটখাটো একটা ব্যবসা করেও এরচে বেশি রোজগার করতে পারো। তুমি সস্তা ডিগ্রি নেবে, আজীবন সস্তা বাজারে শ্রম বিক্রি করে চলতে হবে। যে বিদ্যা অর্জনে পরিশ্রম কম, বাজারে সে বিদ্যার চাহিদাও কম। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। বিশ্ববাজার এখন একটা গ্লোবাল ভিলেজ, কাজের অভাব নেই। তুমি এ-কাজের পাশাপাশি তিন মাসে ভালো ইংরেজি শিখে নিতে পারো। এরপর কম্পিউটারটা ভালো করে শিখে নিতে পারো। কীভাবে ব্রাউজ করে কাজ পাওয়া যায়, কাজ করা যায়, তা ট্রেইনিং নিতে পারো। প্রথমে একটু কষ্ট করতে হবে, টেকনিক্যাল জিনিসটা শিখতে হবে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে পরিশ্রম করতে হবে। এভাবে তুমি বাসায় বসেই আউটসোর্সিংয়ের অনেক কাজ করে ডলার উপায় করতে পারো। এ দেশের অনেকেই এসব কাজ করে ভালো আয় করছে। অন্য বিষয়ে একটা গল্প বলি: আমার এক পরিচিতজনের মেয়ে, বাসায় শখ করে মিষ্টি তৈরি করতো। একদিন শখের বশে তার এলাকার ফোন নম্বরগুলো যথাসম্ভব সংগ্রহ করে মেসেজ পাঠালো, ফেসবুকেও লিখলো– সে ঘরোয়া পরিবেশে মিষ্টি তৈরি করে বিক্রি করে। প্রথমে কয়েকজন কিনতে চাইলো। একটা ছেলেকে বলে হোম ডেলিভারি দিতে থাকলো। ক্রমশই তার ক্রেতা বাড়তে থাকলো। এই করোনার মধ্যেও সে মিষ্টি বেচে ভালো পয়সা রোজগার করেছে। তার বাপের কাছে শুনলাম, সে এখন কেক তৈরি করেও হোম ডেলিভারি দিচ্ছে।

–আমি কি এগুলো পারবো?

–আগে নিজের উপর আস্থা আনতে হবে। মাথায় নতুন কিছু ভাবতে হবে। কাজটাকে ধরে রাখতে হবে। কোয়ালিটি নিশ্চিত করতে হবে। কাজের প্রতি ভক্তি ও সততা দেখাতে হবে। সতেরো কোটি আধ্যুষিত এই দেশে ব্যবসার অভাব নেই। দরকার ভাবনার মধ্যে সুস্থতা ও নতুনত্ব আনা। মানুষকে না ঠকানো। মালের কোয়ালিটির সাথে আপস না করা। একবারে আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার চেষ্টা না করা। প্রতিটা লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়েদের পক্ষেই এটা সম্ভব। আরেকটা গল্প বলি: আমার পরিচিত এক ভদ্রমহিলা খাবারের ঘরোয়া ব্যবসা করতে চাইলো। সাথে তার বান্ধবীকে নিলো। পাঁচটা ভর্তা দিয়ে দু-জনের জন্য খাবার অফিসে সাপ্লাই দেওয়া শুরু করলো। তারা নিজ হাতেই পরিষ্কার-

পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে ঘরোয়া পরিবেশে রান্না করে। খরিদ্দার বাড়তে শুরু করলো। নাম দিলো 'ভর্তা খাবার'। তারা বেশ টাকা উপার্জন করেছে। করোনার এই ভয়ের বাজারেও তারা যথেষ্ট লাভ করছে। তারা বর্তমানে 'মাছ-ভাত'ও সাপ্লই দিচ্ছে। দরকার মনোবল এবং কাজের প্রতি একনিষ্ঠতা।

–আপনি এতো জানেন, নিজে বেকার কেন? নীলা প্রশ্ন করলো।

–আমি চেষ্টা করছি। খুব তাড়াতাড়ি একটা কিছু করবো। ব্যবসা নিয়ে ভাবছি।

–আপনি তো আমাকে সাথে নিতে পারেন। আমার কোনো আপত্তি নেই। এখানে এসে তো দেখছি, ব্যবসাতে অনেক লাভ।

–এ সমাজে তোমাদের বয়সী মেয়েদের সাথে কেউ-না-কেউ থাকে। তুমি তাকে সাথে নিয়ে ব্যবসা করতে পারো।

–বিশ্বাস করেন, আমার কেউ নেই। আমি আপনার সাথে থাকতে চাই। এখানকার এ চাকরি আমারও ভালো লাগে না। তবু পেটের দায়ে করি।

–বাঁধাধরা গণ্ডিতে আবদ্ধ না থেকে চিন্তাধারার পরিবর্তন আনো, জীবনে ভালো কিছু করতে চাইলে চিন্তার সুস্থতা থাকতে হবে। এদেশের স্কুল-কলেজসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের চিন্তাধারার উন্নতি ও উৎকর্ষ বাড়ানোর কোনো চেষ্টাই করেন না। আত্মোপলব্ধিও না। শুধু নোটবই মুখস্ত করিয়ে পাস সার্টিফিকেট দেয়, ছাত্র-ছাত্রীরা তা পরীক্ষার পরপরই ভুলে যায়। তোমাদের কোনো দোষ নেই। তোমরা কাদার পুতুল। বিরুদ্ধ পরিবেশের শিকার। আজ আমি একটু ব্যস্ত– বলে সুজন মাস্টার ঐদিনের মতো ফোন রেখে দিলেন।

দু-দিন যেতে না যেতেই নীলা আবার ফোন করলো।

–আপনার ঐ দিনের কথাগুলো আমার খুব ভালো লেগেছে। তারচে' বেশি ভালো লেগেছে আপনাকে। আপনি আমাকে সাথে নিচ্ছেন কি-না, বলুন?

–আমার এ জীবনমুখী কথা ভালো না লাগার কোনো কারণ নেই। প্রত্যেকেই নিজে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করাই ভালো। পরমুখাপেক্ষী হওয়া ভালো না। আমি ভাবছিলাম, তুমি গত দিন তোমার পণ্য আমার কাছে বিক্রি না করতে পারলেও, আজ অন্তত তিন-চারটা আইটেম বেচবেই। আমি তো ভয়ে ভয়ে আছি।

– আমি আর কোনোদিন আপনার কাছে পণ্য বিক্রি করবো না। এখন নিজেই বিক্রি হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছি। আপনি জানেন, আমার এই মালিক কিন্তু এই ব্যবসা করে প্রচুর লাভ করে। কেবল আমাদের বেতন একটুও বাড়িয়ে দিতে চায় না। বাড়িতে মাল পৌঁছে দেবার কথা বলে টাকা নেয়। এক শ থেকে দেড় শ। অথচ খরচ হয় বড়জোর ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা। দু-দিক থেকে লাভ করে। মালে একবার বেশি বেশি লাভ করে; আবার পৌঁছানো খরচেও লাভ করে।

–তোমার এ কাজে ঐ মালিক আর ক-জনকে নিয়োগ দিয়েছেন?

–আরো দু-জন মেয়ে আমার মতো ফোনে কাজ করে। আমাদের কাজ, ভালো ভালো কথা বলে খরিদ্দার জোগাড় করা। মাসের বেতন দিতেও অনেক সময় দেরি করে। পরের মাসের বারো থেকে পনেরো তারিখে দেয়। যাতে আমরা অন্য কোথাও চলে যেতে না পারি।

–আমি বলতে চাই অন্য কথা। অন্যের দিকটা আগে না দেখে নিজেকে গড়ার চেষ্টা করা এবং চিন্তাধারার উৎকর্ষ বাড়িয়ে নিজের উন্নতি করা। তোমাদের তিন জনকে দিয়ে ফোনের মাধ্যমে খরিদ্দার জোগাড় করার তোমার মালিকের এ বুদ্ধিও আমি পছন্দ করিনে। প্রতিটা মানুষই যার যার কাজে ব্যস্ত। এর মধ্যে অনুমান নির্ভর হয়ে প্রত্যেককে ঢালাওভাবে ফোন করে বিরক্ত করাটাও উচিত নয়। প্রতিদিন এমন বিশ-পঁচিশটা ফোন আসে। বিরক্ত না হয়ে কি মানুষ পারে? আমি তোমার প্রথম ফোনে বিরক্ত হয়েই তোমাদের পণ্য কিনিনি। আজকাল পণ্যের প্রচারের জন্য বিভিন্ন পথ বেরিয়েছে। মোবাইল ফোনের প্রত্যেকটা আইটেমই বিভিন্নভাবে মানুষ বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। যে কোনো বিষয় খুললেই বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। ই-মেলেও বিজ্ঞাপন, ফেসবুকে বিজ্ঞাপন, ইউটিউবে কিছু দেখতে গেলে সেখানেও বিজ্ঞাপনে ভরা। অথচ তোমার মালিকপক্ষ তোমাদের তিনজনকে মাসিক বেতন দিয়ে, আবার অনেক টাকার টেলিফোন বিল দিয়ে ব্যবসা করছেন, সাথে মানুষকে বিরক্তও করছেন। জানবে, পণ্য বা সেবার কোয়ালিটিতে ব্যবসার প্রসার। শুধু বিজ্ঞাপন দিয়ে বেশি দিন টেকা যায় না। কাস্টমাররা খুব সচেতন। এতে কাস্টমারদের মনে বিরক্তি আসে। তোমার মালিক এভাবে খরিদ্দার জোগাড় না-করে তার পণ্যের গুণাগুণ এবং অন্যান্য আরো ভালো দিক অন্য বিকল্প পথে

কাস্টমারদের কাছে তুলে ধরতে পারেন। প্রকৃত কাস্টমাররা সন্তুষ্ট হলে বা দরকার মনে করলে অবশ্যই তোমাদের কাছে পণ্য ডেলিভারি দেওয়ার অর্ডার দেবেন।

–আপনাকে তো দেখছি আমাদের এ কোম্পানির কনসালটেন্ট নিয়োগ দিতে হবে। আমি বুঝছি, তাহলে মালিকের এ ব্যবসার অনেক উন্নতি হবে।

–যে কোনো মালিকের ব্যবসার কনসালটেন্সি আমি করিনে। আগে মালিকের মন-মানসিকতা সদিচ্ছা দেখি। তারপর সিদ্ধান্ত।

–আপনি কিন্তু আপনার ব্যবসাতে আমাকে পার্টনার হিসেবে নিচ্ছেন। আর আপনার সাথে আমার দেখা হওয়াটা বেশ দরকার। আপনাকে দেখার আমার খুব ইচ্ছে, কিছু জরুরি কথাও আছে। একদিন আমাদের সেল্‌স-সেন্টারে এসে কিছু মালামালও কিনে নিয়ে যান, আবার আমাদের দেখাটাও হোক। আমার এ কথাটা কিন্তু আপনাকে রাখতে হবে।

–আমি যেতে পারবো কি-না জানিনে, তবে চেষ্টা করবো। আমি এখন নিজে একটা ব্যবসা করার কথা ভাবছি। সময় হাতে খুব কম। মেয়েটা লেখাপড়া সবে শেষ করলো। ছেলেটা তার অফিস নিয়ে ব্যস্ত থাকে। বাসায় কোনো আলাদা ড্রাইভার নেই। ছেলের উপর নির্ভরশীল। আমি গত বছর অবসরে গেছি। পারলে ছেলেটাকে সাথে নিয়ে তোমাদের সেল্‌স-সেন্টারে একবার আসবো। দেখা হবে। ধন্যবাদ তোমাকে।

নীলাও কোনো কথা না বাড়িয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোনটা রেখে দিলো।

(পল্লবী, ঢাকা: ১১.১১.২০২০)

দাদনদাহ

চার মেয়ের পরে ছেলের জন্ম। অনেক শখ ও আরাধনার ছেলে। এমন আরাধিত বস্তু বা ব্যক্তিকে কীভাবে মহার্ঘ্য দিয়ে প্রীতিভাজন করা যায়, ভাবনায় আসে না– আসে একটা প্রীতম নাম 'রাজা', স্বপ্নপূরণের রাজা। তৃষ্ণার পরিতৃপ্তির প্রস্ফুটন, অন্তরের রাজাধিরাজ– তাই 'রাজা'। সব সময় বুকের কাছে রাখতে চায় মন, তবু আছে চাষবাস, গৃহকর্ম, সংসারের যত্ন, অন্য সন্তানদের পরিচর্যা। তাই প্রাণের অবলম্বনকে কোল ছেড়ে মাটিতে নামিয়ে শোয়াতে হয়। অন্য কাজে মন দিতে হয়।

প্রাণাধিক রাজাকে নিয়ে আশার সংসার আবার যেন নতুন করে শুরু হলো। জীবন থেমে নেই। মানুষ আশায় বুক বেঁধে সময়ের রথে চড়ে সামনে এগোতে চায়, বিধাতা তা ভূলুণ্ঠিত করে। কোন ঘাটের নৌকা ভাসিয়ে নিয়ে কোন ঘাটে ভেড়ায়, কেনই-বা ভেড়ায়– সমীকরণ মেলানো দুঃসাধ্য। জীবনের সব চাওয়া পাওয়া হয় না– কখনো অসম্পূর্ণ পাওয়া হয়, কখনো না-পাওয়াই রয়ে যায়। না পাওয়ার অব্যক্ত মনের গ্লানি, অনুতাপ, আর্ত-চিৎকার অল্প সময়েই বাতাসে মিলিয়ে যায়। সময় সামনে এগোতে থাকে।

হঠাৎ দমকা ঝড়ে জীবনের মোড় ঘুরে গেল। অগ্নি-দুর্ঘটনায় তিন মাসের রাজাকে ফেলে রেখে মা চিরবিদায় নিলেন। শৌখিন পেশার রুচিশীল মা-বাপের সংসার ছেড়ে চাষি-গেরস্তের সংসারে এসে অমানুষিক নির্যাতন, ভোরে উঠে ঢেঁকি পাড়ানো, গোবর ফেলা, অমানবিক পরিশ্রম ছাড়াও শাশুড়ির একচোখা নিত্য গঞ্জনা থেকে নিজেকে বাঁচালেন। সংসারে হাহাকার। দয়া-মায়া কোথাও নেই, মা-হারা পাঁচটি সন্তান। রাজা মায়ের সোহাগ-স্নেহ থেকে বঞ্চিত। দুর্ভোগের শেষ নেই। কেনা দুধ, বড় বোন, ফুফুর যত্নে রাজা লালিত। চল্লিশ দিন পেরোতে না পেরোতেই সৎ মায়ের ঘর। বাপ দ্বিতীয় বিয়ে করলেন। সংসার তো চালাতে হবে! ছেলেমেয়েদের অসহায়ত্ব বেড়ে গেলো। কারো কাছে কিছু বলাও না যায়, সওয়াও না যায়। রাজা একটু একটু করে বড় হতে থাকলো। মা নামে তার যে কেউ ছিল, তা সে জানে না। ছোট থেকেই মা বলে কাউকে ডাকতে পারেনি রাজা। মায়ের স্নেহ কাকে বলে তা

সে জানে না। মায়ের কোনো মুখচ্ছবি তার স্মৃতিপটে ভেসে উঠে না। কল্পিত এক মহিলার মুখাকৃতি মনের অজান্তেই ভাবের আয়নায় স্থান করে রেখে সামনে এগিয়ে চলা। গ্রামের স্কুলে নামমাত্র যাওয়া আসা। অন্যের স্নেহে মন ভরে না, তাই মনের কথা কাউকে প্রকাশ করা হয় না। ক্রমশই মনটা হয়েছে চাপা স্বভাবের। জীবনের যত না-পাওয়া, কষ্ট সবই হজম করার জন্য। ভাব ও চিন্তার অপ্রকাশ ধীরে ধীরে অবোধ শিশুকে করেছে যেন বধির, মূক, হীনমনা। বোনগুলোসহ রাজার কষ্টের সীমা-পরিসীমা নেই। এ পৃথিবীতে যেন আপন বলতে তার কেউ নেই– তাই সে কারো কাছে কথা প্রকাশ করে না। মনঃকষ্টের এ দিন যেন আর শেষ হয় না!

পড়ায় মন বসে না। তাছাড়া পড়ায় জোর দেওয়ার কেউ নেই। শুধু স্কুলে যাওয়া আর আসা। পড়ার যত্ন নেই। জীবনের কোনো লক্ষ্য নেই। মায়ের স্নেহহারা উদাসী জীবনবোধ। দিনে দিনে রাজার বয়স পনেরোতে উপনীত। রাজার শরীরটা ক্রমশই খারাপ হচ্ছে। গ্রাম্য ডাক্তার, হোমিও ডাক্তার, কবিরাজ, ঝাড়ফুঁক– সবাই কুপোকাত। শহরের ডিগ্রীধারী ডাক্তার, লা-জবাব। বড় ডাক্তারের বড় বড় পরীক্ষা। অবশেষে ধরা পড়লো বড় রোগ, না-বাঁচার রোগ, নাম শুনলেই আঁতকে উঠতে হয়। ধরে নেওয়া হয় নির্ঘাৎ না-ফেরার দেশে চলে যাবে। একমাত্র নয়নমনি, বংশের বাতি– তাই চেষ্টার কমতি নেই। আক্রান্ত কিডনি ফেলে দিলে কেমন হয়! ডাক্তার নাছোড়বান্দা। রোগের সাথে ডাক্তারের মল্লযুদ্ধ শুরু হলো। সংশয়ান্বিত অপারেশন হলো। যদি রোগ পাশের কোনো জায়গায় একটু-আধটুও ছড়িয়ে গিয়ে থাকে, অপারেশন বৃথা হবে। অত সূক্ষ্ম বিষয় পরীক্ষা করার যন্ত্র এ দেশে এখনো আসেনি। তাই কপালের উপর ভরসা করতে হয়। অন্য দেশে হয়তো আছে। কিন্তু অত টাকা কে দেবে? তাই এ দেশেই অগত্যা মধুসূদন।

অপারেশন শেষে ক্যামোথেরাপি, রেডিওথেরাপি, অসহনীয় কষ্ট ভোগ করতে হয়, খাবার পেটে যেতে চায় না, বমি হয়ে উঠে আসে। মাথার চুল উঠে যায়। দুর্বল শরীর। ক্যামোথেরাপি দিতে গিয়ে কখন না জানি জীবনটা বেরিয়ে যায়! কিশোর রাজার কষ্টক্লিষ্ট জীবন। রাজা নিশ্চুপ। মর মর অবস্থা। মুখের দিকে চেয়ে দেখলে মনটা আবেগাপ্লুত হয়ে যায়।

দীর্ঘদিন চিকিৎসা নেওয়ার পর টিকে গেছে রাজা মিয়া। সে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়েছে। তারপরও পাঁচ বছর পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর থাকতে হবে। ডাক্তারের আদেশ-নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। পাঁচ বছর কেটে গেলো। রাজা মিয়া বিপদ থেকে রক্ষা পেল। ভারী কোনো কাজ করা নিষেধ, একটা কিডনি নিয়ে সে বেঁচে আছে। লেখাপড়ায় আর ফিরে যাওয়া সম্ভব হয়নি। রাজার ভবিষ্যৎ কী? চাষ-বাস অনেক পরিশ্রম। ঐ শরীরে এত পরিশ্রম সম্ভব নয়।

বাড়ি থেকে একটু দূরে একটা বাজারে দোকান ভাড়া নিয়ে, দোকানে কিছু মাল উঠিয়ে আপাতত দোকানদারি করে সময় কাটানো।

দোকানে পেট চলে না। প্রয়োজনে এক বিঘে জমি বিক্রি করে দোকানের ঘাটতি পূরণ করে পুঁজি বানাতে হয়। তবু দোকানে বছরের মধ্যে পুঁজি বসে যায়। শরীরের অযত্ন শুরু হলো। কেউ বলে, দোকান ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে বসে থাকা ভালো। কেউ বলে, যে দোকান থেকে আয় আসে না, সে দোকান চালানোর কী দরকার!

জীবন থেমে নেই। ইতোমধ্যেই রাজা মিয়া সংসার পেতেছে। সংসারে পর পর দুই মেয়ে। চারটে বোনের বিয়ে বাপ নিজ হাতে দিয়েছেন। এটা রাজার সান্ত্বনা। বোনগুলোকে নিয়ে কোনো অসুবিধায় পড়তে হয়নি। বাপ ভালো কাজ করেছেন। ভাইয়ের ব্যাপারে বোন-দুলাভাইদের মন-মানসিকতা ভালো। নেবো-খাবো নেই। দুলাভাইগুলোও পরিশ্রমী, স্বনির্ভর। শ্বশুরের কষ্টে-চলা সংসারের মুখাপেক্ষী তারা নয়। শ্বশুরেরই সংসার চলে না। মাঝে-মধ্যে জমি বেচতে হয়। দ্বিতীয় পক্ষের সংসারে আবার এক মেয়ে। দ্বিতীয় স্ত্রীর স্বামীর অবর্তমানে এক মেয়েকে নিয়ে কী হবে, নিদানকালের চিন্তা। এক ঘরের মধ্যে দুই ঘর। সংসার ভেঙে 'আলাদা মজুত' দরকার। দ্বিতীয় সংসারে দিনে দিনে ভাঙন ধরলো, দুরপনেয় দুনো জ্বালা। রাজার বাপ মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকেন, সংসার চলে না। একদিক থেকে কুড়িয়ে আনলে অন্য দিক দিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে যায়। সংসারে শুধু নেই, আর নেই শব্দ। সংসারে রাজার মনও ভালো থাকে না। মাঠ কুড়িয়ে হয়তো পনেরো বিঘে জমি হবে। তাও বেচতে বেচতে কতটুকু গিয়ে দাঁড়ায় বলা মুশকিল। পাঁচটা বোন, তাদের অংশ আছে। রাজার নিকটতম একজন ঋণ-ব্যবসায়ী আছে। টাকা হাতে আছে, সব

সমস্যার আসান। রাজাকে বুদ্ধি দেয়, তুই মাইক্রো ফাইন্যান্সের সহযোগিতা নে। আমরা তোর পাশে আছি। আর্থিক উন্নতির জন্য জগৎবিখ্যাত সর্বোৎকৃষ্ট পথ। টাকায় টাকা আনে। বড় যদি হতে চাও, এসো মাইক্রো ফাইন্যান্সের ছায়াতলে। অনেক ঘাট-অঘাট পেরিয়ে গ্রামে এ ব্যবসার নাম হয়েছে 'দাদন ব্যবসা'। পুরোনো যুগের দাদনদারদের দাদনি ব্যবসার মতো। নতুন আঙ্গিকে, নতুন নামে।

মাইক্রো ফাইন্যান্সের ব্যবসায় এক সময় টাকার আড়ত খুলেছিলো বেশ কয়েকটা এনজিও। দেশব্যাপী এ ব্যবসা ছড়িয়ে পড়ে। দেখাদেখি সারা দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় হাজার হাজার এ-জাতীয় এনজিও, টাকা দিয়ে হাত ভরে টাকা কুড়িয়ে নেওয়ার এনজিও। অনিয়ন্ত্রিতভাবে ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবসার নামে লুটপাট চলতে থাকে। পর্দায় আসে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা। তালিকায় আসে কিছু নাম। তবু বাকিটা রয়ে যায় ভুঁইফোড় ক্ষুদ্র ঋণ এনজিও নামে, তালিকার বাইরে। উচ্চ-সুদে ঋণ প্রদান ও টাকা আদায়ের নামে গরিবের কষ্টার্জিত অর্থ জোর করে পকেটে পোরে এরা। নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা যতই নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করুক না কেন; লোভের জিভ একবার বেরিয়ে এলে তা আর মুখের মধ্যে ঢুকতে চায় না। লোভীরা বের করে শতেক রকমের ফন্দি-ফিকির। বহুমুখী সমবায় সমিতি নামে সদস্য বানিয়ে দৈনিক কিংবা মাসিক ভিত্তিতে চড়া-সুদে টাকা আদায় করে পকেটে ভরার ঘটনাও অগণন। সে-সাথে দাদন ব্যবসায়ীর অনিয়ন্ত্রিত আনাগোনা। নদীর কূলে ভেজা বালি-মাটিতে পা দাবিয়ে ধরলে পাশের বালি-মাটি ফেঁপে ওঠে। মূলত মাটি নীচে দেবে যায় না, অন্যভাবে বের হয়ে আসে। সেখানে রাজারা কোনো না কোনো অপকৌশলী অপকৃষ্ট শোষণের শিকার। এ রাজা মুকুটহীন রাজা; গরিব ঘরের সহায়-সম্বলহীন রাজা। আইনের প্রয়োগহীন নৈরাজ্যের দেশে ভাগ্যবিধাতা কর্তৃক ভাগ্যবিড়ম্বিত পথে-বসা রাজা।

কাউকে না-বলে নিশ্চুপ রাজা তলে তলে দাদন ব্যবসায়ীদের হাতে ধরা দিয়েছে। পাঁচ লাখ টাকার ঋণের ফাঁদ। গ্রামের জমির দাম কম। পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে মাঠে তিন বিঘা জমি কেনা যায়। দাদন ব্যবসায়ীর লক্ষ্য মাঠে রাজার কয়েক বিঘা জমি। হাতে আছে ষণ্ডা-পাণ্ডা, পেশিজীবী দলের চাঁই, যাতে শক্তি দিয়ে টাকা আদায় সম্ভব হয়। রাজা দাদনের টোপ গিলে বেশ কিছুদিন ভালই আছে। এদিক-ওদিক

দেদারসে টাকা খরচ করছে; দোকানে বেশি বেশি মাল উঠাচ্ছে। বাড়িতে ইলিশ মাছ কিনে আনছে। কারো কারো চোখ রাজার দিকে গেলো। রাজা টাকা পাচ্ছে কোথায়! রাজাকে জিজ্ঞেস করলে কোনো কথার উত্তর দেয় না, চুপ থাকে। সে তো বরাবরই চুপ থাকতে পছন্দ করে। এর মধ্যে নিকটতম বন্ধু সুরেশকে একই সুদের শর্তে দুই লাখ টাকা ধার দিয়েছে। দিন কেটে যাচ্ছে। দোকানে মাল উঠালেই তো হয় না! চাহিদা থাকা লাগে, তুলনামূলক প্রতিযোগিতার বাজারে মাল বিক্রি হওয়া লাগে। ইচ্ছে করলেই বিক্রি করা যায় না। প্রতিটা এলাকাতেই কোনো মালের নির্দিষ্ট চাহিদা আছে। লাভের একটা নির্দিষ্ট পারসেন্টেজ আছে। ঋণের সুদের পারসেন্টেজ আছে। তুলনামূলক চিন্তা আছে। এত হিসাব রাজা মিয়ার মাথায় নেই। টাকা পেয়েছি, ব্যবসায় খাটাচ্ছি। আয় করে সুদসহ টাকা পরিশোধ করে দেবো। প্রতি হাজারে মাসে সুদ মাত্র পঞ্চাশ টাকা। রাজা ভাবে, সারাটা মাস এক হাজার টাকা খাটিয়ে মাত্র পঞ্চাশ টাকা লাভ করে সুদ দিতে পারবো না! নিশ্চয়ই পারবো। বাকি লাভ তো নিজের থাকবে। মাল দোকানে থাকলে খরিদ্দার আসবেই। ধনী হবার এটাই সুযোগ। দোকানে একবারই বেশি মাল উঠেছে। এরপর থেকে যা বেচা-বিক্রি হয় সব চলে যায় ঋণের সুদ পরিশোধ করতে। দোকানে মাল আর উঠে না। ক্রমশই কমতে থাকে। সুরেশ বন্ধুর কাছ থেকে টাকা পেয়ে তিন মাস পরই ভারতে পালিয়েছে। রাজাকে স্বজনদের কেউ জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয় না। দোকানে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে। বাড়িতে গিয়ে ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করে না। শরীরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনিয়মিতও করায় না। দুশ্চিন্তায় রাতে ঘুমায় না। মহা অশান্তি। মা-মরা ছেলে, আত্মীয়রা কেউ বেশি একটা ঘাটায় না। খুন স্বীকার, তবু ঘটনা স্বীকার না।

রাজার বাপ নিজে লেখাপড়া শিখেছিলেন, কিন্তু অর্জিত জ্ঞান পরিকল্পিত পরিবার গঠনে প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। গ্রামের পরিবেশের কারণে, সময়ের বুদ্ধি সময়ে না করতে পারার কারণে এবং নিজের দূরদর্শিতার অভাবে ছেলেমেয়েদের কাউকেই তেমন একটা লেখাপড়া শেখাতে পারেননি। জীবনের মান নীচে নেমে গেছে। জীবন থেকে কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। জীবন সম্বন্ধে কিংকর্তব্যবিমূঢ়, জীবনযুদ্ধের পরাজিত সৈনিক। সবকিছুই ধীরে ধীরে গুটিয়ে এসেছে। তিনি শেষ

বয়সে এসে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন, সন্তানদের শিক্ষিত না করতে পারার কী জ্বালা! অজ্ঞতা জীবনের বিশালতাকে ক্ষুদ্র করে দেয়, চলার পথে অসচেতনতা থেকে সৃষ্ট বিপদ-আপদের মূল কারণ, জীবন বিকাশের পথে বাধা। এখন শেষ বয়সে মাথায় হাত দিয়ে ঘরে বসে অনুশোচনা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ভুলের প্রায়শ্চিত্ত অবধারিত।

হঠাৎ রাজার বাপ হার্টফেল করে মারা গেলেন। বাড়িসুদ্ধ কান্নাকাটি। আত্মীয়-স্বজনের যাতায়াত, হা-হুতাশ। শোক-মাতম থামতেই এক মাস। চল্লিশাও শেষ। শেষ হয়নি রাজার ঋণের কিস্তি। আস্তে আস্তে তথ্য বেরিয়ে আসছে– দাদনে টাকা নেওয়ার কথা। দাদনদাতা আর কেউ নয়– সৎ বোনের স্বামী। 'পড়বি তো পড় মালির ঘাড়েই, সে ছিল গাছের আড়েই।' তার হাতে বন্ধক আছে সৎ বোন, সৎ মা ও উত্তরাধিকার সম্পত্তি।

অনেক দিন থেকেই সৎ দুলাভাই তার এলাকায় দাদন ব্যবসা করে আসছে। শ্বশুর বাড়ির এলাকায় তা জানাজানি হয়নি। একটু ঝুট-ঝামেলার মধ্যে থাকতেই হয়। তবে লাভ ভালো। বড় বড় মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানিকে দেখে দেখে এ ব্যবসাতে অনেকেই এগিয়ে এসেছে। বিভিন্ন রকমফেরও তৈরি করে ফেলেছে। লাভের পরিমাণ আশানুরূপ। হাত-ভরা লাভ। টাকার ব্যবসা। এভাবে ক্ষুদ্র-ঋণের টাকা নিয়ে কেউ ধনী হতে পারেনি সত্য, তবে অনেক ব্যবসায়ী টাকা দিয়ে ধনী হয়েছে। অনেকেই ঋণের ভারে জর্জরিত হয়ে পথে বসেছে। এক ঋণের টাকা সুদাসলে শোধ করতে অন্য ঋণদাতার কাছ থেকে দ্বিগুণ টাকা সুদে ঋণ নিয়েছে। শেষে দেউলে হয়ে পথে পথে পথ খুঁজছে, ক্ষুদ্রঋণ-ফেরারি। ক্ষুদ্রঋণের টাকার সাধ মিটে গেছে। ক্ষুদ্রঋণের টাকায় আর স্বাবলম্বী হতে চায় না। এ টাকা নিয়ে কেউ স্বাবলম্বী হয়ে উঠুক, মাইক্রো ফাইন্যান্স ব্যবসায়ীরাও এটা চায় না। স্বাবলম্বী হলে তো ঋণ-ব্যবসা বন্ধ। তত্ত্বকথা হলো, সুদের হার এত বেশি যে, ঋণ নিয়ে ঋণ-গ্রহীতা রোজগার করবে আর ঋণ-ব্যবসায়ীকে লাভের পুরোটাই দিতে থাকবে। পেটে-ভাতে নিজের ঘরে নিজে মজুর খাটবে, গ্রহীতার কষ্টেসৃষ্টে দিন চলে যাবে। ঋণ-ব্যবসা ফুলে-ফেঁপে উঠবে।

সৎ দুলাভাই সৎ-কর্মটাই করেছে; একটু একটু করে রাজার সৎ বোনকে ঋণের কথা বলেছে। বোন বলেছে তার মাকে। সৎ মায়ের মাধ্যমে খোঁটাসহ পাড়ার লোক জেনেছে। পাড়ায় সালিশ বসছে টাকা আদায়ের জন্য। জামাই হুমকি দিচ্ছে, টাকা পরিশোধ না করলে বউ বাদ যাবে। শ্বাশুড়ি খুব ক্ষিপ্ত। সৎ ছেলের কারণে মেয়ে বাদ যেতে পারে না। রাজার তো মাঠে কয়েক বিঘা জমি আছে; তা জামাইয়ের নামে লিখে দিলেই তো লেঠা চুকে যায়। দুই বছরে টাকা বেড়ে দ্বিগুণের বেশি হয়েছে। দিনে দিনে কথা রাজার আপন দুলাভাইদের কানে গেলো। তারা এলো। দেন-দরবারে কোনো লাভ হলো না। দ্বিগুণ টাকা এখনিই দিতে হবে। নইলে মাঠের ক-বিঘে জমি।

রাজার মাথা থেকে হাত আর নামে না। 'আছিলাম বোকা, হইলাম বুদ্ধিমান'। কৃতকর্মের শোকে জীবন যায় যায় অবস্থা। দুলাভাইদের কেউ কেউ বললো, শ্বশুর মারা যাবার পরও আমরা আমাদের জমির অংশ এখনও নিইনি। জমি খাই-খালাসি বন্ধক রেখে ঋণ আমরা সবাই মিলে শোধ করে দেবো। দু-মাস সময় দিতে হবে।

রাজার দোকান আর চলছে না; শরীরও চলছে না। গায়ে পানি জমেছে। পায়েও পানি জমে মোটা-তাজা হয়েছে। ক্রমান্বয়ে বিছানাগত। নড়াচড়া করতেও কষ্ট। খেতে গেলে বমি আসে। শরীর হাসা-পানসে। হাঁটতে গেলে মাথা ঘুরে পড়ে যায়। গ্রাম্য ডাক্তারের ওষুধ চললো বেশ কয়েক মাস। হোমিও ডাক্তারের প্রচেষ্টা– কোনো পরিবর্তন নেই। পাস-করা ডাক্তারকে শহরে গিয়ে দেখানো হলো। ডাক্তার চোখ কপালে তুললেন। ডাক্তার প্রথমেই সিবিসি, আরবিসি, ক্রিয়েটিনাইন, পুরো তলপেটের আল্ট্রাসনোগ্রাফি পরীক্ষা করালেন। একটাই কিডনি, তাও আকারে ছোট– সেটাও আর কাজ করছে না, পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত। জরুরি ভিত্তিতে ডাইলোসিস করাতে হবে। এভাবে কয়েক মাস চলবে। সপ্তাহে তিন বার ডাইলোসিস করতে হবে। এটা কোনো চিকিৎসা নয়, রোগীকে বাঁচিয়ে রাখার একটা সাময়িক ব্যবস্থা। এভাবে নয় মাস চলছে। রাজার ভবিষ্যৎ– রাজা বাদে সবাই বোঝে, মুখ খোলে না। রাজা অনেকটাই আশাবাদী। এর আগেও তো একবার মরতে মরতে বেঁচে এসেছিল। হয়তো এবারও তাই হবে। তবু

আশানিরাশার দোলাচলে দোলে। ডাইলোসিস করে এলে দু-দিন শরীরটা একটু ভালো লাগে। নিজ ক্ষেতের আল দিয়ে অসুস্থ শরীর নিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটে। আশায় বুক বাঁধে। ক্ষেতের দিকে তাকালে বুকটা ভরে যায়। অসুস্থতার কথা সাময়িক ভুলে যায়। মেয়ে দুটোকে কোলের কাছে নিয়ে প্রাণ ভরে আদর করে।

কেউ বলে, কিডনি ট্রান্সপ্লানটেশন সম্ভব। এভাবেও অনেকে কয়েক বছর বেঁচে থাকে। ডাক্তার রাজার ক্ষেত্রে তাও বেশি আগ্রহী নন। অনেক ঝুঁকি আছে। যা-ই করা হোক না কেন, সবই ব্যয়বহুল। এত টাকা রাজাকে কে দেবে? মাঠের ক-বিঘে জমি। একটা অংশ বন্ধকে চলে গেছে। বাকিটার কিছু বিক্রি করে আপাতত চিকিৎসা চলছে; পুরোটাই যাবে ধারণা করা যায়। এ-সাথে আত্মীয়স্বজনের কিছু দান।

এর মধ্যে রাজা নতুন এক বিপ্লবী হোমিও ডাক্তার ধরেছে, সে যে-কোনো জটিল রোগ অল্প দিনের চিকিৎসাতেই ভালো করে দিতে পারে। ধৈর্য ধরে সাবধানে খেতে হয়, অনেক পাওয়ারফুল ওষুধ। কয়েক হাজার টাকা ব্যয় করে ওষুধ এনেছে। ওষুধ খাওয়ার পর থেকেই কোমর থেকে পা পর্যন্ত মরণঘাতী যন্ত্রনা, শরীর নিস্তেজ। জীবন যায় যায় অবস্থা। ওষুধ ঠিকমতো কাজ করলে প্রথমে রোগের প্রকোপ বাড়বেই, ধৈর্য ধরে এগিয়ে যেতে হবে। তারপর জীবনের মতো রোগমুক্তি। ছোট দুটো মেয়ে, অল্পবয়সী বউ– রাজার শরীরের হঠাৎ অবনতি দেখে ধৈর্যহারা, শঙ্কিত। পুরো পরিবারের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, অসহায় নিয়তির উপর নির্ভর। সহায়-সম্বলের দারুণ সংকট। টাকার জন্য প্রয়োজনে দাদন ব্যবসায়ীদের কাছে হাত পাতা যেতে পারে। সেখানকার অতীত অভিজ্ঞতা বড় তিক্ত। ন্যাড়া একবারই বেলতলায় যায়। তাই রাজা ওখানে আর যেতে চায় না। নিষ্ঠুর প্রকৃতি রাজার অলক্ষ্যে তার বাপ-মায়ের পাশে অকালে ঠিকানা চিহ্নিত করে রেখেছে। একদম মাটির নীচে, পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন অবস্থায়।

(পল্লবী, ঢাকা: ১৭.১১.২০২০)

স্বপ্নবিলাস

কলেজের এক ভবন থেকে ক্লাস শেষ করে অফিস ভবনে যাচ্ছি। দূর থেকে সুজা ভাই উঁচু স্বরে হাত উঠিয়ে বললেন– আজমাইন, আমি ডিপার্টমেন্ট থেকে এক্ষুনি আপনার ওখানে আসছি। রেডি হয়ে থেকেন। আমার সাথে বাসায় যেতে হবে। বললাম– কেন, কী বিষয়? ভাবছিলাম, ভাবী হয়তো কিছু ভালো খাবারের আয়োজন করেছেন, তাই সুজা ভাই বাসায় নিতে চাপ দিচ্ছেন, খাওয়ার কথা বলছেন না। এমনটি মাঝে মধ্যে হয়।
–না, কারণ আছে, পরে বলবো। যেতে হবে। অনতিদূর থেকে বললেন। বলামাত্র হন হন করে সামানের দিকে হাঁটলেন।

আমি ডিপার্টমেন্টে রুমে গিয়ে বই, হাজিরা খাতা, চক-ডাস্টার রেখে ওয়াশ রুম থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এলাম। সিটে বসে একটু হালকা হলাম। সুজা ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

শিক্ষকদের এই এক জ্বালা। ক্লাস নিতে গেলে দু-হাতের কনুই পর্যন্ত চকের ধুলো মেখে যায়। ব্লাকবোর্ড মুছতে হয়, ধুলো উড়ে এসে চোখ-মুখ ভরে যায়। ধুলো কখনো চোখের মধ্যে ঢোকে।

কিছুক্ষণ বাদে সুজা ভাই এলেন। বসতে বললাম। বললেন– না, এখন না। উঠে পড়ুন, বাসায় যেতে হবে। তার পিছ পিছ সিঁড়ি দিয়ে নামছি। সুজা ভাই কাজে-কর্মে, চলনে-বলনে খুব পাতলা, কর্মচঞ্চল মানুষ। প্রতিটা কাজের আগে আগে থাকেন। এক বছর এখনো পেরোয়নি। বরিশাল থেকে ট্রান্সফার হয়ে এখানে এসেছেন। অতি অল্প সময়ে মানুষকে কাছে টানতে পারেন। শ্রেণি, বয়স নির্বিশেষে অন্তর দিয়ে মিশতে পারেন। আপন করে নিতে পারেন। হাসি-খুশি, নিরহঙ্কার একটা মানুষ। বয়সে আমার চেয়ে নয়-দশ বছরের বড়। অথচ অতি অল্প সময়ে আমার সাথে গাঢ় বন্ধুত্বের রূপ নিয়েছে। পারস্পরিক বোঝাবুঝিতে কখন যে মতৈক্যে পৌঁছেছি, দিন ক্ষণ ঠিক নেই। তার সঙ্গ ছাড়া এক দিনও আর চলতে

পারিনে। পুরো নাম মোঃ সুজাউদ্দিন আহমেদ, আমার সুজা ভাই। পিএইচডি আছে বলে সম্প্রতি বিশেষ কোটায় অধ্যাপক হয়েছেন। সে-সূত্র ধরে এ কলেজে পোস্টিং।

সিঁড়ি থেকে নেমেও দ্রুত হেঁটে সামনে যাচ্ছেন। আমি পিছ ধরতে পারছিনে। কলেজের বাউন্ডারি পেরিয়ে বড় রাস্তায় উঠলাম। যানবাহন চলাচল বেশি। রাস্তা পার হতেই সময় লাগে। এতক্ষণে পিছ ধরলাম। রাস্তা পেরিয়ে একটু সামনে হেঁটে গেলেই এক গলির মধ্যে বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন। গলিটার পরিবেশ ভালো না। রিক্সা পর্যন্ত যায় না। হেঁটে যেতে হয়। গলির সাথেই দালান। বড় বহুতল বিশিষ্ট দালান। ভিতরটা ছিমছাম, ভালো পরিবেশ। অসুবিধা একটাই, গলিতে গাড়ি ঢোকে না। আগুন লাগলে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি যায় না। কেউ মারা গেলে কিংবা হঠাৎ অসুস্থ হলে এম্বুলেন্স এ গলিতে ঢোকে না। খাটিয়ায় করে মানুষকে কাঁধে বয়ে রাস্তায় আনতে হয়। তারপর অন্য ব্যবস্থা। এ ব্যস্ত এলাকায় বড় গলির পাশে বাসা নেওয়া ব্যয়সাধ্য। স্বল্প বেতনে উপেক্ষিত শিক্ষাবিভাগের একজন শিক্ষকের বেশি টাকা ব্যয় করে এর চেয়ে ভালো বাসা নেওয়া সম্ভব নয়। এ গলিতে বাসা ভাড়া অপেক্ষাকৃত কম। মোট বেতন থেকে বাসাভাড়া দিয়ে যা বেঁচে থাকে তাতেই কায়ক্লেশে সংসার খরচ নির্বাহ করতে হয়। তা দিয়ে আবার মাসের পনেরো দিনও চলে না।

জেলাশহরে মাসিক বেতন দিয়ে সুজা ভাই যেভাবে সংসার চালিয়ে এসেছেন, এখানে এসে তা হচ্ছে না। অনেক কষ্টে দিন যাচ্ছে। মাঝেমধ্যেই আমাকে খেদোক্তি করে বলেন, 'এভাবে আর জীবন চলে না। এভাবে কয়েক মাস চললেই মনটা মরে যায়, তা মন দিয়ে ছাত্র পড়াবো কী!' সুজা ভাইকে সাথে নিয়ে সন্ধ্যার আগে রাস্তার পাশে রেস্তোরাঁয় বসে মাঝেমধ্যেই চা খাই– সাথে সিংগাড়া, কিংবা পিঁয়াজু। এতেই অল্প পয়সায় ভালো আড্ডা জমে। কখনো রেস্তোরাঁর ক্যাসেট প্লেয়ারে কর্কশ শব্দে গান বাজতে থাকে। কোনো কথা শোনা যায় না। এত উচ্চ-শব্দের গান কেউ শোনে কি-না জানিনে, তবে গান বাজে। আমরা গরম সিংগাড়া খাই।

ঐ দিন সুজা ভাইয়ের পিছ-পিছ সিঁড়ি বেয়ে বাসার চারতলায় উঠলাম। তিনি বাসার তালা খুলে ঢুকলেন। ভিতরটা শান্ত, কেউ নেই। জিজ্ঞেস করলাম– ভাবী বাসায় নেই?

–না, বাপের বাড়ি গেছে। ছেলেমেয়েও নেই। একাকী বাসায় ভালো লাগবে না ভেবে আপনাকে নিয়ে এলাম।

বললাম– খাবারও তো নিশ্চয়ই নেই। বাইরে থেকে খালি হাতে এলাম। চলুন দেখি, রান্নাঘরে ঢুকি।

দু-পট চাল হাঁড়িতে চাপিয়ে দিলাম। সুজা ভাই অন্য চুলায় ডাল চাপালেন। এবার দু-জনে দুই বাথরুমে ঢুকে হাতে-মুখে পানি দিয়ে নিলাম। ভাত রান্না শেষে আমি তিনটা আলু সিদ্ধ করতে দিলাম, ভর্তা বানাতে হবে। সুজা ভাই দুটো ডিম ভাজলেন। দু-জনে খাবার টেবিলে বসে অনেক করে গল্প করতে করতে ধীরে-সুস্থে খাওয়া শেষ হলো। দু-জনে এক বিছানায় শুয়ে সুজা ভাইকে জিজ্ঞাস করলাম– ভাবী হঠাৎ বাপের বাড়ি গেলেন কেন?

–রাগারাগি করে গেছে। ছেলেমেয়েকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে।

–আনতে যাবেন না?

–না, গেছে, কয়েকটা দিন থাক। তারপর দেখা যাবে।

সুজা ভাইয়ের শ্বশুরের পরিবার এখন ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত। বাসা কলেজ থেকে চার-পাঁচ কিলোমিটার দূরে। এখানে বেশ জায়গা নিয়ে বাড়ি তৈরি করেছেন। শ্বশুর টাকার লোক। চিন্তার মধ্যে শৌখিনতা আছে। ওভারসিয়ার পদে চাকরি করেন; টাকার উপর বসেন। শাশুড়ি গৃহিণী। কর্তৃত্ববাদী সুরুচিশীল। সংসারের আয় রোজগার ভালো। বেতনের টাকায় সংসার চালাতে হয় না, পুরোটাই জমা থাকে। চাকরিতে বাড়তি রোজগার যা হয় তা-ই খেয়ে পরে অঢেল উদ্বৃত্ত থাকে। ভাবী ছোটবেলা থেকে প্রাচুর্যের মধ্যে বড় হয়েছেন। আর্থিক অভাব-অনটন শব্দটা তার অভিধানে কোনদিনই ছিল না। লেখাপড়াও বেশি করা লাগেনি। বাপ-মা নিম্ন-মধ্যবিত্ত চাষি ঘরের উঠতি শিক্ষিত ছেলে খুঁজে মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। জামাই মেধাবী– ঘরের ফসল বিক্রি করা কষ্টের গতর খাটানো টাকায় খুঁড়িয়ে

খুঁড়িয়ে বড় হয়েছেন। সরকারি কলেজের অধ্যাপনায় ঢুকেছেন। অর্ধশিক্ষিত বিত্তশালী পরিবারের পক্ষে টাকাওয়ালা সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য এমন বিদ্যাবান জামাই খুঁজে বের করা রুচির আভিজাত্যের পরিচায়ক।

বিয়েতে প্রাথমিক অবস্থায় বাপ-মায়ের মন ভরলেও স্বামীর পেশা ও পারিবারিক অবস্থা দেখে ভাবীর কোনোদিনও মন ভরেনি। প্রথম থেকেই সংসারে নেই নেই অবস্থা। 'নামেই তালপুকুর, ঘাটে ঘটি ডোবে না।' অনেক কষ্টে বেতনের টাকায় মাস চালাতে হয়। জীবনের শখ-আহ্লাদ বলতে কিছু থাকে না, থাকতেও নেই। শিক্ষক মানুষ, এদের আবার শখ-আহ্লাদ কী! ভাবীর পক্ষে এ পরিবেশ মেনে নেওয়া খুব কঠিন হয়েছে। শ্বশুরবাড়ি থেকে যে লোকগুলো জেলাশহরে ভাবীর বাসায় আসেন, তাঁরা সবাই হয়তো অল্প লেখাপড়া জানেন, না হয় গ্রামের নিরক্ষর চাষি। ভাবী এদেরকে মন থেকে মেনে নিতে পারেন না। তাদের জন্য ভাত রাঁধতে ভাবীর খুব আপত্তি। কলেজশিক্ষক স্বামী স্ত্রীকে তোষামোদ করে আত্মীয়-স্বজনের সামনে নিয়ে কথা বলাতে হয়।

আত্মীয়-স্বজনও ভাবেন, এত কষ্ট করে সুজাউদ্দিনকে বড় করে লেখাপড়া শিখিয়ে চাকরি পাইয়েছেন; ধনবান ঘর দেখে বিয়ে দিয়েছেন, বড় বেতনে শহরে চাকরি করে, সংসারের অভাব-অনটনে সুজাউদ্দিন সবার পাশে দাঁড়াবে, অকাতরে সাহায্য করবে– এটাই তো প্রত্যাশা। ফসল উৎপাদনে ডোবা-পোড়া আছে, পোকায় খাওয়া আছে। মাসে মাসে সরকারি বেতনে তো আর ডোবা-পোড়া নেই। চাকরির টাকা উপায়ের জন্যই-না সুজাউদ্দিনকে এতো করে ক্ষেত বেচে লেখাপড়া শেখানো। এখন বউয়ের কথায় সুজাউদ্দিন উঠ-বস না করলেই হয়। হঠাৎ এসে বউ যেন সুজাউদ্দিনকে তৈরি প্রডাক্ট মতো না-কিনে ফেলে। এ টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে সুজা ভাইয়ের দাম্পত্য জীবন শুরু। দু-কূল রক্ষা করে চলতে হয়।

সুজাভাই বললেন– এর আগেও আপনার ভাবী রাগ করে অনেকবার বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিল। এক-দু-মাস পর বড় ভাই গিয়ে তাকে বাসায় এনে দিয়ে গেছেন। শেষে একবার আমার বন্ধু রেজা গিয়ে নিয়ে এসেছিল। বড় ভাই আর যেতে

চাননি। আপনার ভাবী কোনোদিনই আমার আত্মীয়-স্বজনকে মেনে নিতে পারেনি। তাঁদের ভাত রান্না করে খাওয়াতে চায়নি। এভাবেই বছরের পর বছর কেটে গেছে। সংসারে তিন তিনটে সন্তান এসেছে। আপনার ভাবীর চিন্তাধারার কোনো পরিবর্তন আমি দেখিনি। সে সবসময় আমার শ্বশুরের টাকার গর্বে গর্বিত। আমি তাকে ঠিকমতো খাওয়াতে পরাতে পারিনে বলে শ্বশুর আমাকে একাধিকবার খারাপ ভাষায় কথা বলেছেন। তারা আমাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে চেয়েছেন। আমি আমার সম্মানের দিকে চেয়ে তা নিতে পারিনি। আমি আমার ব্যক্তিত্বকে তাদের অবৈধ টাকার কাছে বিক্রি করতে চাইনি। দিনে দিনে সম্পর্কের ঘোর অবনতি হয়েছে। আমি আর এখন শ্বশুরবাড়িতে যাইনে বললেই চলে। আমি আনতে যাবো না জানি। কে আনতে যাবে তা জানিনে। রেজাও এবার যাবে না, বলেছে। আপনার ভাবীর মন পাবার জন্য এতটা বছর যারপরনাই চেষ্টা করেছি। তার মন পাইনি। সে সবসময় আমার খারাপ দিকগুলোই চোখে দেখেছে। আমার আত্মীয়-স্বজনকে খোঁটা দিয়ে চলেছে। তার সন্দেহবাতিক মন আমাকে প্রথম থেকেই ভোগাচ্ছে। সে গোসল করে বাথরুমে শাড়ি রেখে চলে যেত। তার কাছে ভালো হবার জন্য আমি তা প্রতিদিন ধুয়ে দিয়েছি। আমার সাধ্যমতো সবকিছু করেছি। সে শুধু আমার সাথে তর্ক করেছে। আমি বুঝি, এ-জীবনে সুখ আমার আর হবে না। শুধু ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে তাকে সংসারে রাখতে চাই। আমি হতাশ হয়ে গেছি। তার প্রতি আমার আর কোনো আগ্রহ নেই, বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাবোধও নেই।

এতক্ষণে, বিকেল হয়ে গেছে। দু-জনে বিছানা ছেড়ে দু-কাপ চা তৈরি করে ড্রইং রুমে বসলাম। কলেজের অন্য গল্পে এলাম। দু-দিন পর ভর্তি পরীক্ষা। ছাত্র সংগঠন অধ্যক্ষের কক্ষ ঘেরাও করে অবৈধভাবে ভর্তি ফরম নিয়ে ছাত্রদের মাঝে টাকার বিনিময়ে বিক্রি করবে বলে ফুসফাস শব্দ কানে আসছে। অন্যবারের মতো তিন-চার শ ফরম এবার তারা নেবে না। এক হাজার ফরম তাদের দাবি। ভর্তির সময় মানে ছাত্রসংগঠনের ফসল ঘরে তোলার মৌসুম। প্রতিটা ফরম ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকায় সুযোগবঞ্চিত ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিক্রি করে। এ সময় সব

ছাত্রসংগঠন বিভেদ ভুলে একজোট হয়ে কাজ করে। পাওনার গতিক– তাই মারামারি বন্ধ, তাই মিল-মহব্বত। শিক্ষকদের সাথে নিয়ে শিক্ষাপ্রশাসনের কিল খেয়ে কিল হজম করতে হয়। নীতিকে বিসর্জন দিয়ে তথাকথিত ট্যাক্টফুল হতে হয়। এবার আব্রু রক্ষা করা কতটা সম্ভব হবে তা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম। সন্ধ্যার পর দু-জনে রান্না না করে আমার ভাড়ার বাসাতে চলে এলাম।

সুজা ভাইয়ের বুকে অসুবিধা। ব্লাড প্রেসার বেশি, কোলেস্টেরল বেশি। প্রতিদিন ওষুধ খাওয়া লাগে। বাসায় একা থাকেন। আমরা ভয়ে ভয়ে থাকি। তার বাসার নীচ তলার এক ভদ্রলোককে বলে বাসার একজনকে রাতে সুজা ভাইয়ের সাথে থাকার ব্যবস্থা আপাতত করা হলো।

কিছুদিন এভাবেই কাটলো। একদিন রাতে সুজা ভাই বুকের ব্যথায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ঐ বাসা থেকে খাটলায় করে নামিয়ে বড় রাস্তায় এনে এম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নেওয়া হলো। পরদিন ভাবীকে খবর দেওয়া হলো। ভাবী হাসপাতালেও এলেন না, বাসাতেও না। ছেলেমেয়ে সাথে নিয়ে পিত্রালয়েই থেকে গেলেন। কোনো সাড়াশব্দ নেই, নিশ্চুপ। দু-সপ্তাহ হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়ার পর সুজা ভাই বাসায় ফিরলেন। সুজা ভাইয়ের বড় ভাইয়ের ছেলেকে বলে চাচার বাসায় সুজা ভাইকে দেখে রাখার ব্যবস্থা হলো।

সুজা ভাইয়ের তিন ছেলেমেয়ে মামাবাড়িতে বেড়ে উঠতে লাগলো। সে-পরিবেশে অভ্যস্ত হতে থাকলো। মায়ের মুখে বাবার শতেক দোষ শুনতে শুনতে মায়ের দিকে ঝুঁকে পড়লো। বাপ সংসারছাড়া, পরনারীতে আসক্ত, নিজ সন্তানের খোঁজ রাখেন না বলে ভাবতে শিখলো। বাপ নিজ কুলের আত্মীয়-স্বজনকে আর্থিক আনুকূল্য দেখাতে গিয়ে মাকে বঞ্চিত করেছে, ছেলেমেয়ে ছেড়েছে মনোভাবের জন্ম নিলো। কথকের বিচার-বিবেচনায় ঘাটতি থাকলে, সে-কথার সঠিকতা এবং যথার্থতা যাচাই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। এতে সত্যের তুলনায় কৃত্রিম ভুল বোঝাবুঝি ও মিথ্যার বেসাতি বেশি চলে। ফুসফাস করে এক কান থেকে অন্য কানে কীভাবে যেন কথা উড়ে চলে যায়। এক্ষেত্রে মহিলাঙ্গন অনেক পারঙ্গম। অধিকাংশ মহিলা তাদের

বোধহীনতা দিয়ে অনেক পুরুষকে খারাপ পথে যেতে বাধ্য করে। এখানে কানকথাও জন্মায় বেশি। কানকথায় সত্য নির্বাসনে যায়। তিল তাল হয়ে দেখা দেয়। কোনো কথার আগা ও গোড়া কিছুই ধরে পাওয়া যায় না। কিন্তু কথা নিজে নিজে জন্মায়।

জীবনের পিচ্ছিল পথে চলতে গিয়ে অনেক সময় পা পিছলে যায়, ভুল হয়ে যায়। সামান্য ভুলের আশ্রয় নিয়ে কল্পনার পাখায় ভর করে আকাশে ইমারত গড়া অনেক সহজ। বাস্তবতা না জেনে দোষের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া আরো সহজ। অলীক কল্পনার মাত্রা বেশি হয়ে গেলে বাস্তবে ফিরে আসা অতটা সহজ হয় না। চলতি পথে ভুল করা অন্যায় না। –অন্যায়, ভুলটা ধরা পড়ার পর সংশোধন না করা, উভয়পক্ষ বোঝাবুঝির মাধ্যমে সামনে এগিয়ে না যাওয়া। নইলে পারস্পরিক দোষারোপের মাত্রা বাড়তেই থাকে। সেখান থেকে আর ফেরা যায় না।

বড় মেয়েটা মামাবাড়ির আগল ভেঙে মাঝে মাঝে বাবার কাছে আসতে শুরু করলো। বয়স অল্প। বাবার সুবিধা-অসুবিধা বোঝার চেষ্টা করতে লাগলো। ক্রমশ বাবার প্রতি মমত্ববোধ বাড়লো। বাবা মেয়ের মধ্যে বোঝাবুঝি এলো। কিন্তু এটা সার্বক্ষণিক নয়। বাবার সংসারজীবনের জন্য অপ্রতুল। মা-বিহীন সংসারে মন বসে না। আবার মায়ের কাছে ফিরে চলে যায়। একবার দেখলাম, ছোট বোনটাকে সাথে করে এনেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলো। কখনো বান্ধবীদের সাথে নিয়ে বাবার কাছে আসে। এক রাত থাকে, আবার চলে যায়। বাবা অধিকাংশ সময় বিভিন্ন জিনিস কেনাকাটা করে মেয়ের মাধ্যমে পাঠান। অন্যরা সেটা ব্যবহার করে, খায়– মা স্পর্শ করেন না। মেয়ে সেতুবন্ধ তৈরি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মেয়ে বড় হয়েছে, কিছুটা হলেও বুঝতে শিখেছে। আমার ছেলে-মেয়ের সাথে তার সখ্য গড়ে উঠলো। আমি মনে মনে মেয়েটার নাম দিলাম 'সেতু'। কিন্তু সে সেতু দিয়ে মা কোনোভাবেই এপারে এলেন না। মুসলমানের এক জবান। বলেছি, ফিরবো না– তো ফিরবোই না। 'বিদায় করেছি যারে চোখের জলে, আবার ফিরাবো তারে কিসের ছলে?' কোনো পক্ষের নির্বিচার-বিবেকহীন জিদ পারস্পরিক সম্পর্ককে সমূলে ধ্বংস করে দেয়।

এর মধ্যে সুজা ভাইয়ের শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। আমার যেদিন ভয় ভয় করে, নিজে গিয়ে তাকে বাসায় নিয়ে আসি। নিজের কাছে রাখি। উনিও খারাপ লাগলে আমার বাসায় চলে আসেন। সুজা ভাই এর মধ্যে একটা অকাজ করে বসলেন। এতো অসুস্থতার মধ্যেও যেহেতু ভাবী এলেন না, তিনি সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য উকিল নোটিশ পাঠালেন। দেনমোহরের টাকা পুরোটাই পরিশোধ করে দিলেন। সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়ে গেল। সবই তাঁর মুখে শুনলাম, নিজ চোখে দেখিনি। ভাবলাম, উনি হয়তো দ্বিতীয় বিয়ে করবেন। করলেন না। কয়েক মাস পর একদিন দু-জনে পাশাপাশি শুয়ে আছি। জিজ্ঞেস করলাম– সুজা ভাই, কী ভাবছেন বলুন তো?

–ভাবছি ভারতে যাব ডাক্তার দেখাতে। এ দেশে বুক অপারেশনে সাকসেসের হার অনেক কম। অপারেশন করালে ভারতেই করাবো। চলুন দু-জনে পাসপোর্টে ভিসা লাগাই। আমার সাথে আপনাকে যেতে হবে। বিয়ে-শাদির কথা এখন ভাবছিনে। আমাকে কষ্ট করতে দিন, ভুগতে দিন। ভোগান্তি আমার পাওনা। এ থেকে আমাকে রক্ষা করতে কোনোক্রমেই পারবেন না। বাকিটা পরে বলবো। উনি ফরিদপুরে বদলির চিঠি পেলেন। শেষতক ঢাকা ছাড়তেই হলো। একদিন ফরিদপুর গিয়ে রেখে এলাম। একাকী হয়ে গেলাম। সেতু ফরিদপুর-ঢাকা যাতায়াত করতে লাগলো। মেয়েটার মানসিক অবস্থা ভালো থাকে না। লেখাপড়ায় মন বসে না। কাউকে বলতেও পারে না। 'সহায় সম্পদ বল, সকলি ঘুচায় কাল, আয়ু যেন শৈবালের নীড়।' সবকিছুই কালের হাতে বন্দি। খবর এলো সুজা ভাই স্ট্রোক করেছেন। ফরিদপুর হাসপাতালে খারাপ অবস্থায় ভর্তি হয়েছেন। এখন অবস্থা একটু ভালো। খবর পেতেই দু-দিন লেগেছে, তৃতীয় দিনে ফরিদপুর পৌঁছলাম। অবস্থা ভালো বললেও ভালো না। সেখানে তার দেখার কেউ নেই। সাহায্যকারী হিসাবে আছেন ডাক্তার, নার্স এবং একজন কলেজ কর্মচারী। মেয়েটাও নতুন জায়গায় গিয়ে অসহায়। মেয়েটা একজন কাজের মেয়েকে সাথে নিয়ে, তাকে রেখে, দু-দিন থেকে ঢাকায় ফিরেছে। দু-সপ্তাহ হাসপাতালে থেকে সুজা ভাই বাসায় ফিরেছেন। একদিন ঢাকায় এসে বললেন– আজমাইন, আর দেরি নয়। ভিসা করতে হবে, কোলকাতা যেতে হবে।

কয়েক দিনের মধ্যে দু-জনে কোলকাতা ছুটলাম। ডাক্তার দেখানো হলো। ডাক্তার দু-মাসের ওষুধ দিলেন। এনজিওগ্রাম করানোর প্রস্তুতি নিয়ে আবার যেতে বললেন। দু-জনে ঢাকা ফিরে এলাম।

কিছুদিনের মধ্যে উনি ঢাকায় পোস্টিং পেলেন। দু-জনে এক বাসায় থাকার আয়োজন হলো, যাতে বিপদে আপদে একজন অন্যজনের পাশে থাকা যায়। ভালোই হলো– আমি চারতলায়, উনি নীচতলায়। উনি সিঁড়ি ভাঙতে চান না। বেশ আমোদ-প্রমোদের মধ্যে কাটতে লাগলো। সেতু প্রায় সুজা ভাইয়ের সাথেই থাকে। আমি নীচতলায় গিয়ে আড্ডা বসাই। আমার ছেলেমেয়ে চাচাকে পেয়ে যারপরনাই খুশি। চাচাও ছেলেমেয়েদের কীভাবে আদর করতে হয় তা জানেন। আমার কোনো আত্মীয় বাসায় এসেছেন, আমি বাসায় নেই, বাজার নেই– তাতে কী! সুজা ভাইতো আছেন। আগে আগে ব্যাগটা নিয়ে বাজারে ছুটেছেন। একসাথে উঠা-বসা-খাওয়া। আমার সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের কাছে সুজা ভাই পরিচিত– আপনজন। মানুষকে কীভাবে আপন করে নিতে হয়, তা সুজা ভাই জানেন। অবিচ্ছেদ্য পরিবার। সুজা ভাই নিজ গুণে উজ্জ্বল। কোনো জটিলতা বোঝেন না। সহজ পথে চলা সুশিক্ষিত, আত্মসচেতন, আপাদমস্তক ভদ্রলোক। কেউ ইচ্ছে করলে অল্প কথা দিয়েই কৃত্রিমতা দেখিয়ে তাঁর মন জয় করা সহজ, তাঁকে ঠকানো আরো সহজ। কোনো কোনো পক্ষ তাকে প্রতিনিয়ত ঠকাচ্ছে– মতলববাজি করছে। চোখের সামনে তা দেখছি। কখনো রাগারাগি করি। তিনি হেসেই উড়িয়ে দেন। নীতি-নৈতিকতার বাইরে কিছু করবেন না বলে জানান।

দু-মাস শেষ হতে চললো। আবার কোলকাতায় যাবার প্রস্তুতি চলছে। এনজিওগ্রাম করাতে হবে। তিনি বললেন– এনজিওগ্রাম করানো খুব রিস্ক। অপারেশনের আগে এনজিওগ্রাম করিয়ে নিলেই হবে। ভারতে অপারেশনেও অন্য রিস্ক আছে। অপারেশনে দুর্ঘটনা ঘটলে লাশ দেশে আনা অনেক ঝামেলা।

বুঝলাম– সুজা ভাই অপারেশন করাতে অনেক ভয় পাচ্ছেন। তাঁর সাথে আবার ভারতে গেলাম। ডাক্তার দেখানো হলো। তিনি ওষুধ দিলেন। অপারেশনের জন্য

প্রস্তুতি নিতে বললেন। প্রায় পাঁচ দিন ওখানে থাকা হলো। হোটেলের এক রুমে দুটো বেড নিয়ে দু-জনে থাকি। পারিবারিক ও সাংসারিক অনেক কথাই দু-জনের মধ্যে হয়। উনি তাঁর বাকি জীবনটাকে কীভাবে ভাবছেন, আমাকে কী করতে হবে– সবই জানালেন। তাঁর মনে অনেক কষ্ট যে, তাঁর ছেলেটা কোনোদিনও তাঁকে একবার দেখতে এলো না। কোনো যোগাযোগও করলো না। যে ছেলের জন্য জীবনের অনেক কিছুই বিসর্জন দিয়ে এতদূর এসেছেন, সেই ছেলে শুধু মায়ের কথার উপর ভিত্তি করে তাঁর সম্বন্ধে একটা খারাপ ধারণা মনের মধ্যে পুষে রেখেছে– যা সুজা ভাইকে মর্মাহত করেছে। দাম্পত্যজীবনের ভিতরে পারস্পরিক এমন অনেক কিছুই থাকে যা ছেলেমেয়েরা বাইরে থেকে কিছুই বুঝতে পারে না। তাই একপক্ষের কথা শুনে কারো সম্বন্ধে নেগেটিভ ধারণা পোষণ করা নিতান্তই অনুচিত। সুখী হতে গেলে সমমনা হতে হয়। বোঝাবুঝি থাকতে হয়। একজন মানুষ দাম্পত্য জীবনে অসুখী হলেই যে মানুষ খারাপ– তা নাও হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে অসুখী হওয়ার জন্য অনেক ফ্যাক্টর কাজ করে। তবু সুজা ভাইয়ের সান্ত্বনা এটুকুই যে, ছেলেটা এখনো লেখাপড়ার মধ্যে আছে। লেখাপড়ার প্রয়োজনে যদি ছেলেকে দেশের বাইরে যেতে হয়, ঢাকার অদূরে সুজা ভাইয়ের একখণ্ড জমি আছে, তা যেন বিক্রি করে টাকাটা ছেলের হাতে দিই। দীর্ঘ বছরে গ্রাম থেকে যেহেতু বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন, সেখানকার কোনো অংশ আনতে পারবেন বলে মনে হয় না। সেজন্য সেদিকে না তাকানোই ভালো। মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থাটা তাড়াতাড়ি করে ফেলতে হবে। ব্রোকেন ফ্যামিলিতে অনেকেই বিয়ে করতে চায় না। তবু চেষ্টা করতে হবে।

সুজা ভাই তাঁর অতীত বললেন। জীবনের সবকিছু ষোলআনা বুঝে পাওয়া যায় না। অনেক সময় জীবনের না-পাওয়ার গ্লানিকে সাথে নিয়েই নীরবে পরপারে যাত্রা করতে হয়। তাঁর কপালে সুখ নেই। তাঁর এ অভিশপ্ত জীবনের জন্য তিনি নিজেই দায়ী। তিনি গ্রামের চাষি-গৃহস্থ ঘরের ছেলে। অল্প বয়সে বাপ মারা যান। তিনি বরাবরই লেখাপড়ায় ভালো ছিলেন। মৃত্যুর আগে বাবা গ্রামের এক সহজ-সরল মেয়ের সাথে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়েছিলেন। সুজা ভাইয়ের লেখাপড়া যতো বাড়তে

থাকে, দৃষ্টিভঙ্গির ততো পরিবর্তন হতে থাকে। সাবালকত্ব আসার পর গ্রামের ঐ নিরক্ষর বউয়ের সাথে সম্পর্ক অস্বীকার করেন। নিজেকে সমাজে উচ্চ-শ্রেণিভুক্ত করার চেষ্টা করেন। তিনি যখনই গ্রামের বাড়িতে যেতেন, ঐ বউ এসে বাড়ির খুঁটি ধরে সুজা ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন, চোখের জল ফেলতেন। সুজা ভাই তা উপেক্ষা করতেন। বউয়ের হৃদয়ের আকুতিকে এড়িয়ে যেতেন। তার দিকে ফিরেও তাকাতেন না। সুযোগমতো বউটা এসে তার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতো। তিনি গুরুত্ব দিতেন না। এমন ঘটনা অনেকবার হয়েছে। সুজা ভাইয়ের চোখে তখন রঙিন স্বপ্ন। তিনি তখন উঁচু ঘাটে নৌকা ভেড়ানোর স্বপ্নে বিভোর। অতি ক্ষুদ্র পরিবারের নিরক্ষর গ্রাম্যবধূর হৃদয়ছোঁয়া অব্যক্ত ভাষার আবেদন তাঁর কাছে তুচ্ছ– লেখাপড়া জানা বউ ঘরে আনবেন, সংস্কৃতিমনা বউ এসে জীবনের গতিপথ বদলে দেবে। তাকে নিয়ে চাঁদের দেশে ঘর বাঁধবেন। স্বপ্নভরা উন্নত জীবন হবে। আরও কত কিছু! সুজা ভাইয়ের বিশ্বাস, সেই গ্রাম্যবধূর অভিশাপ তাঁর জীবনের সমস্ত স্বপ্নকে তছনছ করে দিয়েছে। সুখ-শান্তি তাঁর কাছে সোনার হরিণ। এতদিন দৌঁড়েও তার পিছ ধরতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। দাম্পত্যজীবন তাঁর কণ্টকতরু। জীবনের পথে তিনি বারবার আছাড় খাচ্ছেন। জীবন থেকে এখন তিনি পালিয়ে বাঁচতে চান। কিন্তু যেখানেই যান, যেদিকেই তাকান, সেদিকেই পৃথিবী, সেখানেই জীবন। জীবনের বাস্তবতা থেকে পালিয়ে বাঁচা যায় না। অশান্তি তাঁকে কুরে কুরে খেয়েছে। তাঁকে মরণঘাতী হার্টের রোগী বানিয়েছে। সেখান থেকে ফেরার আর কোনো পথ নেই। এখন যেদিকেই তাকান, অন্ধকার। নিজের ঔরসজাত সন্তানও তাঁকে বুঝতে ব্যর্থ হচ্ছে। এ অবস্থায় নতুন করে ঘর বাঁধার স্বপ্ন 'বাতুলে ধইরাছে তুল, খরিদ্দার সব ঠগের মাইয়া, সামাল মনমাঝি নাইয়া' বলে মনে হচ্ছে।

জীবনে চলার পথে একজন নারীকে নিয়ে সুখের ঘর বাঁধার জন্য নারীর উপস্থিতি অপরিহার্য হয়ে ওঠে ঠিক; কিন্তু সেই নারী যখন অগ্নিশিখা হয়ে স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হয়; তখন স্বপ্ন, সংসার, পুরুষ, পরিবার নরকাগ্নিতে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। উঁচু-ডালে বসে থাকা সুখপাখি দূর আকাশে ঝাপটা মেরে উড়ে পালায়। জীবনের প্রতি বীতস্পৃহা, বীতশ্রদ্ধা বাড়ে। জীবন গোলাপ প্রস্ফুটিত না হয়ে অকালে ঝরে যায়।

সুজা ভাইয়ের এই অন্তিম অবস্থায় নারীর সেবার প্রয়োজন আছে সত্য; কিন্তু কোনো নারীকে নিয়ে তাঁর আবার ঘর করার বাসনা চিরতরে বিলীন হয়ে গেছে। এভাবেই যতটুকু সামনে বেয়ে যাওয়া যায়, তাতেই সন্তুষ্ট।

পাঁচ দিন পর আবার ঢাকায় ফিরে এলাম। হাসিখুশিতে দিন কেটে যাচ্ছে। বড় মেয়ে বাদে বাকি ছেলে-মেয়ে তাঁর ছায়া মাড়াতে চায় না। তবু তিনি দূরে বসে তাদের মঙ্গল কামনা করেন। তাদের জন্য কিছু সম্পদ বাড়াতে চান, নিজের একটা আশ্রয় বানাতে চান, তাদের ভবিষ্যৎ গড়তে চান।

প্রতিদিনের মতো তিনি তাঁর অফিসে গেছেন, আমি আমার অফিসে। দুপুরে খবর পেলাম সুজা ভাই বেশি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাড়াতাড়ি কাজ ফেলে হাসপাতালে দৌড়ালাম। দেখলাম, তিনি অচেতন অবস্থায় সিসিইউতে শায়িত। কাউকেই চিনতে পারছেন না। ডাকলে উত্তর দিচ্ছেন না। বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন। স্যালাইন চলছে। হার্টের গতিবেগ উঠা-নামার নিরবচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ চলছে। মাঝেমধ্যে নীচুস্বরে প্রলাপ বকছেন, 'ভাত খাব, খুব ক্ষিদে পেয়েছে।' তাঁর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে চোখের পানি ধরে রাখা অসম্ভব, একজন শত্রুর পক্ষেও– কোথাও কোথাও আবেগ ধরে রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

পরদিন বিকেল তিনটার দিকে চেহারায় কেমন যেন একটা পরিবর্তন। নিঃশ্বাস ক্রমশই ধীর হয়ে এলো। একসময় একবার বড় করে নিঃশ্বাস নিয়ে ছেড়ে দিলেন। আর নিশ্বাস নিলেন না। বুঝলাম সব শেষ হয়ে গেল। পরদিন সকালে বুদ্ধিজীবী গোরস্থানে দাফনের ব্যবস্থা করা হলো। কবরে নামানোর সময় লক্ষ করলাম, দু-পাশের দুটো হাত শূন্য অবস্থায় উনি আমাদের হাতে শুয়ে কবরে নেমে পড়লেন। সবকিছুই দুনিয়াতে রেখে গেলেন। তার বুদ্ধিদীপ্ত পাণ্ডিত্য, জ্ঞান, ইংরেজি ভাষার উপর অসম্ভব দখল, সবকিছু পিছনে ফেলে রেখে চলে গেলেন। ছেলেমেয়েরা এলো, ভাবী এলেন না।

মৃত্যুর পর গোল বাধলো ওয়ারিশান সার্টিফিকেটে। ভাবী তাঁর কোনো ওয়ারিশ হবেন না। উকিল নোটিশের কপি, বিচ্ছেদের কপি চাওয়া হলো, তা ভাবীর কাছে

নেই। সুজা ভাইয়ের বাসাতেও কোথাও নেই। ভাবীর গররাজিতেও বাধ্য হয়ে সরকারি পেনশন, প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাতে ভাবীর নাম রাখা হলো। অনেক চেষ্টা-তদবিরের পর বিভিন্ন জায়গার পাওনা টাকা আসতে লাগলো। ভাবীর নামে চেক আসে, ছেলেমেয়েরা কেউ ভাবীর নামে ব্যাংকে জমা করে। ভাবী নিরুদ্যোগ, নিরুৎসুক। ছেলেমেয়েরা বাবার ওয়ারিশ সন্দেহ নেই। কিন্তু সে অর্থে ভাগ পাওয়ার অধিকার তাদের নেই। টাকাগুলো ব্যাংকে পড়ে আছে। সুজা ভাইয়ের অনেক পাওনা থেকেই মা উত্তরাধিকারদের বঞ্চিত করেছেন। অনেক সুবিধা দাবিদারের অভাবে বাতিল হয়ে গেছে।

সেতু আমাদের সংসারের সাথে এখনো সুখে-দুঃখে সেতুবন্ধ হয়ে জড়িয়ে আছে। আমরা সন্তানদের বলেছি, সেতুকে আজীবন বড় আপু বলে ডাকবি। একজন চাচা কি ভাইয়ের মেয়েকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে!

সময় পেরোতে পেরোতে দু-যুগ পেরিয়ে যাচ্ছে। কোনো অভিশাপের বদলা এখনো নেওয়া হয়নি। আজো চিহ্নিত হয়নি অভিশাপ কার, এবং অভিসম্পাত কার প্রতি।

(পল্লবী, ঢাকা: ২৮.১১.২০২০)